NATURAL THEOLOGY

IN BENGALI.

PART I.

BY

NOBIN KRISSIONA BANERJEA.

প্রাকৃত তত্ত্ববিবেক।

প্রথম ভাগ।

শ্রীনবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।

"দেশ ভেদে কাল ভেদে রচনা অসীমা।
প্রতি ক্ষণ সাক্ষ্য দেয় তোমার মহিমা॥"

CALCUTTA:

THE SANSKRIT PRESS.

1860.

কাব্যশাস্ত্র পর্য্যালোচনা দ্বারা যে মহাফলোদয়ের সম্ভাবনা তাহা অতি বিস্তার পূর্ব্বক লেখা অনাবশ্যক। চন্দ্রমা সত্তা সংস্থাপন নিমিত্ত যত্ন প্রকাশ করা অনর্থক আড়ম্বর মাত্র। কাব্যশাস্ত্র পাঠের উপকার সমূহ এপ্রকার দেদীপ্যমান আছে যে সুধীমাত্রেরই তাহা অনায়াসে বোধগম্য। পরন্তু অস্মদ্দেশীয় কতিপয় নৈয়ায়িক ভট্টাচার্য্য ও তদিতর ব্যক্তিগণের কাব্যের উপর দোষারোপাদি নিবন্ধন দ্বেষ আছে। তাঁহারা বোধ করেন যে এই শাস্ত্রের কেবল বালকমনোহারিণী কথামাত্র অবলম্বন; এবং তৎকরণক কোন বিশেষ উপকার হওয়া দূরে থাকুক, বরঞ্চ তাহাতে বুদ্ধির স্থূলতা জন্মে; সুতরাং এ শাস্ত্র অধ্যয়ন না করাই শ্রেয়ঃ। কিন্তু এইরূপ অকিঞ্চিৎকর আপত্তি করিয়া একেবারেই কাব্যশাস্ত্র অগ্রাহ্য করা, বোনকুসুমের পূতিগন্ধভয়ে ঘ্রাণপথ অবরোধের ন্যায়। আমাদিগের এরূপ অভিপ্রায় নহে যে কাব্যশাস্ত্রকে ইন্দুকরনিকরের ন্যায় নির্ম্মল বলিয়া প্রতিপন্ন করি। অবশ্য স্বীকার্য্য, যে ইহাতে দোষ ও গুণ উভয়ই আছে। কমলমাত্রই কণ্টকবিশিষ্ট বলিয়া, তাহার সৌরভের খর্ব্বতা হয় না, জন কর্ত্তৃক অনাদরণীয়ও হয় না। পরন্তু কাব্যবিদ্বেষি-জনগণের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া আমাদিগের তাৎপর্য্য নহে। যেহেতু এ শাস্ত্রের প্রতিকূলাচরণে তাঁহাদিগের এরূপ দৃঢ়তর সঙ্কল্প, যে সহস্রাধিক প্রমাণ

দিলেও তাঁহারা কাব্যের গুণ স্বীকার করিবেন না
বিশেষতঃ কাব্যরসাস্বাদনের শক্তিও স্বতন্ত্র। সুতরাং
উক্ত ব্যক্তিদিগের নিকটে তদ্গুণ বর্ণন বা তদীয়
প্রশংসা করা, অন্ধকে রূপ প্রদর্শন ও বধির সমীপে
তালমানলয়সংগত বীণাবাদনের তুল্য। অপিচ কোন
প্রসিদ্ধ সংস্কৃত আলঙ্কারিক লেখেন যে শর্করা ভক্ষণে
যদি কোন রোগের উপশম জন্মে তবে কটু তিক্ত
ঔষধ সেবনে কে সম্মত হয়। কাব্যশাস্ত্র, [illegible]-
[illegible] সুধা অপেক্ষাও মধুর। অতএব মানসিক
পীড়াশান্তির হেতু এতৎ ঔষধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক উপা-
[illegible] শিরোবেষ্টনে নাসিকা স্পর্শ করার
ন্যায় [illegible] কাব্যতত্ত্বই অতিশয় সুমধুর ও চিত্ত-
রঞ্জক। তাহার এক বিশেষ ক্ষমতা এই যে, অতি
অকিঞ্চিৎকর দ্রব্যকেও অসামান্য লাবণ্য দান পূর্ব্বক
বিবিধগুণালঙ্কারসংযুক্ত করিয়া বর্ণন করে। কবি
স্পর্শমণির ন্যায় বস্তু মাত্রেকেই স্পর্শ দ্বারা স্বর্ণতুল্য
সৌন্দর্য্য ও প্রভা প্রদান করে। অতএব কবিতা পর্য্যা-
লোচনাতে কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি বিরত হয়েন।

অস্মদ্দেশীয় প্রকাশ্য পাঠশালা সমূহে বঙ্গভাষার
উত্তম পদ্য গ্রন্থ না থাকায়, বিদ্বজ্জনগণ অতিমাত্র
ক্ষুব্ধ আছেন এবং এই অভাব নিবৃত্তি নিমিত্ত আগ্র-
হাতিশয় প্রকাশ করেন। কিন্তু দিক্ দেশ কাল বিবে-
চনায় ঝটিতি নূতন কোন সৎকবির উদয় হওয়া
সুদূরপরাহত। কেমনা কবিত্বশক্তি, সিন্ধুতটস্থ লহরী

ধৌত বালুকাগুলীর ন্যায় নহে, যে আপামর সাধারণ সকলেই অঞ্জলিপূর্ণ করিয়া যথেপ্সিত পরিগ্রহণ করিতে পারে। বিশেষ দৈবী অনুকম্পা না হইলে কবিত্বশক্তি জন্মান কোনমতে সম্ভব নহে। তৎপ্রমাণ এই যে অধুনা অনেকে পয়ারাদি বিবিধ ছন্দে রচনা করিয়া থাকেন। কিন্তু শিরীষকুসুমাপেক্ষাও সুকুমার যে ভারতচন্দ্রকবিতা তদনুরূপ রচনা করিতে কে সক্ষম হয়েন। স্বাতিনক্ষত্রে বারিবিন্দু যেমন বস্তু বিশেষোপরি পতিত হইলে তাহাতে এক বিজাতীয়গুণ উৎপত্তি হয়, তদ্রূপ ভগবৎপ্রসাদস্বরূপ কৃপাকণা যে ভাগ্যধর ব্যক্তি প্রাপ্ত হয়েন তাঁহাতেই এই সাধারণ কবিতারচনার ক্ষমতা জন্মে। কিন্তু যদিচ ভারত প্রভৃতি প্রাচীন কবিগণের গ্রন্থরচনা বিশেষ মাধুর্য্যবিশিষ্ট হইয়া অতিমাত্র জনসমাদরণীয় হইয়াছে, তথাপি উক্ত পুস্তক কোনরূপেই ছাত্রগণের পাঠোপযোগী নহে। যেহেতু স্থানে স্থানে বিবিধ অশ্লীল শব্দ ও কদর্য্য ভাব, ব্যবহার হওয়াতে তাহা ভদ্রসমাজে পাঠযোগ্য নহে। অতএব এই দোষসমূহ নিবারণার্থে প্রচুর প্রযত্ন দ্বারা ঐ সকল অপকৃষ্ট ভাব ও বীভৎস বর্ণনাদি পরিত্যাগ করিয়া উক্ত কবিদিগের সারভাগমাত্র সঙ্কলন পূর্ব্বক এই গ্রন্থ প্রস্তুত করা গেল। ভরসা যে, স্বদেশীয় বালকগণের হস্তে এই পুস্তক নিরাশঙ্কায় অর্পিত হইতে পারিবেক। কেননা ইহার মধ্যে এমত কোন কথা নাই যাহা অতি

কও গুরুজনসন্নিধানে অম্লানবদনে পাঠ

করিতে না পারেন। ইহা বিজ্ঞবরেরা অত্র গ্রন্থে দৃক্‌পাত করিলেই সবিশেষ অবগত হইতে পারিবেন। ফলতঃ এই পুস্তক দ্বারা যে অবাধে সমস্ত বালকগণের চিত্ত তোষণ হইবে ... দিগের প্রত্যাশা নাই; কারণ মানব মাত্রেরই ... বিবেচনা ও মনের ভাব পৃথক্ পৃথক্। অতএব ... এ পুস্তক অন্য কবিদিগের প্রবন্ধের উৎকৃষ্টাংশমাত্র সংগ্রহীত হইয়া প্রস্তুত হইয়াছে ... যে সর্ব্বাংশে ... সকলেরই মনঃপূত হইবেক এরূপ কোনমতে সম্ভব নহে। ইহাও ... এই পুস্তকে আমাদিগেরও অভিপ্রায় সম্পূর্ণ সিদ্ধ হয় নাই। কেননা বঙ্গভাষায় কাব্যগ্রন্থ অতি বিরল; বিশেষতঃ ভারত, কবিকঙ্কণ প্রভৃতি বিরচিত কবিতা যাহা আছে তাহার মধ্যে অধিকাংশ সংগ্রহ যোগ্য নহে। এবং ঈষদ্দোষের নিমিত্তে অধিক ভাগ পরিত্যক্ত হইয়াছে; কারণ স্থানে স্থানে কিঞ্চিন্মাত্র অশ্লীল বাক্য প্রয়োগ হওয়াতে পয়ঃকুম্ভে গোমূত্র বিন্দুর ন্যায় গুণরাশিকে বিনষ্ট করিয়াছে এবং উক্ত অপকৃষ্ট কথা সকল ত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট ভাগও পরিগৃহীত হইতে পারে না। কারণ তদ্দ্বারা তাহার ভাবের ও সৌন্দর্য্যের সংপরোনাস্তি হানি জন্মে। পরিশেষে এইমাত্র বক্তব্য, যদি এই পুস্তক দ্বারা অস্মদ্দেশীয় ছাত্রবর্গের কিঞ্চিন্মাত্র সাহায্য হয় তবে আমাদিগের শ্রম সফল বোধে কৃতার্থম্মন্য হইব ইতি।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ রায়।

বৃদ্ধাবস্থা।

জগদীশ্বর জীব মাত্রকে জন্ম স্থিতি ও ভঙ্গ এই তিন অবস্থার অধীন করিয়াছেন. তাঁহার কল্যাণ-কর প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে জীব সকল উৎপন্ন হইয়া ক্রমে উন্নতি প্রাপ্ত হয় এবং তাঁহারই নিয়মানুসারে তাহাদিগের আবার কালেতে হ্রাস হইতে থাকে। বৃক্ষ, লতা, তৃণ, গুল্ম, কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী, প্রভৃতি সমস্ত [illegible] পদার্থই তাঁহার প্রণীত এই নিয়মের অধীন। ওষধি ও বনস্পতি প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ পদার্থ যেরূপ বীজ গর্ভ হইতে অঙ্কুরিত হইয়া পূর্ণাবস্থায় পরিণত হইলে ক্রমে জীর্ণ ও শুষ্ক হইয়া হ্রাস পাইতে আরম্ভ করে, মনুষ্যাদি জীব শরীরও সেই রূপ গর্ভাবস্থা পরিত্যাগ করিয়া ক্রমে যৌবনাবস্থার নির্দ্দিষ্ট সীমায় উপনীত হইলে পর দিনে দিনে জরাগ্রস্ত হইতে থাকে। জল, বায়ু, ও তেজ প্রভৃতি যে সকল ভৌতিক পদার্থ দ্বারা [illegible] সময় মনুষ্য শরীর দিন দিন পরিপুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইয়া বর্দ্ধিত হয়, সময়ান্তরে সেই সমস্ত পদার্থই আবার মানব দেহের ক্ষয়ের কারণ হয়। যদিও কোন কোন মনুষ্য যথাবিধি

আহার নিদ্রাদি নিষ্পাদন করিয়া সুচারু রূপে শারীরিক নিয়ম পালন পূর্ব্বক দীর্ঘকাল শরীরকে সবল ও সতেজাবস্থায় রক্ষা করিতে সমর্থ হয়, কিন্তু আমরা সুস্পষ্ট দেখিতেছি যে জীবের জরাগ্রস্ত হওয়া জগদীশ্বরের একটি নির্দ্দিষ্ট নিয়ম। শারীর স্থান ও শারীরবিধান বিদ্যা বিশারদ পণ্ডিতগণ বৃদ্ধাবস্থার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, যে মানব দেহের বৃদ্ধির সঙ্গেই তাহার ক্ষয়ের কারণ উৎপন্ন হয়। যৌবনাবস্থার নির্দ্দিষ্ট সীমা অতীত হইলে পর মনুষ্য শরীর এক নূতন ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়। তখন নিত্য নিয়মিত অন্ন পান দ্বারা শরীর সকল যত অধিক ক্ষয় হয়, ততই নিয়মাতিরিক্ত ক্ষীণ হইয়া ক্রমে অশক্ত ও অকর্ম্মণ্য হইতে থাকে। অস্থির ন্যায় দেহান্তর্গত শিরা ও মাংসপেশী সকলও দিনে দিনে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়। শিরা সকল ক্রমে অধিক পুরু ও কঠিন হওয়াতে তাহার মধ্য দিয়া শোণিতাদি দ্রব পদার্থ সকল সহজে সঞ্চালিত হইতে পারে না। মাংসপেশী সকল এত কঠিন হয়, যে তাহাদিগের সঞ্চালন ক্রিয়া সমাধা হওয়া কঠিন হইয়া উঠে। শরীরস্থ সমুদয় অস্থি সন্ধি স্থানে যে তৈলবৎ স্নেহ পদার্থ বিদ্যমান থাকাতে যৌবনাবস্থায় অস্থি গ্রন্থি সকল সঞ্চালন করা আমাদিগের পক্ষে সহজ

থাকে, কালক্রমে সে পদার্থের পরিমাণ অল্প হইয়া যায় এবং তাহা এত ঘন হইয়া উঠে, যে তদ্দ্বারা আর কোন রূপে সঞ্চালন ক্রিয়া সম্পন্ন হয় না। এই রূপে শরীরের সকল অংশই কালেতে বিকৃত ও রূপান্তরিত হয় ও মনুষ্যের অকর্ম্মণ্য হইয়া উঠে এবং বার্দ্ধক্যও আপনা হইতে উপস্থিত হয়। জীব মাত্রে কেহই জরা মরণ বর্জ্জিত নহে, সুতরাং মনুষ্যও কালেতে জরা মরণগ্রস্ত হয়। পরম করুণাকর পরমেশ্বর যে কি মহৎ কল্যাণের উদ্দেশে মানব জাতিকে অজর অমর না করিয়া এতাদৃশ বার্দ্ধক্যাদির অধীন করিয়াছেন, যদিও আমরা তাহা সম্পূর্ণ রূপে জ্ঞানগোচর করিতে শক্ত না হই, কিন্তু তিনি যে রূপ আশ্চর্য্য নিয়মে মনুষ্যকে বাল্য যৌবনাদি অবস্থা ত্রয়ের অধীন করিয়াছেন তাহার মধ্যে আমরা তাঁহার অনুপম কৌশল দেখিতে পাই এবং বাল্য যৌবন ও বার্দ্ধক্য সকল অবস্থাতেই তাঁহার করুণা সন্দর্শন করি।

আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, যে বৃদ্ধাবস্থায় মনুষ্য আপনার দেহ রক্ষা ও জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে নিতান্ত অশক্ত হয়। যৌবনাবস্থায় যে ব্যক্তি স্বোপার্জ্জন দ্বারা সহস্র জনকে ভরণ পোষণ করে, বৃদ্ধাবস্থায় আপনার উদরপূর্ত্তি করাও তাহার

পক্ষে অসাধ্য হইয়া উঠে। কিন্তু করুণাকর জগদীশ্বর এরূপ নিরুপায় বৃদ্ধাবস্থারও উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন, যে ব্যক্তি বাল্যকাল ও যৌবন কালে সুশান্তরূপে জগদীশ্বরের নিয়মানুগত হইয়া কার্য্য করে, বৃদ্ধাবস্থায় তাহাকে কিছুমাত্র কষ্ট ভোগ করিতে হয় না। বাল্য ও যৌবন বিদ্যা ও ধনাদি উপার্জ্জনের কাল। যে ব্যক্তি বাল্যাবস্থায় বিদ্যোপার্জ্জন না করে এবং যৌবন ধন সঞ্চয় করে, অশক্ত বৃদ্ধ কালে তাহার ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না [illegible] বৃদ্ধাবস্থায় মনুষ্য যেমন আপনার [illegible] সম্পন্ন করণে অশক্ত হয়, বাল্য ও [illegible] উপার্জ্জিত জ্ঞানধনাদি তেমনি তাহার সহায় [illegible] সেকালে তাহাকে সর্ব্বতোভাবে [illegible] বিশেষতঃ সহায় হীন শিশু সন্তানের প্রতিপালন জন্য জগদীশ্বর মনুষ্যের মনে যেমন আশ্চর্য্য স্নেহ নামক ভাবের সৃজন করিয়াছেন, সেইরূপ উপায় রহিত বৃদ্ধ ব্যক্তির জীবন রক্ষার জন্যও করুণানিধান বিশ্বপিতা মর্ত্ত্য লোকে ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা ভাবের সৃষ্টি করিয়াছেন। ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা ভাব যে কি প্রকার করিয়া জরাগ্রস্ত উপায় রহিত অতীত বয়স্ক বৃদ্ধ লোকদিগকে রক্ষা করে তাহার এক একটি উদাহরণ শুনিলে [illegible] এক হইতে হয় [illegible] কত প্রকার কত সন্তান আপ-

নার জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়া বৃদ্ধ পিতা মাতাকে আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছে এবং কত সন্তান প্রগাঢ় ভক্তি ভাবে আবদ্ধ হইয়া নগরে নগরে ও গ্রামে গ্রামে পর্যটন পূর্বক ভিক্ষান্ন আহরণ করিয়া আপনার উদরকে বঞ্চনা করিয়াও জরাগ্রস্ত পিতা মাতার ভরণ পোষণ করে। জগদীশ্বরদত্ত স্বাভাবিক ভক্তি ভাবের এইরূপ সহস্র সহস্র অসাধারণ উদাহরণ সন্দর্শন করিয়া গ্রন্থকারেরা কুলপাবন সৎ পুত্রকে বৃদ্ধ পিতা মাতার যষ্টি স্বরূপ বর্ণন করিয়াছেন। করুণানিধান বিশ্ব পিতার এমনি অদ্ভুত কৌশল যে যে ব্যক্তি যৌবনাবস্থায় তাঁহার প্রতিষ্ঠিত নিয়মের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া যথা বিধি দার পরিগ্রহ করে এবং নিয়মিত রূপে আপনার সন্তানদিগকে লালন পালন করিয়া জ্ঞান ধর্ম্মের শিক্ষা দেয়, সে ব্যক্তি জরাগ্রস্ত হইবার পূর্ব্বেই তাহার বৃদ্ধাবস্থায় জীবন ধারণের সম্যক্ উপায় নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। জগদীশ্বর আমাদিগকে পরোপকার করিবার যে এক শক্তি প্রদান করিয়াছেন তদ্দ্বারাও আমরা বৃদ্ধাবস্থার রক্ষা পাইতে পারি। আমরা যদি যৌবন কালে আমাদিগের ক্ষমতা থাকিতে লোকদিগকে উপকার ঋণে বদ্ধ করি, তাহা হইলে আমরা [illegible]শূন্য বৃদ্ধাবস্থায় তাহার পরিশোধ স্বরূপ

কৃতজ্ঞতা লাভ করিয়া অনায়াসে জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হই। বিশেষতঃ বার্দ্ধক্য কখন সহসা এক দিনে হঠাৎ উপস্থিত হয় না। আমাদিগের বৃদ্ধাবস্থা সমাগত হইবার বহু কাল পূর্ব্বে জগদীশ্বর আমাদিগকে নানা চিহ্ন দ্বারা সতর্ক করেন, আমাদিগের শরীর বিলক্ষণ সবল থাকিতে অগ্রে আমাদিগের কেশ পক্ক ও দন্ত স্খলিত হয় এবং আমরা অনায়াসে সন্নিহিত বার্দ্ধক্যের আগমন জানিতে পারিয়া সর্ব্বপ্রকারে সাবধান হইতে পারি।

পরন্তু স্থূলদর্শী অবিবেকী লোকে বৃদ্ধাবস্থাকে যেমন নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন ও নিরবচ্ছিন্ন ক্লেশের কারণ মনে করে, বাস্তবিক উহা সেরূপ নহে। বৃদ্ধাবস্থা আমাদিগের অনেক প্রকার উৎকৃষ্টতর ও মহত্তর সুখ ভোগের সময় এবং অনেক শ্রেষ্ঠতর কার্য্য সাধন করিবার মুখ্য কাল। কিঞ্চিৎ বয়োধিক হইলে যখন যৌবনের প্রবল তরঙ্গ সকল নিবৃত্ত হয় এবং উত্তেজিত নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল ক্রমে ক্রমে বলহীনা হয়, তখন আমাদিগের ধর্ম্ম প্রবৃত্তি সকল অবাধে আপনাদিগের শক্তি প্রকাশ করিতে পারে, তখন আমরা নির্ব্বিঘ্নে ধর্ম্মজনিত বিশুদ্ধ সুখের আস্বাদ গ্রহণ করিয়া মানব জন্মকে সফল করিতে সমর্থ হই। অতীত বয়স্ক প্রশান্তচিত্ত ব্যক্তির

মানস পটে যেমন সর্ব্বদা অনুপম ঈশ্বরতত্ত্বের প্রকাশ হয়, প্রবল তরঙ্গ বিশিষ্ট যুবা ব্যক্তির চঞ্চল চিত্তে কদাপি সে প্রকার হওয়া সম্ভব বোধ হয় না। বৃদ্ধাবস্থা পরমার্থ রস পান করিবার চরম কাল, উক্তাবস্থায় যে রূপ নির্ব্বিঘ্নে জগদীশ্বরের তত্ত্বরস পান করিয়া সুখী হওয়া যায়, আর কোন অবস্থাতেই সে রূপ হইবার উপায় হয় না। বিশেষতঃ জ্ঞানপরিপক্ক প্রাচীন লোকের অতুল্য ও অমূল্য উপদেশ সকল সংসারের অশেষ কল্যাণের কারণ। যে ব্যক্তি বহুদর্শী ও বহুশ্রুত প্রবীণ ব্যক্তির দুর্লভ উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া কখন তাহার মর্ম্মাবধারণে সমর্থ হইয়াছে, সেই জানিয়াছে, যে বৃদ্ধাবস্থাতেও মনুষ্য কত দূর পর্য্যন্ত সংসারের কল্যাণকর ব্যাপার সাধন করিতে পারে। অতএব বৃদ্ধাবস্থা যে আমাদিগের নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন ও নিরবচ্ছিন্ন ক্লেশের অবস্থা নহে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। জগদীশ্বর আমাদিগের সকল অবস্থাকেই এক এক প্রকার সুখ সাধন ও কল্যাণ বর্দ্ধনের উপযোগী করিয়াছেন, আমরা তাঁহার কল্যাণকর নিয়মের অনুগত থাকিলে কোন অবস্থাতেই তাঁহার প্রসাদ হইতে বঞ্চিত হই না, আমরা যদি তাঁহার প্রদর্শিত পথে গমন করি, তাহা হইলে সকল অবস্থাই আমাদিগের মঙ্গলের কারণ হয়।

বৃদ্ধাবস্থা কেন? আমরা যে মৃত্যুকে প্রধান অমঙ্গ-
লের হেতু মনে করি, যাহার নাম শ্রবণে আমা-
দিগের হৃদয়ের শোণিত শুষ্ক হইয়া যায় এবং
কলেবর কম্পিত হইয়া উঠে, তত্ত্বদর্শী বিবেকী
ব্যক্তি সে মৃত্যুকেও মঙ্গলের কারণ জানিয়া করুণা-
দীশ্বরের মহিমা ঘোষণা করেন। মৃত্যু সমস্ত
চরাচর শাসন করিয়া সংসারের অশেষ অনর্থ
নিবারণ করিয়া রাখিয়াছে। সংসারে মৃত্যু না
থাকিলে যে ইহার কি পর্য্যন্ত অমঙ্গল উদ্ভব হইত,
তাহা বর্ণন করিয়া শেষ করা যায় না। পৃথিবীতে
মৃত্যু বিচরণ না করিলে এত দিন জীব সংখ্যা
ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইয়া পৃথিবীকে পরিপূর্ণ করিত;
কোন প্রাণীই এখানে স্থান প্রাপ্ত হইত না, এবং
কোন জীবই উপযুক্ত রূপে অন্ন পানাদি প্রাপ্ত
হইয়া ক্ষুৎ পিপাসার হস্ত হইতে ত্রাণ পাইতে
পারিত না; ভূমণ্ডল হইতে অনবরত হাহাকার
ধ্বনি উত্থিত হইত। অসাধ্য ও উৎকট রোগের
হস্ত হইতে এক মৃত্যুই আমাদিগকে পরিত্রাণ করে;
এবং নানাবিধ অনিবার্য্য সাংসারিক যন্ত্রণা হইতে
মৃত্যুই আমাদিগকে মুক্তি দেয়। যখন আমরা
নানা কারণ বশতঃ পৃথিবীর সকল সুখে নিরাশ
হই, তখন মৃত্যু আমাদিগের দুঃখহরকারী পরম
বন্ধুস্বরূপ হইয়া ইহ লোক হইতে অপহৃত করে।

অতএব যে ব্যক্তি যথার্থ রূপে মৃত্যুর স্বরূপ বিবেচনা করিয়া দেখে সে ব্যক্তি তাহা হইতে কিছুমাত্র ভয় প্রাপ্ত না হইয়া তাহাকে আহ্লাদ পূর্ব্বক আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত হয়।

করুণাময়! তোমার করুণা কখন পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজনের নিকট হইতে বাৎসল্য ভাব ধারণ করিয়া আমাদিগকে রক্ষা করে, কখন পুত্র কন্যা প্রভৃতি স্নেহাস্পদদিগের নিকট হইতে ভক্তি রূপে আবির্ভূত হইয়া আমাদিগের জীবন ধারণের হেতু হয়। তোমার সুগভীর কৌশল কলাপের মধ্যে বুদ্ধি প্রবেশ করা কাহার সাধ্য? আমাদিগের রক্ষার নিমিত্ত তুমি যে কত প্রকার কৌশল বিস্তার করিয়া রাখিয়াছ, তাহা কি বলিব! আমরা যখন আমাদিগকে নিতান্ত সহায়হীন মনে করি তখনও তোমার অকুমাঙ্গ করুণা আমাদিগের সহায় হইয়া নানা দুঃখ নিবারণ করে এবং যে অবস্থাকে আমরা নিতান্ত অমঙ্গলের হেতু মনে করি তন্মধ্যেও তুমি গূঢ় রূপে আমাদিগের নানা মঙ্গলের বীজ রক্ষা কর।

আহারনিদ্রা।

জীবমাত্রেই আহারনিদ্রার অধীন; কিন্তু সকল জীব জন্তুর আহার নিদ্রার এক প্রকার নিয়ম নহে। বিচিত্র নিয়মানুসারে বিচিত্র প্রকার জীব জন্তু আ-

হারাদি ভোগ করিয়া জীবন ধারণ করিয়া থাকে। মনুষ্য অপরাপর নানা বিষয়ে যেমন আর আর জীব জন্তু হইতে প্রধান, সেই রূপ আহার নিদ্রাদি কতিপয় দৈহিক ব্যাপার নির্ব্বাহ করণে অনেক জীব অপেক্ষাই অসম্পন্ন। অপরাপর জীব জন্তু যেমন স্বভাব-জাত ফল মূলাদি ভক্ষণ করিয়া এবং তরু শাখা বা বন বিবর ও গিরি কন্দরাদি সামান্য স্থানে বাস করিয়া জীবন ধারণ করিতে পারে, মনুষ্য সে রূপ করিতে পারে না। মনুষ্য বিশেষ যত্ন সহকারে চেষ্টা না করিলে ভোজন পানাদি কোন ব্যাপারই নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হয় না। বিশেষতঃ আহার নিদ্রা অভাবে মনুষ্যশরীর যত শীঘ্র নষ্ট হয়, প্রায় আর কোন প্রাণিরই সে রূপ হয় না। সর্প, মণ্ডূক ও ঊর্ণনাভ প্রভৃতি কতিপয় জন্তু মাসাবধি আহার পরিত্যাগ করিয়া জীবন ধারণ করিতে পারে, কিন্তু মনুষ্য উপর্য্যুপরি দুই তিন দিবস অনশন করিলেই মৃতপ্রায় হইয়া পড়ে। পরম করুণাকর পরমেশ্বর কি নিমিত্ত মনুষ্য জাতির ভোজন পানাদি ব্যাপার অন্যান্য জীব জন্তুর ন্যায় সুলভ ও সুসাধ্য করেন নাই, যখন আমরা ইহা বিবেচনা করিয়া দেখি তখন তন্মধ্যে কেবল মনুষ্যের সুখ সাধন ও সংসারের শ্রীবর্দ্ধন মাত্র তাঁহার উদ্দেশ্য দেখিতে পাই।

ভোজন পানাদি সম্পন্ন করণ বিষয়ে জগদীশ্বর মনুষ্য জাতিকে অপরাপর জীব জন্তুর ন্যায় কোন প্রকার স্বাভাবিক সহায় সম্পন্ন করেন নাই বটে, কিন্তু তাহাকে এক বুদ্ধি রূপ পরম সহায় প্রদান করাতে তাহার সমস্ত অসম্পন্নতা নিরাকৃত হইয়াছে, এবং ভোজন পানাদি নির্ব্বাহ করা সুলভ ও সুখের বিষয় হইয়াছে। মনুষ্য বুদ্ধি দ্বারা আশ্চর্য্য কৃষি বিদ্যার প্রচার করিয়া নানা প্রকার শস্যের উৎপত্তি করিতেছে, অপূর্ব্ব শিল্প জ্ঞান সংযোগে নানা বস্তুকে নানা রূপে পরিণত করিয়া নানা প্রকার সামগ্রী প্রস্তুত করিতেছে এবং সূপকরণ বিদ্যার প্রচার করিয়া চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় প্রভৃতি নানা বিধ উপাদেয় দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া সুখেতে ভক্ষণ করিতেছে। অপরাপর জীব জন্তুকে যেমন সর্ব্বদা আহার জন্য ব্যস্ত থাকিতে হয়, মনুষ্যকে সে প্রকার থাকিতে হয় না। মনুষ্য অত্যল্প কাল পরিশ্রম করিলেই আপনার জীবিকার উপযুক্ত অন্ন সংস্থান করিতে পারে এবং অবশিষ্ট কাল জ্ঞান ধর্ম্মাদি উৎকৃষ্ট বিষয়ের চর্চ্চায় ক্ষেপণ করিয়া মনুষ্যজন্মকে সফল করিতে সমর্থ হয়। বিশেষতঃ জগদীশ্বর ক্ষেত্র ও বীজের এমনি পরস্পর সম্বন্ধ নির্বন্ধ করিয়া দিয়াছেন যে এক জন মনুষ্য অতি অৎসামান্য কাল পরিশ্রম করিলে এত প্রচুর শস্য

উৎপাদন করিতে পারে যে তাহা উপভোগ করিয়া বহু সংখ্যক লোকে সম্বৎসরকাল জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হয়। পৃথিবীতে অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি প্রভৃতি উৎপাত দ্বারা শস্যের হানি হইয়া মধ্যে মধ্যে দুর্ভিক্ষাদি নানা প্রকার দৈব দুর্ঘটনা উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা এবং বাল, বৃদ্ধ, অন্ধ, খঞ্জ, প্রভৃতি নানা প্রকার অশক্ত লোকে স্বীয় শক্তি দ্বারা আপন উদর পূর্ত্তি করিতে অক্ষম, অতএব যদি এক জন মনুষ্যের পরিশ্রম দ্বারা তাহার প্রয়োজনাতিরিক্ত শস্য উৎপন্ন না হইত, তাহা হইলে দুর্ভিক্ষাদি দৈব উৎপাতে মনুষ্য কুল আহারাভাবে নষ্ট হইত এবং বাল, বৃদ্ধ জীর্ণ, শীর্ণ ও রোগাপন্ন শক্তিহীন লোকেও অন্ন প্রাপ্ত হইত না।

পরম কৌশলকারী পরম পুরুষ মনুষ্যের অন্ন প্রাপ্তি যদি এ প্রকার শ্রমসাধ্য ও যত্ন সাপেক্ষ না করিয়া ইতর জীব জন্তুর ন্যায় সুলভ ও সুসাধ্য করিতেন, তাহা হইলে যে আমাদিগের সুখের অনেক হানি হইত এবং সংসারের বিস্তর শোভা নষ্ট হইত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। শ্রমলব্ধ দ্রব্য যত সুখজনক বোধ হয়, যে দ্রব্যকে অনায়াসে উপার্জন করা যায় তাহাকে তত সুখদায়ক বোধ হয় না। মনুষ্য ভূমি কর্ষণ করিয়া পরিশ্রম পূর্ব্বক [illegible] অন্ন বলিয়াই সেই অন্ন তাহাকে এত

সুখদায়ক বোধ হয়। মনুষ্য যদি ইতর পশ্বাদির ন্যায় স্বভাবজাত ফল মূল ভক্ষণ করিয়া শরীর ধারণ করিতে পারিত, তাহা হইলে কোথায় বা কৃষিবিদ্যার প্রচার ও সূপক্রিয়া প্রভৃতি নানা প্রকার শিল্প বিদ্যার বিস্তার থাকিত এবং কি প্রকারেই বা পৃথিবী এরূপ শ্রীসম্পন্না হইত। মনুষ্য গিরি কন্দর ও বন বিবরে বাস করিতে অশক্ত বলিয়া নানা প্রকার গৃহ মন্দির অট্টালিকা-ময় নগর গ্রাম ও দেশের সৃষ্টি হইয়াছে, পক্ষ লোম প্রভৃতি স্বাভাবিক গাত্রাবরণ বর্জ্জিত বলিয়া বিচিত্র প্রকার লোমজ ও ঊর্ণজ বস্ত্রের প্রচার হইয়াছে এবং তাহার অন্ন প্রাপ্তির সুলভ উপায় না থাকাতেই পৃথিবীতে এত প্রকার উপাদেয় খাদ্যদ্রব্যের প্রচার হইয়াছে। তিনি আমাদি-গকে ক্ষুধা প্রদান করাতে আমাদিগের ভোজন ব্যাপার এত সুখের কারণ হইয়াছে এবং তদ্দ্বারা অনায়াসে আমাদিগের দেহ রক্ষা পাইতেছে। প্রাত্যহিক পরিশ্রম দ্বারা এবং দেহনিঃসৃত ঘর্ম্ম দ্বারা প্রতিদিন আমাদিগের শরীরের কিয়দংশ ক্ষয় হইয়া যায় এবং আমরা প্রত্যহ যে অন্ন পান গ্রহণ করি তদ্দ্বারা সেই অংশের পূরণ হয়। অতএব আমরা যদি আহার পরিত্যাগ করি, তাহা হইলে ক্রমে আমাদিগের শরীর ক্ষয় হইয়া ক্রমে

বনা হয়। কিন্তু জগদীশ্বর আমাদিগকে এক
। প্রদান করাতে কোন রূপেই উক্ত বিপদ
বার সম্ভাবনা নাই। শরীর রক্ষার জন্য যে
য় আমাদিগের অন্ন পান গ্রহণ করিবার আব-
ক হয়, সেই সময়েতেই ক্ষুধা আমাদিগের
য়াধক স্বরূপ হইয়া আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ
জনা করিতে থাকে এবং আমরাও উদ্যোগী
য়া আহারাদি করিয়া শরীরকে রক্ষা করি।
য় করুণাকর পরমেশ্বর ক্ষুধাকে এমনি আশ্চর্য্য
ক্তি সম্পন্ন করিয়া পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছেন,
আমরা কোন ক্রমেই তাহার অনুরোধ পরি-
গ করিতে সক্ষম হই না। আমরা যদিও এক-
কোন কারণে তাহার উপদেশকে অবজ্ঞা করি
: পরিণামে অবশ্যই আমাদিগকে তাহার
জ্ঞার অনুগত হইয়া তদনুযায়ী কার্য্য করিতে
এবং আমরা যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার উপদেশ
্য করিয়া অন্নাদি গ্রহণ না করি, ততক্ষণ পর্য্যন্ত
উত্তেজনা করিতে ক্ষান্ত হয় না। আমরা
তাঁহার প্রদত্ত ক্ষুধা তৃষ্ণা দ্বারা সময়ে সময়ে
জিত না হইতাম, তাহা হইলে কোন ক্রমেই
া আবশ্যক মত অন্ন পান গ্রহণ করিয়া শরীর
করিতে পারিতাম না। আমরা প্রত্যহ
ন পানাদি সমাধা করিতে বিরক্ত হইয়া কত

সময় ... ক্ষেপণ করিতাম এবং কত স
ক্রীড়া কৌতুক হাস্যালাপ অথবা শোক মে
গুরাগ দ্বেষ প্রভৃতি অসংখ্য বিষয়ে অন্যা
হইয়া আহারাদি করিতে বিরত থাকিতাম, এ
ক্রমে আমাদিগের শরীর শুষ্ক ও শীর্ণ হইয়া ব
হইত। কিন্তু তাঁহার প্রসাদে আমাদিগের এ স
বিপত্তি উপস্থিত হইতে পারে না। মনুষ্য স
প্রকার আমোদেই আমোদিত থাকুক, আর পু
শোকেই শোকাকুল হউক, তাঁহার নিয়ো
প্রহরী কখন তাহাকে সচেতন করিতে ত্রুটি ক
না এবং আপন আদেশ প্রতিপালন করাই
ক্ষান্ত থাকে না।

আহারের ন্যায় নিদ্রাও আমাদিগের পরমে
কারী এবং পরম সুখের বিষয়। জগদীশ্বর অ
দিগকে যে প্রকার শারীরিক প্রকৃতি ও মান
বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন এবং আমরা যে প্র
করিয়া দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকি, তা
আমাদিগের পক্ষে নিদ্রার নিতান্ত আবশ্য
নিদ্রা বিনা আমরা কোনরূপে শরীর ধারণ ক
পারিতাম না। কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী, প্র
সকল প্রাণিজাত জীবকেই নিদ্রার অধীন হ
হইতে হয় এবং সমস্ত জীবের পক্ষে নিদ্রাস
... হয়। শীতকাল উপস্থিত

যদি কোন কোন জন্তুর শরীর অতিশয় নিস্তেজ
।। তৎকালে হিম প্রতিবন্ধক হেতু তাহারা
বিত্র বিচরণ করিতে অশক্ত হওয়ায় তাহাদিগকে
বর মধ্যে বন্দির ন্যায় এক স্থানে আবদ্ধ থাকিতে
য়, সুতরাং তৎকালে তাহাদিগের আহার লাভের
ার কোন উপায় থাকে না, কিন্তু তখন তাহারা
ধিক কাল নিদ্রায় অভিভূত থাকাতে তাহাদিগের
ছুমাত্র অনশনের যন্ত্রণা বোধ হয় না। শীত-
ধান দেশে তুষার অভ্যন্তরেও অনেক জীব জন্তু
দ্রা যোগে অনশনাবস্থায় জীবিত থাকে। ব্যা-
দি যে সমস্ত হিংস্র পশু সর্ব্বদা আহার প্রাপ্ত না
য়, তাহাদিগেরও অধিক কাল নিদ্রাতে গত হইয়া
কে। নিদ্রা এই রূপে সকল প্রাণির পক্ষেই
খজনক ও মঙ্গল দায়ক হইয়া সংসার মধ্যে বিচ-
। করিতেছে। বিশেষতঃ আর আর সকল জীব
পেক্ষা নিদ্রা মনুষ্যের অনেক হিত সাধন করিয়া
কে। নিদ্রাবস্থায় মনুষ্যের শরীর ও মন উভয়ই
শ্রাম লাভ করে। মনুষ্য যত ক্ষণ জাগ্রত থাকে
ত ক্ষণ তাহার নানাবিধ শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা
মন দৈহিক বলের হানি হয়, সেইরূপ অবিশ্রান্ত
নসিক শ্রম জন্য মনও নিস্তেজ হয়। সুতরাং
দ্রাভাবে আর আর পশু অপেক্ষা মনুষ্য অতি-
স্ত্র অবসন্ন হইয়া পড়ে। জাগ্রদবস্থায় যেরূপ মনুষ্য

চেষ্টা দ্বারা শারীরিক শ্রম হইতে বিরত থাকিতে পারে, কিন্তু যত ক্ষণ নিদ্রার আবির্ভাব না হয়, তত ক্ষণ তাহার মানসিক বৃত্তি সকল অনবরত সঞ্চালিত হইতে থাকে। নিদ্রা ভিন্ন আর কোন রূপেই মনের বিশ্রাম পাইবার উপায় নাই। অতএব আর আর সকল জীবের অপেক্ষা মনুষ্যের পক্ষেই নিদ্রার নিতান্ত প্রয়োজন, মনুষ্যকে অনবরত জাগ্রত থাকিতে হইলে অচিরেই তাহার দেহ ভঙ্গ হইত সন্দেহ নাই। জগদীশ্বর পৃথিবীতে নিদ্রার সৃষ্টি করিয়া মনুষ্যের প্রতিই অধিক করুণা বর্ষণ করিয়াছেন। মনুষ্য যতক্ষণ নিদ্রিত থাকে, ততক্ষণ তাহার শরীর এবং মন যেন গুণ-মুক্ত ধনুর ন্যায় আরাম প্রাপ্ত হয়, তখন তাহার সমস্ত শরীর শিথিল হয় এবং হৃদয় ও বক্ষদেশস্থ-বায়ু প্রবল বেগে সঞ্চালিত হইতে আরম্ভ করে। নিদ্রাবস্থায় শিরাপথে শোণিত ধারা সত্বরবেগে গতায়াত করাতে অতি সহজে শরীরের নষ্ট পদার্থ সব লোম পথে ঘর্ম দ্বারা নির্গত হইয়া যায়, এবং মনুষ্যের শরীর প্রকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হয়। অনিদ্রা মনুষ্যের অশেষ রোগের কারণ। অনিদ্রা হেতু তাহাকে যে বিজাতীয় যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় তাহা অনেকেরই বিদিত আছে। চিকিৎসকেরা নিঃসংশয় হইয়া স্থির করিয়াছেন, যে অনিদ্রা

নুষ্যের জঠরাগ্নি মন্দীভূত হয়, শোণিত
ইয়া বিকৃত হইতে থাকে এবং মন দুর্ব্বল
নানা প্রকার মানসিক রোগ উপস্থিত হই-
ম্ভাবনা হয়। অনাহার দ্বারা যেমন শরীর
য়, অনিদ্রা জন্য তেমনি মন দুর্ব্বল হইতে
জগদীশ্বর যে, জীবের বিশেষ কল্যাণের
া নিদ্রার সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাতে আর
নাই, কিন্তু তিনি এই নিদ্রা রূপ পরম সুখ
ও সীমা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, সুখার্থী
তাঁহার নির্দ্দিষ্ট সীমা লঙ্ঘন করিলে তৎ-
তাহার ফল ভোগ করিতে হয়। অনিদ্রাতে
মনুষ্যশরীর অবিলম্বে নষ্ট হয়, অতিশয়
রাও সেই রূপ তাহার অশেষ প্রকার অনর্থ
অপরিমিত রূপে নিদ্রা ভোগ করিলে,
শরীর অবসাদগ্রস্ত হইয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া
দ্ধি জড়ীভূত হইয়া যায় এবং স্মৃতিশক্তির
হইতে থাকে। বিবেচনা করিয়া দেখিলে
লেই বুঝিতে পারেন, যে নিদ্রালু লোকের
জীবন বলিয়াই গণ্য হইতে পারে না, তা-
হিত অচেতন জড় বস্তুর আর কিছুমাত্র
থাকে না। [illegible] জানি মনুষ্য যদি অতিশয়
লু হইয়া [illegible] জীবন গত করে, এই আশ-
গদীশ্বর [illegible] সহিত নানা প্রকার

দুঃখের সংযোগ করিয়া রাখিয়াছেন, মনুষ্য যে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া অপরিমি রূপে নিদ্রার বশীভূত হয়, অমনি তদানুসারে দুঃখ রাশি ভোগ করিয়া শিক্ষা পাইতে থাকে তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণ জগদীশ্বরের এই নিয়ম সম্ব করিয়া ব্যক্তিবিশেষের ও ব্যবসায়ীবিশেষের নিদ্রা ভোগের পরিমাণ স্থির করিয়াছেন। তাঁ দেখিয়াছেন, যে যে সমস্ত লোককে দৈ পরিশ্রম ব্যতীত কোন প্রকার মানসিক প করিতে না হয়, তাহারা অল্পক্ষণ নিদ্রা যাই তাহাদের শরীর সুস্থ থাকিতে পারে, কিন্তু যে লোক অধিক কাল মানসিক পরিশ্রম করিয়া থ তাহাদিগের অধিক কাল নিদ্রিত থাকা নি উচিত। গ্রন্থকার ও অপরাপর বিদ্যাব্য লোকে যে পরিমাণে আপন আপন মনে সঞ্চালন করে, সেই পরিমাণে তাহাদিগকে প্রদান না করিলে অবিলম্বেই তাহারা অ হইয়া যায়। এই রূপ নির্দ্দিষ্ট নিয়মে নিদ্রা ভোগ করিলে সকল মনুষ্যই সুখী ও হইতে পারে। জগদীশ্বর আমাদিগকে সুখ রণ করিবার উদ্দেশেই সংসারের সমস্ত সৃজন করিয়াছেন, আমরা তাঁহার নির্দ্দিষ্ট প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যে বিষয় ভোগ করি, তা

ইতে পারি। তাঁহার অনুজ্ঞা লঙ্ঘনই
গর দুঃখের হেতু এবং তাঁহার আজ্ঞা
সকল সুখের মূলাধার।

দর্শনেন্দ্রিয়।

বিশ্ব কৌশলকারী বিশ্বেশ্বর আমাদিগের
ন্দ্রিয় চক্ষুতে এত প্রকার কৌশল প্রকাশ কা
যে তাহা কোন রূপেই বর্ণন করিয়া শেষ হ
না এবং তাহা কোন প্রকারেই বাক্যদ্বারা
প্রকাশ করিবার সাধ্য হয় না। আমরা চক্ষু
যত পর্য্যালোচনা করি, ততই তাঁহার নূত
কৌশল দেখিতে পাই। বোধ হয় যেন
গের জ্ঞানোন্নতি সহকারে চক্ষু বিষয়ক কৌ
উন্নতি হইতেছে। দিন দিন যত আমাদিগে
বর্দ্ধিত হইতেছে, ততই আমরা বিশ্ব মধ্যে
অনুপম হস্তের আশ্চর্য্য নিদর্শন সকল আ
ত্যক্ষ করিতেছি।

চক্ষু যে আমাদিগের দেহের সার এবং জ
চক্ষু প্রদান করিয়া যে অশেষবিধ দুঃখ
পূর্ব্বক আমাদিগকে অনন্ত প্রকার সুখ
অধিকারী ...., তাহাতে কিছু মাত্র
নাই। যাহার কিছু মাত্র বিদ্যা বুদ্ধিশক্তি
মাত্র জ্ঞান শক্তি নাই, সে ব্যক্তিও
বিবেচনা করিয়া দেখিলে অনায়াসে বুঝিতে
যে আমরা দর্শনেন্দ্রিয় বিহীন হইলে আ

জন্ম প্রায় নিরর্থক হইত এবং আমাদিগের
ং আর সীমা থাকিত না। চক্ষু দ্বারা আমরা
ন্তর্গত সমুদায় সুন্দর পদার্থ সন্দর্শন করিয়া
হইতেছি. ভক্তিভাজন পিতা মাতা ও প্রণ-
াদ বন্ধু বান্ধব এবং স্নেহাস্পদ পুত্র কন্যাদির
ন্দকর মুখ সন্দর্শন করিয়া তৃপ্ত হইতেছি এবং
সহস্র মনুষ্যের মধ্য হইতে আপন পরিচিত
ককে বহু দূর হইতে অনায়াসে নির্ণয় করিতে
হইতেছি। চক্ষুর সাহায্যে আমরা নানা প্র-
জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ সকল অধ্যয়ন করিয়া নানা
ায় ও নানা কালীন প্রবীণ পণ্ডিতদিগের
ক্য ও অদৃশ্য হৃদয়ভাণ্ডারের জ্ঞানরত্ন সকল
় করিয়া চরিতার্থ হইতেছি এবং মর্ত্ত্য লোক-
া ক্ষুদ্র কীট হইয়া দূরাৎ সুদূরস্থিত নভোম-
ার সূর্য্য চন্দ্র ও গ্রহ নক্ষত্রাদির নানা তত্ত্ব
াত হইয়া মনুষ্যমাত্রের গৌরব বৃদ্ধি করিতেছি।
দ্বারা যে আমরা কত সময় কত প্রকার বিপদ
াক্রম করিতে সমর্থ হইতেছি এবং কত সময়
প্রকার সুখের আস্বাদ গ্রহণ করিতেছি, তাহা
ার অতীত। করুণাকর জগদীশ্বর আমাদিগকে
চক্ষুঃ প্রদান না করিতেন, তাহা হইলে কোথায়
ারদীয় সুনির্ম্মল পূর্ণ শশধর সন্দর্শন জনিত
ানন্দ, কোথায় বা জলাবরণশায়ী বিকশিত

শতদলের অকৃত্রিম মনোহর শোভা
সুখ এবং কোথায় বা সুশোভন হরিত
শস্য ক্ষেত্র পূর্ণ প্রসারিত প্রান্তর, বা নয়
রিক্ত সুদূরপ্রস্থিত নিবিড়ারণ্য ও অবির
মণ্ডিত শ্বেত পর্ব্বতের উচ্চতর শিখর প্রভৃ
বিনোদকর নৈসর্গিক শোভাবলোকনের
আনন্দ থাকিত. আমরা এসমস্ত প্রকার সুখ
করণে বঞ্চিতই থাকিতম। আমাদিগের
থাকিলে এতাদৃশ সুখ সম্ভোগ করা দূরে
আমাদিগকে যাদৃশ যন্ত্রণা সহ্য করিতে
তাহা কি বলিব! তাহা চক্ষুহীন দুর্ভাগা ভ
ক্তিই বিলক্ষণ অবগত আছে। অতএব পর
মনুষ্য শরীরে চক্ষের রচনা করিয়া যে আ
অসীম মহিমা বিস্তার করিয়াছেন, তাহাতে
সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি চক্ষু বিষয়ক এই
সুখকর ব্যাপার সম্পাদনার্থে যে সমস্ত সূক্ষ্ম
কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন, যখন আমরা
বিশেষরূপে আলোচনা করিয়া দেখি তখন অ
দিগকে এক কালে বিমোহিত হইতে হয়, ও
আমাদিগের মন একেবারে তাঁহার অগাধ ম
সাগরে মগ্ন হইয়া যায়।

চক্ষু অতি চমৎকার পদার্থ। চক্ষেতে জগদ
যে সমস্ত অনুপম কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন,

দূরবীক্ষণ যন্ত্রে ও তাহার সহস্রাংশের কৌশল দেখিতে পাওয়া যায় না। শরীর-জগদীশ্বর যে প্রকার স্থানে চক্ষু সংস্থাপন করেন, যে রূপে তাহার গঠন করিয়াছেন এবং যে নিয়মে রক্ষা করিতেছেন সে সমুদায়ই বিস্ময়কর। তাহার এক একটি বিষয় দেখিলেই বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। কোন যেমন কোন দুর্গের উচ্চ স্থানে দণ্ডায়মান অবলীলাক্রমে আপনার চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ েই রূপ চক্ষুও আমাদিগের মুখ মণ্ডলের গে অবস্থিত হইয়া এক দৃষ্টিতে অর্দ্ধ জগৎ ন করিতেছে, শরীরের মধ্যে আর কোন চক্ষু যোজিত হইলে এপ্রকারে আমাদিগের য়া সম্পন্ন হইতে পারিত না। আপাদমশরীর একে একে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে এই রূপে নাসামূলের উভয় পার্শ্বেই য়া বিলক্ষণ সঙ্গত ও সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট-া বোধ হয়। কোন দুর্লভ ও উৎকৃষ্টতর ান মনুষ্য যেমন অতিযত্ন পূর্ব্বক লৌহ ধ্যে সাবধানে রক্ষা করে, চক্ষুকেও জগদী-রূপ যত্ন সহকারে সাবধানে রক্ষা করিয়া-যে। চক্ষেতে কোন প্রকার আঘাত লাগি-না নাই। আমাদিগের চক্ষু এক আশ্চর্য্য

। যে পদার্থ এক স্থানে কাচসদৃশ স্বচ্ছ
ধারণ করিয়াছে, স্থানান্তরে সেই পদার্থ আ-
অস্বচ্ছ রূপে পরিণত হইয়াছে, যে শিরা
স্থানে অতি সূক্ষ্ম ও কোমল হইয়া রহিয়াছে,
ন্তরে সেই শিরা পুনর্ব্বার স্থূল ও দৃঢ় ভাবে
ণত হইয়াছে। চক্ষুর অন্তর্গত শিরাদি
র্থ সকল এই রূপে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন
। পরিণত হইয়া এই অপূর্ব্ব দৃষ্টি যন্ত্রের উৎ-
হইয়াছে।

ক্ষুর ন্যায় অপূর্ব্ব দৃষ্টিযন্ত্র কেহ মনেতেও
না করিতে পারে না। জগদীশ্বর চক্ষুকে দৃষ্টি
র আদর্শ স্বরূপ করিয়াছেন। অনেক পণ্ডিত
র অনুকরণ করিয়া দূরবীক্ষণাদি দৃষ্টি যন্ত্রের
ক দোষ পরিহার করিয়াছেন। পূর্ব্বে দূরবী-
যন্ত্র দ্বারা নানা বর্ণের পদার্থ সকল এক্ষণকার
য় পরিষ্কার রূপে দৃষ্ট হইত না, যন্ত্রের দোষে
ষ্ট বস্তু সকলকে বর্ণানুসারে কিছু কিছু অপ-
র বোধ হইত। অনন্তর জেম্সগ্রেগোরি
ক এক জন সাহেব চক্ষুর কৌশল অবগত
া তদনুযায়ী যন্ত্র প্রস্তুত করাতে উক্ত দোষের
হার হইল, উল্লিখিত সাহেব দেখিয়াছিলেন,
জগদীশ্বর চক্ষুকে এমনি অপূর্ব্ব কৌশলে রচনা
য়াছেন যে তাহাতে সর্ব্বদা সকল বর্ণের সর্ব্ব

প্রকার পদার্থই সমান পরিষ্কার দেখায়. (
বস্তুকেই অপরিষ্কার বোধ হয় না।

দূরবীক্ষণ যন্ত্র অপেক্ষা চক্ষুকে আর এক
ষেও উৎকৃষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত
দ্বারা যখন যে বস্তুকে দেখিতে হয়, তখন
বস্তুর দূরাদূরানুসারে যন্ত্রের প্রকার ভেদ ক
না লইলে তাহা সুচারু রূপে দৃষ্ট হয় না। দূ
ক্ষণকে যে ভাবে রক্ষা করিয়া কোন নিকটস্থ
দেখিতে হয়, তাহাকে সে ভাবে রক্ষা কর্
তদ্দ্বারা কোন দূরস্থ বস্তু পরিষ্কার রূপে দে
পাওয়া যায় না। লক্ষ্য বস্তুর দূরাদূরানুস
প্রতিবারই যন্ত্রকে হ্রস্ব ও দীর্ঘ করিতে হয়। (
চক্ষুকে পরমেশ্বর এমনি অপূর্ব্ব কৌশলে র
করিয়াছেন, যে তাহা এই রূপ এক ভাব প্রা
ব্যাই সর্ব্বদা সকল স্থানের ও সকল দিকের ব
সমান পরিষ্কার দেখে। ছয় অঙ্গুলি স্থান ব্যবধা
বস্তুকেও আমরা চক্ষেতে দেখিতে পাই এবং
শত হস্ত দূরের পদার্থকেও সন্দর্শন করি। (
এই রূপ বিভিন্ন প্রকার দৃষ্টি ক্রিয়া সাধন স্থ
চক্ষু যে কখন্ কি প্রকার ভাব ধারণ করে ত
আমরা জানিতেও পারি না, আমাদিগের অজ্ঞ
সারে চক্ষু আপন উপযুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হ
স্বীয় কার্য্য সাধন করে।

আকৃতির বিষয় আলোচনা করিলেও
জগদীশ্বরের অতুল মহিমা দেখিতে পাই।
র আমাদিগের চক্ষুর্দ্বয়কে কূর্ম্ম পৃষ্ঠের
ন্যায় গোলাকার করিয়াছেন, কিন্তু ইহা
দৃষ্ট হইতেছে যে চক্ষুর এই রূপ আকার
ত তদ্দ্বারা যাদৃশ কার্য্য দর্শিতেছে, অন্য
প্রকার আকৃতি দ্বারাই সে রূপ কর্ম্ম দর্শিত
কু এই প্রকার ঈষৎ গোলাকার হওয়াতে
আমরা এক কালে অধিক দূর দৃষ্টি করিতে
হইতেছি, তাহাকে অনায়াসে সকল দিকে
ন করিতে সক্ষম হইতেছি এবং তন্মধ্যে
সে জলীয় পদার্থ বিদ্যমান থাকিয়া তাহাকে
সিক্ত রাখিতেছে। চক্ষুর উপরিভাগ এই
র্ম্মপৃষ্ঠাকার না হইয়া সমান স্থূল হইলে
কোন মতেই বহু দূর সন্দর্শন করিতে
াম না এবং এই সমস্ত দৃশ্য পদার্থ আমা-
চক্ষে এপ্রকার সুন্দর বোধ হইত না, তাহা
আমাদিগের দর্শন ক্রিয়ার অনেক ব্যতিক্রম
বিশ্ব রচয়িতা বিশ্বেশ্বর বিশেষ বিবেচনা
ই আমাদিগের চক্ষুকে এপ্রকার আকারে
করিয়াছেন।

দীশ্বর আমাদিগের চক্ষুকে এমন অপূর্ব্ব
প্রদান করিয়াছেন, যে আমরা মনে করিলে

এক স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া আপনার তিন
অবলোকন করিতে পারি এবং ঊর্দ্ধাধঃদি
দৃষ্টিপাত করিতে সমর্থ হই। ছয়টি অদ্ভুত ম
পেশী দ্বারা চক্ষুর এই রূপ সঞ্চালন ক্রিয়া স
হয়। উহার মধ্যে চারিটি মাংসপেশী সরল
অবস্থিত আছে, আর দুইটি বক্র ভাবে সংস্থা
উল্লিখিত সরল মাংসপেশী চতুষ্টয় দ্বারা চক্ষু ক
টাভিমুখে ঊর্দ্ধদিকে ও নিম্নভাবে নাসাগ্রে
সঞ্চালিত হয়, আর বক্র মাংসপেশী দুইটি
চক্ষুকে অনির্দ্দিষ্টভাবে নানা প্রকারে সঞ্চা
করে। জগদীশ্বর চক্ষুতে এই ছয়টি অ
মাংসপেশী নিয়োগ করাতেই আমরা ইচ্ছা
সকল দিকে চক্ষুঃ সঞ্চালন করিয়া আপনাদি
দৃষ্টি ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিতেছি, তিনি যদি চ
এপ্রকার মাংসপেশী যোজনা না করিতে
তাহা হইলে আমরা কোন মতেই ইচ্ছা পূ
সকল দিকে নেত্র সঞ্চালন করিতে পারি
না এবং তাহা হইলে আমাদিগের চক্ষুঃ
থাকাই অনর্থক হইত। অতএব চক্ষুর স
লন ক্রিয়া বর্ণন করিলেও ঈশ্বরের করুণা অনু
হয়।

প্রত্যেক মনুষ্যকেই জগদীশ্বর দুই চক্ষু প্র
করিয়াছেন, কিন্তু কি জন্য যে তিনি আমাদি

ভাবে সন্দর্শন করিলে ঐ চিহ্নত্রয়ের উভয় পার্শ্বের দুইটি চিহ্নকেই সুস্পষ্ট যায়, মধ্যস্থিত চিহ্নটিকে দেখিতে পাওয়া না, অর্থাৎ যে বিন্দুটি চক্ষের দৃষ্টিশক্তিহীন স্থলে পতিত হয়, সেইটি অদৃষ্ট থাকে। আমাদি- এক চক্ষু মাত্র হইলে প্রত্যেক দর্শন ক্রিয়া- উল্লিখিত রূপ ব্যাঘাত উপস্থিত হইত, আমরা পদার্থকেই সম্যক রূপে সন্দর্শন করিতে তাম না এবং কোন রূপেই এক দৃষ্টিতে সর্ব্বদা বস্তু অবলোকন করিতে সমর্থ হইতাম না। াকর জগদীশ্বর আমাদিগকে নেত্রদ্বয় প্রদান য়া উক্ত দোষের পরিহার করিয়াছেন, আমরা চক্ষুদ্বারা যে বস্তুকে অথবা যে বস্তুর যে ভাগকে তে না পাই, আমাদিগের অন্য চক্ষু দ্বারা সেই বা এবং বস্তুর সেই ভাগ অনায়াসে লক্ষিত আমাদিগের উভয় চক্ষু সর্ব্বদা এইরূপ পর- সাহায্য করাতে আমাদিগের দৃষ্টিক্রিয়া ত্রে ও সুন্দর রূপে সম্পন্ন হইতেছে।

আমাদিগের দৃষ্টি ক্রিয়া সম্বন্ধে ঐন্দ্রজালিক এবং কয়েকটি বিস্ময়কর ব্যাপার বিদ্যমান । এতদ্দেশজ্ঞ পণ্ডিতেরা বিশেষ রূপে পরীক্ষা দেখিয়াছেন, যে বস্তুতঃ প্রত্যেক দৃশ্য ক আমাদিগের চক্ষে দুই দুইটি দেখায়, কিন্তু

জগদীশ্বর আমাদিগের শরীরে কি এক আশ্চর্য কৌশল করিয়াছেন, এবং আমাদিগকে কি প্র কার অনির্ব্বচনীয় শক্তি প্রদান করিয়াছেন, আমরা তাঁহার প্রসাদাৎ এক বস্তুকে দুই চক্ষুদ্বা দুই দেখিয়াও কখন ভ্রমে পতিত হই না। তাঁ অনির্ব্বচনীয় মহিমা প্রভাবে এক বস্তুকে আ দিগের একটি মাত্রই বোধ হয়। দ্বিতীয়তঃ কোন অন্ধকার গৃহ মধ্যে কেবল একমাত্র ক্ষুদ্র দ্বারা বাহিরের বস্তু সকলের প্রতিবিম্ব আ করে, তখন প্রত্যেক বস্তুর ছায়া সেই গৃ ভিত্তিতে বিপরীত ভাবে পতিত হয়। আমাদি চক্ষু দৃশ্য বস্তু সম্বন্ধে অতি ক্ষুদ্র পদার্থ, সু চক্ষুতেও যখন দৃশ্য বস্তু সকলের প্রতিরূপ হয়, তখন তাহা উল্লিখিত রূপে বিপরীত পড়ে। কিন্তু পরমকৌশলকারী জগদীশ্বর ক্রিয়াতে এমনি আশ্চর্য্য কৌশল প্রকাশ ক ছেন, যে আমরা কখনই কোন বস্তুকে বিপ দেখি না; আমরা তাঁহার মহিমা প্রভাবে দৃষ্টি সকল বস্তুরই প্রকৃত আকার দেখিতে পাই। পরীক্ষাদ্বারা অবধারিত হইয়াছে যে আমা চক্ষুতে দৃশ্য বস্তুর প্রতিরূপ চিত্রিত হওয় আমরা তাহা দেখিতে পাই, অতএব আমা এই বিন্দু মাত্র চক্ষুদ্বারা বৃহৎ বৃক্ষ, উচ্চতর

দর্শনেন্দ্রিয়।

জগদীশ্বর চক্ষুতে এক অপূর্ব্ব উৎস করিয়া রাখিয়া ছেন, আবশ্যক হইলে আপনা হইতে সেই উৎ হইতে জল নির্গত হইয়া চক্ষুকে [illegible] রাখে।

জগদীশ্বর জীবের চক্ষু রচনা বিষয়ে এক প্র কৌশল প্রকাশ করিয়া ক্ষান্ত হয়েন নাই; বিশেষ বিশেষ জন্তুর চক্ষুতে বিশেষ বিশেষ নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া আপনার করুণার প্রচার করিয়াছেন। যে জন্তু যে প্রকার [illegible] করে এবং যে জন্তু যে প্রকারে অবস্থিতি তাহার চক্ষু সম্পূর্ণ রূপে তদুপযোগী করিয়া পক্ষিজাতির চক্ষু মনুষ্যের ন্যায় নহে। উহা চক্ষু এক প্রকার সূক্ষ্ম ত্বক দ্বারা আবৃত দে পাওয়া যায়, উহারা ইচ্ছা করিলে ঐ ত্বক চক্ষু আবৃত করিয়া রাখিতে পারে এবং [illegible] জনমতে অনাবৃত করিতেও সমর্থ হয়। দিগের ঐ নেত্রাবরণত্বক এমন চমৎকার রূপে নির্ম্মিত, যে তদ্দ্বারা চক্ষু আবৃত থাকিলেও জাতির দৃষ্টি ক্রিয়ার কিছু মাত্র ব্যাঘাত জন্মে মৎস্যাদি অনেক প্রকার জল জন্তু সর্ব্বদা মধ্যে বাস করে, এজন্য তাহাদিগের চক্ষে কো [illegible] দেখিতে পাওয়া যায়। মৎস্যাদি জল চক্ষুর গঠন আমাদিগের চক্ষুর ন্যায় নহে, [illegible] চক্ষু সম্পূর্ণ গোলাকার। কোন

ইহা অপেক্ষা সমধিক বলবান্ হইলে ও সুস্বর আমাদিগের কর্ণে কঠোর ও ক... হইত এবং কিঞ্চিৎ দুর্ব্বল হইলেও আমরা ও শব্দ শ্রবণ করিতে না পাইয়া বিপদস্থ হই

করুণাময় জগদীশ্বর আমাদিগের শ্রব... কর্ণের সহিত শব্দের যে ... অদ্ভুত সম্বন্ধ করিয়াছেন, তাহা এক... বর্ণন করিয়া করা যায় না। কোন প্রকার সুস্বর শ্রবণ হ... আমরা তাহাতে কর্ণ পাত না করিয়া কোন ... নিরস্ত থাকিতে পারি না, সুস্বরের উৎপত্তি আমাদিগের মন আপনা হইতে তাহাত... হইতে থাকে। শব্দেতে ও শ্রবণেন্দ্রিয়ে ... প্রকার চমৎকার সম্বন্ধ সন্দর্শন করিয়া পূর্ব্ব ... লোকে কত প্রকার অদ্ভুত ... কল্পনা ... ছিল। এপ্রকার প্রবাদ আছে যে কোন এক ... সাগর মধ্যে পোত হইতে বংশীধ্বনি করিয়া সুমধুর স্বর দ্বারা নানা প্রকার জল জন্তুকে ... করিত, কেহ বা স্বীয় কণ্ঠনিঃসৃত সুধাময় ... দ্বারা নানা প্রকার উৎকট রোগের প্রতীকার ... এবং কোন কোন সঙ্গীতনিপুণ ব্যক্তি অলৌকিক গান্ধর্ব্ব বিদ্যাবলে মহ... উন্মত্ত করিতে পারিত। সঙ্গীতের মধ্যে হিন ... প্রভাবে পাষাণ দ্রবীভূত হওয়া, মৃত জীবিত

...রে আকৃষ্ট হইয়া ব্যাধ কর্তৃক
...হা অনেকেই অবগত আছেন। অদ্যাপি
...ড়ী বাদ্য করিয়া বিবরস্থ ভুজঙ্গকে ধৃত
...য়। বিষধর ভুজঙ্গ জাতিকেও যে
...র সুধাময় সঙ্গীত সুধাপানের অধিকারী
ছেন, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।
যারা সাপ খেলাইবার সময় এক প্রকার যে
ক্রিয়া দ্বারা সর্পগণকে শান্ত রাখে, আর
বণিকেরা যখন আফ্রিকার প্রশস্ত প্রশস্ত
অতিক্রম করিয়া দেশান্তরে বাণিজ্য করিতে
করে, তৎকালে তাহাদিগের পণ্যভারবা
সকল ক্ষুৎ পিপাসায় শ্রান্ত হইলে উষ্ট্র
এক প্রকার গীত করিয়া ঐ সকল পরি
ভারাক্রান্ত উষ্ট্রের পথশ্রান্তি দূর করে।

ডেনমার্কস্থ নৃপতি ... ...নি একদ
...কের শক্তি পরীক্ষা করণার্থে ইচ্ছুক হই
... গায়ককে আদেশ করিলেন, "
... সঙ্গীতালাপ দ্বারা সহজ মনুষ্যকে
...রিবার যে গর্ব্ব কর, তাহা অদ্য আমায়
দেখাও।" গায়ক রাজার এই আদেশা
এমনি অপূর্ব্ব সঙ্গীত আরম্ভ করিল, যে তৎ
ঐ রাজা স্বয়ং ... ... উন্মাদ গ্রস্ত
পড়িলেন এবং উন্মত্ত ... ...নিকটস্থ চা

প্রকৃত আকার দেখিতে পাই এবং দুই কালে সঞ্চালন করাতে একেবারে আ তিন দিকের সকল বস্তু প্রত্যক্ষ ভূত হয়। যের শরীরের উভয় পার্শ্বে এই কপ চক্ষু সংযোজিত না থাকিলে আমরা ক স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া ও একবার চক্ষু করিয়া অর্দ্ধ জগৎ অবলোকন করিতে পাই আমরা একচক্ষু হইলে আমাদিগকে এ অপেক্ষা অনেক প্রকার দৃষ্টিসুখে বঞ্চিত হইত এবং আমাদিগের দর্শন কার্য্যেরও ব্যাঘাত জন্মিত। এক চক্ষু যে কত অসুখে তাহা কাণ ব্যক্তিই বিলক্ষণ অবগত জগদীশ্বরের নিকট হইতে আমরা দুই হওয়াতে আর একটি মহৎ দোষের পরিহ যাছে। প্রত্যেক চক্ষেতেই এমনি একটি স্থা যে সে স্থানে দৃশ্য বস্তুর যে ভাগ পতিত হ দৃষ্ট হয় না, কেবল এক চক্ষু দ্বারা কে সন্দর্শন করিলে যে তাহার সমুদায় অ হয় না, ইহা অনায়াসেই পরীক্ষা করি যাইতে পারে। কোন শ্বেত বর্ণ ভিত্তি চক্ষুর সঙ্গে সমান উচ্চ স্থানে তিনটি বিন্দু পরস্পর এক এক হস্ত অন্তরে চিহ্নি কিঞ্চিৎ দূর হইতে এক চক্ষু দ্বারা খি

শ্রবণেন্দ্রিয়।

দর্শনেন্দ্রিয় চক্ষুর ন্যায় আমাদিগের শ্র
কর্ণেতেও পরম কৌশলকারী পরম পুরুষে
পন কৌশল বিদ্যমান আছে। আমাদিগে
ক্রিয়া সম্পন্ন হইবার জন্য জগদীশ্বর কে
প্রকার সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম কৌশল প্রকাশ কা
যদিও আমরা তাহা সম্যক্‌রূপে অবগত হ
পারি তথাপি সামান্যতঃ কর্ণের অভ্যন্তর
ভাগে দৃষ্টিপাত করিলেও তাঁহার অনা
অনন্ত শক্তি ও অপার করুণার সম্পূর্ণ
দেখিতে পাওয়া যায়।

কর্ণ একটি অপূর্ব্ব যন্ত্র, জগদীশ্বর ক
অপূর্ব্ব কৌশলে নির্ম্মাণ করিয়াছেন, যে
আমরা অনায়াসে সকল প্রকার শব্দ শ্র
করিতে সমর্থ হই। আমাদিগের কর্ণকুহরে
কোন প্রকার শব্দ প্রবিষ্ট হয় আমরা ত
তাহা অনুভব করিতে পারি। পদার্থ
পণ্ডিতেরা নিরূপণ করিয়াছেন, যে বায়ু
ক্রিয়া দ্বারা শব্দের উৎপত্তি হয়, কিন্তু ক
মধ্যে যে কি প্রকারে স্পন্দিত বায়ু দ্বারা
অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন প্রকার শব্দের উৎ

ন্তুর প্রাণ নষ্ট করিলেন।* ফ্রান্স রাজ্যে ...ার এক ব্যক্তি উন্মত্ত কোন লোকের আশ্চর্য্য ... বাদ্য শ্রবণ করিয়া দীর্ঘ কালের উন্মাদ রোগ ... আরোগ্য লাভ করিয়াছিল।* সঙ্গীতের ... মোহিনী শক্তির এই রূপ অনেক উদাহরণ ... হওয়া যায়। ফলতঃ করুণানিধান বিশ্বপিতা ...দের সহিত শ্রবণেন্দ্রিয়ের অনির্বচনীয় সম্বন্ধ ... করিয়া আপনার মহিমা রাশি প্রকাশ করি... তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। তিনি ... আমাদিগের বিপদুদ্ধার ও সুখ বিস্তারের ...শে অসংখ্য প্রকার মধুর স্বরের সৃষ্টি করিয়া- ... এবং তাহা সম্ভোগ করিবার জন্য আমাদি- ... এই আশ্চর্য্য শ্রবণেন্দ্রিয় প্রদান করিয়াছেন। ...ল প্রভৃতি যে সকল সুরব বিহঙ্গ কুলের ... শ্রবণ করিলে সুখের সঞ্চার হয়, তাহারা ...া বিশেষে ও ঋতু বিশেষে লোকালয়ের সন্নি- ...াগমন করিয়া সুখেতে গান করিতে থাকে ... অনেক সুস্বর পক্ষী কোন প্রকার সঙ্গীত শ্রবণ করিলে তাহাতে স্বীয় স্বর মিশ্রিত ... চিত্তের বিনোদ জন্মায়। অরণ্য মধ্যে যে ... কোন মনুষ্যের বাস থাকে, সুরব বিহঙ্গ কুল ... না হইতে সেই স্থলে সমাগত হইয়া গান

* ...ldsmith's History of Animals, vol. 1st to 79.

করে। অনেক ভ্রমণকারি লোকে পক্ষীবিশে সন্দর্শন করিয়া সন্নিহিত লোকালয় জা পারে। একজন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার* ব্যক্ত ক যে তিনি একদা রুসিয়া রাজ্যান্তর্ব্বর্ত্তী কোন ব মধ্যে ন্যূন দুই শত যোজন পথ পর্য্যটন ক লোকালয়ের নিকট ভিন্ন আর কোন স্থলে জাতি সন্দর্শন করেন নাই। আর এক জন ভ্র কারী† ব্যক্ত করিয়াছেন, যে তিনি কোন কোন স্থানে ভ্রমণ করিতে করিতে কোন মনুষ্য না পাইয়া ক্ষুৎ পিপাসায় মৃতকল্প হইয়াছিলে অনন্তর এক দল শুক পক্ষী সন্দর্শন করিয়া তা দিগের পশ্চাদ্বর্ত্তী হওয়াতে ক্রমে লোকা প্রাপ্ত হইয়া প্রাণ দান পাইলেন। এইরূপ অ প্রকার পক্ষীর আচার দৃষ্টে বোধ হয় যে, জগদী যেন আমাদিগের শ্রবণেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধন ক রার উদ্দেশেই সমস্ত সুমধুর স্বরের সৃষ্টি করি ছেন। তিনি আমাদিগকে শ্রবণেন্দ্রিয় প্রদান ক যদি শব্দের সৃষ্টি না করিতেন তাহা হইলে উহা নিরর্থক হইত এবং সমস্ত শব্দ সৃজন ক তাহা গ্রহণ করিবার ইন্দ্রিয় রচনা না করি তাঁহার শব্দ রচনা বিফল হইত।

* M. de St. Vierre.
† Garcliosso de la Vege.

রমেশ্বর আমাদিগের এই এক শ্রবণ শক্তি
ান করিয়া যে কি পর্য্যন্ত মঙ্গল বিধান করিয়া-
তাহা কত কীর্ত্তন করিব। শ্রবণ শক্তি আমা-
র অনন্ত সুখের হেতু এবং অশেষ প্রকার
নিবারণের উপায়। বিশেষতঃ শ্রবণেন্দ্রি-
দ্বারা মনুষ্য জাতির যাদৃশ প্রকার দর্শে
ার মধ্যে আর কোন জীব জন্তুরই তাদৃশ
ণ সমুৎপন্ন হয় না। মনুষ্য জাতি শ্রবণ
প্রভাবে নানা প্রকার সদুপদেশ শ্রবণ করিয়া
গুণের হৃদয়স্থিত দুর্লভ জ্ঞান রত্ন সকল
সে লাভ করে, নয়ন পথাতীত দূরবর্ত্তী
বার্ত্তা অবগত হইয়া কত সময় সাবধান ও
হইতে পারে এবং অন্ধ হইলেও কেবল
ান দ্বারা আপন আত্মীয় গণের পরিচয়
করিতে পারে। কত সময় ত ভ্রমণ-
কত বিদ্যাব্যবসায়ী মনুষ্যগণ আলোক
অন্ধীভূত গিরিকন্দর বা বনবিবর মধ্যে
হইয়া কেবল এক শব্দ জ্ঞানের আশ্রয়ে
বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছেন।
জাতি শ্রবণেন্দ্রিয় বিবর্জিত হইলে অনেক
সুখ ভোগ ও জ্ঞান লাভে বঞ্চিত হই
নাই। মনুষ্য শ্রবণেন্দ্রিয় বিহীন হইলে
বাগিন্দ্রিয় বিফল হইত। যে বাগিন্দ্রিয়

আমাদিগের বিশেষ ভূষণ স্বরূপ এবং আমাদি
সমস্ত গৌরবের নিদানভূত — তাহা শ্রবণেন্দ্রি
সাহচর্য্য ব্যতিরেকে কদাপি কার্য্যকারী হয় না, ব
বধির ব্যক্তির কদাপি বাক্য স্ফূর্ত্তি হয় না।
ব্যক্তি জন্ম বধির হয় সে অবশ্যই মূক হ
থাকে। জন্মবধিরতাই যে মূক হইবার প্রতি
কারণ তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া
য়াছে। এক জন জন্মবধির তাহার চতুর্বিংশ
বয়ঃক্রমের সময় পুনর্ব্বার শ্রবণ শক্তি লাভ ক
ছিল, আর এক জন মূক ঐ রূপে কিয়ৎবর্ষ
ক্রমের সময় শ্রবণ শক্তি প্রাপ্ত হওয়াতে বাক্
সম্পন্ন হইয়াছিল। সে ব্যক্তি এক দিন অ
কথা কহিতে আরম্ভ করাতে সমস্ত লোক বিস্ম
হইয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, সে ব
আমি ইহার তিন চারি মাস পূর্ব্বে শ্রবণ
প্রাপ্ত হইয়া গোপনে সকল শব্দ অভ্যাস করি
লাম এক্ষণে বিলক্ষণ সুসম্পন্ন হওয়াতে কথা ক
আরম্ভ করিলাম। অতএব মানব জাতি শ্রবণ
বিবর্জ্জিত হইলে যে অনেক সুখে ও অনেক
বঞ্চিত হইত এবং সুতরাং তাহার মানব
বিকল হইত, তাহার আর সন্দেহ নাই। জ
সকল ইন্দ্রিয়কেই পরস্পর সকলের সহায়
এই অপূর্ব্ব দেহ যন্ত্রের রচনা করিয়াছেন।

কোন রূপে আহত ও বিকৃত হইতে না
এই জন্য করুণাময় পরমেশ্বর উহাদি
এমনি এক প্রকার চমৎকার সূক্ষ্ম ত্বক
আবরণ করিয়াছেন, যে তাহাতে রসবোধেরও
ব্যাঘাত জন্মে না, অথচ রসনেন্দ্রিয়েরও
হানি জন্মিতে পারে না। রসনা আমা-
মুখ মধ্যে রসপরীক্ষক হইয়া কার্য্য
করিতেছে, আমরা কোন বস্তু উদরস্থ
পূর্ব্বে রসনাদ্বারা অগ্রে তাহার গুণের
পাই এবং পরিচয় পাইয়া অনায়াসে
র হইতে পারি। যে কোন রস উদরস্থ
আমাদিগের শরীরের প্রতি সমূহ হানি
ত হইতে পারে, তাহা আমাদিগের
গ্রে সংলগ্ন হইবামাত্রই জানিতে পারি
জানিতে পারিয়া আমরা উপকারী
সকল গ্রহণ ও অনুপকারী বস্তু সকলকে
ত্যাগ করি। জগদীশ্বর যদি আমাদিগকে এই-
আশ্চর্য্য রস পরীক্ষার উপায় প্রদান না করি-
তাহা হইলে যে আমাদিগের কত প্রকার
ট ঘটিত, তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না;
হইলে আমরা অনায়াসে প্রাণনাশক বিষ
গলাধঃকরণ করিয়া মৃত্যু গ্রাসে পতিত হই-
এবং এমন সুখকর ও হিতকর ভোজনক্রিয়া

কেবল আমাদিগের অনিষ্টকর হইত। আমাদি
মুখেতে জগদীশ্বর যদি রসন যোজন না করি
তাহা হইলে নানা প্রকার উপাদেয় রস মাধু
সুখানুভব কোথায় থাকিত? কোন প্রকার
সামগ্রী আমাদিগকে সুখী করিতে পা
না, সুতরাং এমন অনুপম ভোজন সুখ আ
দিগের পক্ষে বিফল হইত। অতএব যখন
প্রকার উপাদেয় দ্রব্যের আস্বাদ গ্রহণ ক
আনন্দ জন্মে, তখন তজ্জন্য সেই সুখ
জগদীশ্বরকে সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করিয়া শ্র
পূর্ব্বক নমস্কার করা নিতান্ত উচিত। র
ন্দ্রিয় জিহ্বাকে যে স্থানে যোজনা করিলে আ
দিগের কল্যাণ হইতে পারে, জগদীশ্বর তাহ
সেই স্থানেই যোজনা করিয়াছেন এবং তা
যে প্রকার গঠন করিলে মানবের মঙ্গল
সেই প্রকার করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন;
রসেন্দ্রিয় জিহ্বা কেবল আমাদিগের রসানুভ
দ্বার নহে, উহা আমাদিগের বাগিন্দ্রিয়ে
একটি প্রধান অঙ্গ। জিহ্বা ভিন্ন কখনই আ
দিগের বাক্য স্ফূর্ত্তি হয় না, এজন্য জগদী
উহাকে অস্থিশূন্য সুকোমল করিয়া নির্মা
করিয়াছেন, আমরা ইচ্ছা করিলে জিহ্ব
আবশ্যকমত সকল দিকে সঞ্চালন করিয়া

রসনেন্দ্রিয় ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়।

ঈশ্বর সুখ বর্দ্ধনের নিমিত্তে রসনেন্দ্রিয় আর ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সৃষ্টি করিয়াছেন। কোন রস গ্রহণ করা ও ঘ্রাণ গ্রহণ করা এ ইন্দ্রিয়ের কার্য্য। ঐ ইন্দ্রিয়দ্বয় দ্বারা পশু, কীট, পতঙ্গ সমস্ত জীবই সুখ ভোগ ও রক্ষা করিয়া থাকে। প্রাণিবিদ্যাপরা-পণ্ডিতেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, যে, সমস্ত জীব নির্দ্দিষ্ট নিয়মে ভোজন পান ও শরীর ধারণ করে, তাহাদিগের সকলেরই রসনেন্দ্রিয় ও ঘ্রাণেন্দ্রিয় সম্পন্ন হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। কোন্ জীব যে কি প্রকারে সুস্বাদু খাদ্য দ্রব্যের রসাস্বদ করে এবং আঘ্রেয় পদার্থের ঘ্রাণ লয়, যদিও তাহা অদ্যাপি সম্যক্ রূপে নির্দ্ধারিত হয় নাই, কিন্তু যে সমস্ত জন্তুর ঘ্রাণেন্দ্রিয় ও রসনেন্দ্রিয় প্রকাশ পাইয়াছে, তৎ সমুদায়ের মধ্যেই জগদীশ্বরের অপার করুণার নিদর্শন দৃষ্ট হইয়াছে। ভোজ্য সামগ্রীর রস গ্রহণের জন্য আমরা জিহ্বা প্রাপ্ত হইয়াছি, কিন্তু ঐ এক জিহ্বাতেই জগদীশ্বরের কত কৌশল প্রকাশ রহিয়াছে। করুণাকর পরমেশ্বর এই

সমস্ত রক্ত মাংস ও শিরাদি দ্বারাই রস
রচনা করিয়াছেন, কিন্তু তাহাকে যে কি এ
চমৎকারিণী শক্তি প্রদান করিয়াছেন তাহা কি
বলা যায় না! কটু তিক্ত কষায় প্রভৃতি (
প্রকার রসকে আমরা যদি শত বার স্পর্শ
দর্শন করি, তাহা হইলে কোন মতেই তা
জ্ঞান পাইতে পারি না, কিন্তু উক্ত রস স
দিগের রসনাগ্রে স্পর্শ হইবামাত্রেই আমরা
ক্ষণাৎ তাহা জ্ঞাত হইতে সমর্থ হই। রস
উপরি ভাগে ধমনিময় কতকগুলি বিন্দু
চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়, অঙ্গুলি দ্বারা
করিলেও ঐ বিন্দু সকল বিলক্ষণ অনুভূত
বিশেষতঃ শরীরেতে জ্বরাদি কোন রোগ
স্থিত হইলে ঐ বিন্দু সমস্ত সমধিক প্র
পাইয়া উঠে, তৎকালে জিহ্বা খরস্পর্শ
ঐ ধমনিময় বিন্দু গুলিনই রস জ্ঞানের এ
কারণ, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে আ
দিগের ভোজ্য দ্রব্য সকল মুখ মধ্যে প্র
হইয়া জিহ্বার উপরিভাগে সংলগ্ন হয় ব
জগদীশ্বর ঐ দিকেই উল্লিখিত রস গ্রাহক বি
ভাগ অধিক প্রদান করিয়াছেন, সুতরাং জি
নিম্ন দেশ অপেক্ষা উপরিভাগই রস গ্র
অধিক উপযুক্ত হইয়াছে। ঐ রসবোধক

চ্চার শব্দ উচ্চারণ করিতে পারি। জিহ্বা স্থশূন্য ও এপ্রকার কোমল না হইলে কোন ই তদ্দ্বারা আমাদিগের বাক্য স্ফূর্ত্তি হইত এবং আমরা কোন মতেই তাহাকে সকল কে সঞ্চালন করিতে পারিতাম না।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে, যে পশু, পক্ষী, , পতঙ্গ প্রভৃতি কোন জীবই রসনেন্দ্রিয়-র্জ্জিত নহে। যে সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীটশরীরে হ্বার ন্যায় রস গ্রহণের অঙ্গ নাই, তাহারা ান্তর দ্বারা ভোজ্য দ্রব্যের আস্বাদ গ্রহণ র। অনেক প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীটের পুচ্ছদেশে া সদৃশ এক প্রকার সূক্ষ্ম অবয়ব দেখিতে ওয়া যায়, তাহারা যে দ্রব্য ভক্ষণ করে, অগ্রে াতে ঐ অবয়ব সন্নিবিষ্ট করিয়া তাহার স্বাদ জানিয়া লয়, পশ্চাৎ তাহা ভোজন যোগ্য হইলে গ্রহণ করে, নতুবা তাহা তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করে *।

আমাদিগের ঘ্রাণক্রিয়া সম্পন্ন হইবার জন্য ঈশ্বর আমাদিগকে ঘ্রাণেন্দ্রিয় নাসিকা প্রদান াছেন, ঐ নাসিকার অন্তর্বাহ্য সকল অব-পরীক্ষা করিয়া দেখিলে বিলক্ষণ প্রতীতি

হুক, যে এক জন অনন্তজ্ঞানবান পুরুষ বিশে
নৈপুণ্য সহকারে নাসিকার রচনা করিয়াছেন
পদার্থবিদ্যার অনুশীলন দ্বারা নিশ্চয় হইয়াছে
যে আঘ্রেয় বস্তুর যে সমস্ত অতি সূক্ষ্ম ও অলং
পরমাণু বায়ু সহকারে অনবরত উড্ডীয়মান হ
সেই সমস্ত সূক্ষ্ম পরমাণু আমাদিগের ব্রহ্মরা
প্রবিষ্ট হইলে আঘ্রাণ বোধের উৎপত্তি হই
থাকে, কিন্তু এতাদৃশ সূক্ষ্ম পদার্থ সকল অ
ভূত হইবার জন্য পরমেশ্বর নাসিকাকে যে প্রক
কৌশল সম্পন্ন করিয়াছেন, তাহা ভাবিলে অ
হইতে হয়। নাসিকাতে অতি আশ্চর্য্য প্রকার অ
শিরা, ধমনি ও মাংসপেশী সকল দেখিতে পাও
যায়। ঘ্রাণেন্দ্রিয় নাসিকা যদি মস্তকের অ
তুল্য রূপ কঠিন অস্থি দ্বারা নির্ম্মিত হইত, তা
হইলে কোন মতেই তদ্দ্বারা ঘ্রাণ ক্রিয়া সম্প
হইত না, এজন্য জগদীশ্বর নাসিকাকে স্পঞ্জসা
রন্ধ্রময় এক প্রকার অপূর্ব্ব অস্থি দ্বারা নির্ম্মাণ কা
উহাকে আশ্চর্য্য নির্গলন যন্ত্রের ন্যায় রচনা ক
য়াছেন। বায়ু সহকারে যখন ঐ যন্ত্রে কোন প্র
পদার্থের অণু সকল উপনীত হয়, তখন ত
অনায়াসে উহার মধ্য দিয়া গলিত হইয়া আ
মাদিগের জ্ঞান ভূমিতে উপস্থিত হইতে পারে। ঘ্র
গ্রহণের জন্য নাসারন্ধ্র সর্ব্বদা মুক্ত থাকা আবশ্যক

রাং নাসিকা কেবল কোমল মাংসসহকারে নি-
ত হইলেও আমাদিগের কার্য্য নির্ব্বাহিত হইত
এই জন্য নাসাগ্রে এক প্রকার অপূর্ব্ব ধাতু দে-
তে পাওয়া যায়। উহা না মাংসের ন্যায় কোমল
অস্থির ন্যায় কঠিন, উহার প্রকৃতি অতি চমৎ-
র। ফলতঃ আমাদিগের শরীর মধ্যে যে অঙ্গকে
প্রকার করিয়া রচনা করিলে কোন অনিষ্ট ঘটি-
ত না পারে, পরমেশ্বর সে অঙ্গকে সেই প্রকার করি-
ই রচনা করিয়াছেন। যেখানে মাংসের প্রয়োজন
ইয়াছে, সে স্থলে মাংস দিয়াছেন, যে স্থলে অ-
স্থির আবশ্যক হইয়াছে, সেখানে অস্থিই যোজনা
করিয়াছেন, এবং যে স্থলে এতদুভয় ধাতু দ্বারা কার্য্য
সিদ্ধ হওয়া কঠিন হইয়াছে, সে স্থলে নূতন ধাতুর
সৃষ্টি করিয়াছেন। নাসিকাতে কতিপয় আশ্চর্য্য
মাংসপেশী আছে, আমরা তদ্দ্বারা নাসারন্ধ্রকে
আবশ্যকমত সংকুচিত ও বিস্তৃত করিতে পারি
আমরা এককালে আঘ্রেয় বস্তুর সমধিক অণু গ্রহণ
করিতে পারিব বলিয়া জগদীশ্বর নাসারন্ধ্রের অগ্র
ভাগকে প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন এবং পরমাণু সকল
সংযত হইয়া সতেজে ব্রহ্মরন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইবার জন্য
উল্লিখিত রন্ধ্রের মূল-স্থানকে সঙ্কীর্ণ করিয়াছেন
এই প্রকার সহস্র সহস্র অনির্ব্বচনীয় কৌশল
প্রভাবে আমরা নানাবিধ ঘ্রাণ সুখ সম্ভোগ ক

এবং অপরাপর অসংখ্য প্রকার উপকার প্রাপ্ত হই ঘ্রাণেন্দ্রিয় যে আমাদিগকে কত প্রকার সুখ প্রদান করে এবং আমাদিগের কত উপকার সাধন করে তাহা কি কহিব! আমরা বসন্ত কালে যখন কোন সুরম্য উপবন মধ্যে প্রবেশ করিয়া মল্লিকা মাধবিকা যূথিকা প্রভৃতি সুগন্ধ কুসুমের আঘ্রাণ প্রাপ্ত হই, অথবা ঋতু বিশেষে যখন কোন মনোহর সরোবর তীরে উপনীত হইয়া প্রফুল্ল শতদলের আনন্দকর সৌরভ অনুভব করি, তখন কি আর আমাদের সুখের সীমা থাকে? প্রবাহিত পবন হিল্লোলে অকস্মাৎ কোন দূরবর্ত্তী কুসুম লতিকার সৌরভ ভার প্রাপ্ত হইয়া কোন্ ব্যক্তি না আনন্দ সাগরে মগ্ন হয়? আমাদিগের ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধন জন্য ব্রহ্মাণ্ডের কত পদার্থই যে কত প্রকার কার্য্য অনুষ্ঠান করে, তাহার নির্ণয় করাই কঠিন। মেঘ, বায়ু, ক্ষিতি, সূর্য্য, মাস, পক্ষ, ঋতু ও বৎসর প্রভৃতি সকলে ঐক্য হইয়া সমবেত ক্রিয়া দ্বারা গন্ধ দ্রব্যের উৎপত্তি করে এবং বায়ু তাহা যত্ন পূর্ব্বক বহন করিয়া আমাদিগের ঘ্রাণ পথে আনিয়া দেয়। জগদীশ্বর যেমন আমাদিগকে সুকৌশলময় ঘ্রাণেন্দ্রিয় প্রদান করিয়াছেন, সেইরূপ তাহার সুখ সাধনের জন্য, তিনি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বাহ্য পদার্থকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

সকল যেমন নানা সময় নানা প্রকার সুগন্ধ করিয়া আমাদিগকে সুখী করে, সেই অনেক সময় অনেক প্রকার দুর্গন্ধময় দূষিত রি দোষাবগত করিয়া আমাদিগের প্রাণ রক্ষা থাকে। অনেক স্থানে অনেক প্রকার বিকৃত বিস্তৃত হইয়া অতি সূক্ষ্ম রূপে উড়িতে থাকে তাহা মনুষ্য শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া বিস্তর ষ্ট সাধন করে, কিন্তু জগদীশ্বর আমাদিগকে প্রকার বিপদ হইতে নিস্তার করিবার জন্য র্য্য ঘ্রাণ শক্তি প্রদান করিয়াছেন; কোন র বিষ তুল্য বিকৃত বস্তু বায়ু সহকারে আমা- র দেহে প্রবিষ্ট হইবার পূর্ব্বেই আমরা ার গন্ধ দ্বারা সতর্ক হই, এবং যাহাতে ঐ কারী বস্তু আমাদিগের কোন অনিষ্ট সাধন না তে পারে, এমন উপায় অবলম্বন করি। ক জন গ্রন্থকার উল্লেখ করিয়াছেন, যে নিগ্রো তিরা গন্ধ দ্বারা স্বজাতীয় ও বিজাতীয় লোককে লিতে পারে *। অনেক অন্ধ ব্যক্তি চক্ষুরিন্দ্রিয়হীন ইয়াও ঘ্রাণ শক্তির প্রভাবে দুষ্কর কার্য্য নির্ব্বাহ রে। এক জন অন্ধ কেবল গন্ধ দ্বারা বিচিত্র কার বস্ত্রের বর্ণ বলিতে পারিত † ঘ্রাণেন্দ্রিয়

---

* Gold Smith's natural history Vol. 1st.

† Abercrombie's mental philosophy.

কোন কোন স্থলে রসনেন্দ্রিয়েরও সাহায্য
যে সমস্ত অপকারী দ্রব্য আমাদিগের
হইলে শরীরের পক্ষে হানি হইতে
তাহা মুখমধ্যে প্রবিষ্ট হইবার পূর্ব্বেই ঘ্রাণে
দ্বারা পরিত্যক্ত হয়। প্রায় অপকারী দ্রব্য
ঘ্রাণেতেই তাঁহা আহার করিতে অরুচি
এবং যে সকল সামগ্রী ভোজন করিলে
সুস্থ থাকিতে পারে, প্রায় তাহার ঘ্রাণ
করিলেই খাইতে ইচ্ছা হয়। যদিও ম
জাতি অনেক অত্যাচার করিয়া ঘ্রাণেন্দ্রি
বিষয়ক উক্ত উপকার লাভে বঞ্চিত হইয়া
কিন্তু অনেক পশু আপনাদিগের অবিকৃত
শক্তির আশ্রয়ে স্বীয় স্বীয় খাদ্যাখাদ্য বা
লয়। যে জন্তুর যে দ্রব্য অখাদ্য, সে জন্তু
তাহার গন্ধ পাইলেই জানিতে পারে। প্র
প্রান্তর মধ্যে গো মহিষাদিকে কেবল ঘ্রাণ দ্ব
সহস্র প্রকার উদ্ভিদের মধ্য হইতে আপন আ
খাদ্য তৃণাদি বাছিয়া খাইতে দেখা যায়। সি
ব্যাঘ্রাদি মাংসাশী পশুরা বহু দূর হইতে আ
খাদ্য প্রাণীর গন্ধ পায় এবং সেই গন্ধ অনু
করিয়া সর্ব্বদা শিকার করে। কোন কোন জ
ঘ্রাণ শক্তি এত তীব্র, যে তাহারা উহা দ্বারা অ
জনীয় কার্য্য সকল সমাধা করে। কুকুর জ

ন এক গন্ধ মাত্র অনুভব করিয়া লোকারণ্য মধ্যেও স্বীয় প্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করে কোন কারণে পথ বিস্মৃত হইলে কেবল গন্ধ ভব দ্বারা স্বীয় বাসস্থানে উপস্থিত হইতে র *। উষ্ট্র জাতি প্রায় এক যোজন দূর হইতে র গন্ধ প্রাপ্ত হইয়া তদভিমুখে দ্রুত বেগে তে থাকে। ঘ্রাণেন্দ্রিয় অনেকানেক জীব জন্তুর ধারণের প্রধান অবলম্বন। তাহারা ঘ্রাণেন্দ্রিয় া অনেক কার্য্য সম্পন্ন করে।

প্রাণীবিদ্যাপরায়ণ পণ্ডিতেরা পরীক্ষা করিয়া করিয়াছেন, যে পরমেশ্বর ভূচর জলচর ও র প্রভৃতি সকল প্রকার জীব জন্তুকেই ঘ্রাণে- প্রদান করিয়াছেন। মৎস্যাদি জল জন্তুরও ক্ষণ ঘ্রাণ শক্তি আছে, মৎস্যসংকুল জলাশয়ে র গন্ধ দ্রব্য নিঃক্ষেপ করিলে সেই স্থানে অনেক র মৎস্য আগমন করে। মৎস্য জাতিকে ন কোন গন্ধ প্রিয় ও কোন কোন গন্ধ অপ্রিয় র করিতে দেখা যায়। যাহারা বড়িশ দ্বারা স্য ধারণ করে, তাহারা জলেতে মৎস্য প্রিয় ন প্রকার গন্ধ নিক্ষেপ করিয়া মৎস্য আকর্ষণ র। হিঙ্গু এবং মৃগনাভির গন্ধে মৎস্য জাতি ধিক আকৃষ্ট হয় *। ভেক এবং জলগোধিকার

* Roget's animal and vegetable physiology Vol. II.

ঘ্রাণেন্দ্রিয় অতি আশ্চর্য্যরূপে উৎপন্ন হয়। যত দিন জলে বাস করে, তত দিন ঘ্র বর্জ্জিত থাকে। অনন্তর স্থলেতে বাস আরম্ভ করিলেই তাহারা অনেক বস্তু পাইতে আরম্ভ করে। অনেক কীটের প্রখর ঘ্রাণ শক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। সাহেব ব্যক্ত করিয়াছেন, যে মধুমক্ষিকা অনেক কীট তাহাদিগের ক্ষুদ্র শুণ্ড দ্বারা ণের অনুভব করে; ঐ শুণ্ডের নিকট যে গন্ধ উপস্থিত করিলে ঐ সকল কীট অস্থি রতার চিহ্ন প্রকাশ করে।

স্পর্শেন্দ্রিয়।

র্শেন্দ্রিয়ের অতি চমৎকার কৌশল। শরীর
দর্শন শ্রবণাদি অপরাপর ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান
যেমন চক্ষু, কর্ণ, প্রভৃতি এক একটি নির্দিষ্ট
দেখিতে পাওয়া যায়, স্পর্শেন্দ্রিয়ের সেরূপ
বিশেষ একটি স্থান নাই, উহা শরীরের
ই ব্যাপিয়া আছে। আপাদ মস্তক কোন
স্পর্শেন্দ্রিয়বর্জিত নহে। শারীরস্থান ও
রবিধান বিদ্যা ব্যবসায়ী পণ্ডিত গণ নিরূপণ
াছেন, যে মস্তিষ্ক নিঃসৃত ধমনি সকলই স্পর্শ
র কারণ। ধমনি ব্যতিরেকে স্পর্শ জ্ঞানের
ত্তি হয় না, শরীরের মধ্যে যে স্থানে ধমনি
াকে, সে স্থানে স্পর্শ জ্ঞান জন্মে না। যে
অধিক ধমনি আছে, সে স্থানে স্পর্শ
আধিক্য হইয়া থাকে ও যেখানে ধমনির
অল্পই থাকে, তথায় স্পর্শ জ্ঞানও অল্প।
কিন্তু অদ্ভুত কৌশলকর্ত্তা জগদীশ্বর যে
াকার আশ্চর্য্য কৌশলে আমাদিগের শরীরময়
র্শেন্দ্রিয় ব্যাপ্ত করিয়াছেন, তাহা চিন্তা করিয়া
করা যায় না, আমাদিগের পদাঙ্গুষ্ঠের নখাগ্র
া এক গাছি কেশ স্পর্শ হইলেও আমরা

জানিতে পারি এবং মস্তকস্থিত কেশাগ্রেতে এ
মক্ষিকা উপবেশন করিলেও তাহা তৎক্ষণাৎ আ
দিগের জ্ঞান গোচর হয়। স্পর্শেন্দ্রিয় আমাদি
শরীরের সর্ব্বত্র সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকিয়া অতি স
ন্যায় প্রহরীর কার্য্য সাধন করিতেছে এবং আম
গকে নানা অবস্থায় নানা প্রকারে সাবধান করি
রক্ষা করিতেছে। যে সময় আমাদিগের দর্শনেন্দ্রি
ও শ্রবণেন্দ্রিয় স্তব্ধ এবং অসাবধান থাকে, ত
কালেও স্পর্শেন্দ্রিয় আমাদিগের কার্য্য সা
করিতে ত্রুটি করে না। সুষুপ্তিকালে যখন মনু
ষ্যকে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিলেও জাগ্রত করি
পারা যায় না, তৎকালেও তাহার গাত্র স্প
করিয়া অনায়াসে নিদ্রা ভঙ্গ করা যায়। বিশেষত
আমরা শ্রবণ দর্শনাদি ইন্দ্রিয় হইতে যে বিষয়ে
সম্বাদ প্রাপ্ত না হই, স্পর্শেন্দ্রিয় আমাদিগকে সে
সমস্ত বিষয় অবগত করে। শীত বাত আতপা
যে সকল সূক্ষ্ম পদার্থ আমাদিগের চক্ষু কর্ণাদি দ্বার
অনুভূত না হয়, আমরা তাহা স্পর্শেন্দ্রিয় দ্বার
অনায়াসে জ্ঞাত হইতে পারি। আমাদিগের
শরীরের সর্ব্বত্রই স্পর্শেন্দ্রিয়ের দ্বার মুক্ত রহিয়াছে;
স্পৃশ্য বিষয় যে দিকে যে কোন পথে আগমন
করুক, তাহা অবশ্যই আমাদিগের জ্ঞান ভূমিতে
উপনীত হইবেক।

নিধান জগদীশ্বর আমাদিগের স্পর্শে
যেমন নানা বিষয়ক জ্ঞান লাভের পথ
সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই রূপ উহাকে আমা
অশেষ প্রকার সুখ ভোগেরও কারণ
ন। যে ব্যক্তি কখন নিশাবসানে গাত্রো-
র্ব্বক প্রসারিত প্রান্তর বা প্রবিস্তীর্ণ
পরিভ্রমণ করিয়া সুস্নিগ্ধ ও সুনির্ম্মল
সমীরণ সেবন করতঃ দেহ গ্লানি দূর
ছ, কি নিদাঘ কালের দিন পরিণামে
মলয় মারুত উপভোগ করিয়া অঙ্গ
দূর করিয়াছে, অথবা প্রচণ্ড গ্রীষ্ম কালের
বস্থায় কখন শীতল চন্দনাদি উপলেপন
করিয়া সুখী হইয়াছে, কি শীত সময়ে
র মন্দ মন্দ রশ্মি সম্ভোগ করিয়া তৃপ্ত
হ, সেই জানিয়াছে যে করুণানিধান
আমাদিগের কত সুখের জন্য স্পর্শে-
সৃষ্টি করিয়াছেন। স্পর্শেন্দ্রিয় দ্বারা
মরা কত সময় কত প্রকার সুখ ভোগ করিয়া
তাহা বর্ণন করিয়া শেষ করা অসাধ্য
সর্ব্বহিতকর্ত্তা সনাতন পুরুষ
স্পর্শেন্দ্রিয়েতে আর একটি
প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদিগের
ন স্পর্শেন্দ্রিয় যে পরিমাণে

আমাদিগের কার্য্য সাধন ও দুঃখ [illegible] পারে, তিনি সেই স্থলে সেই রূপ করি শক্তি প্রদান করিয়াছেন। অনেক স মনুষ্যকে পদ-ব্রজে কণ্টকাবৃত অরণ্য কঙ্কর ময় পর্ব্বতাদি অতিক্রম করিয়া করিতে [illegible] সুতরাং পদতলে অধিক স থাকিলে অনেক প্রকার ক্লেশ ভোগ হইব [illegible], এজন্য জগদীশ্বর, শরীরের সর্ব্বস্থান পাদমূলে ধমনির ভাগ অল্প প্রদান ক এবং হস্ত দ্বারা সর্ব্বদা সকল প্রকার প পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হয়, সুতরাং হস্তে শক্তি অধিক থাকা আবশ্যক বলিয়া কর [illegible] সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম আশ্চর্য্য ধমনি বিদ্যমান আমাদিগের স্পর্শেন্দ্রিয় যদি এক্ষণকার [illegible]র কিঞ্চিৎ তেজস্বী হইত, তাহা হইলে [illegible]ন্দ্রিয় দ্বারা কোন প্রকার সুখ অনুভূত হও [illegible] সুকোমল কুসুম শয্যাও আমাদি শয্যা বোধ হইত, সুচিক্কন মসৃণ বস্ত্রকে ধারণ করা কঠিন হইত এবং উৎকৃষ্ট মন্দ অসহ্য অতিবাতবৎ অনুভূত হইত। [illegible] ত্বক্ এরূপ কোমল হইলে মনুষ্য কি বস্ত্রাদি ধারণ করিতে সক্ষম হইত।

আমাদিগের [illegible] পুলক হইবার পূ

চলিতে চলিতে কোন কার্য্যালয় বা লোকালয়ের নিকট উপস্থিত হইলেই তৎক্ষণাৎ জানিতে পারিত। ঐ প্রকার স্থানে উপস্থিত হইবামাত্র তাহাদিগের পদতলে এক প্রকার আশ্চর্য্য স্পর্শ জ্ঞান অনুভূত হইত। ডাক্তর রস নামক সাহেব কহিয়াছেন, যে কোন কোন বধির পথে চলিবার সময় কেবল স্পর্শেন্দ্রিয় দ্বারা এত পূর্ব্বে তৎপথে প্রচলিত শকটাদির আগমন বার্ত্তা অবগত হয় যে তখন সর্ব্বেন্দ্রিয় সম্পন্ন কোন ব্যক্তি তাহা জানিতে পারে না। বধিরেরা অনেক সময় স্পর্শেন্দ্রিয় দ্বারা শ্রবণ কার্য্য সম্পাধা করে। এই রূপ প্রবাদ আছে যে কোন কারণ বশতঃ ফরাস দেশীয় এক জন ভদ্র লোকের অকস্মাৎ চক্ষু প্রভৃতি সকল ইন্দ্রিয়ই নষ্ট হইয়াছিল, কেবল তাহার মুখ মণ্ডলের এক দিকে কিঞ্চিৎ স্পর্শ শক্তি বিদ্যমান ছিল, কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে তাহাকে কোন বিষয় অবগত করিতে হইলে তাহার মুখের সেই দিকে ঐ বিষয় বর্ণাঙ্কিত করিলেই সে তৎক্ষণাৎ তাহা বুঝিতে পারিত। তাহার পরিবারেরা ঐ প্রকার করিয়া তাহাকে সকল বিষয় জ্ঞাত করিত। অতএব জগদীশ্বর যে আমাদিগের বিশেষ উপকারের জন্য স্পর্শ

* Abercrombie's Mental Philosophy p, 31-32.

ন্দ্রিয়ের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার আর সন্দেহ নাই। স্পর্শেন্দ্রিয় দ্বারা অন্যান্য অনেক জীব জন্তুরও অশেষ উপকার সিদ্ধ হয়, হংস প্রভৃতি যে সকল পক্ষী জল মধ্য হইতে ও অপর [illegible] পর অদৃষ্ট স্থল হইতে জীবিকা সংগ্রহ করে, তাহাদিগের চঞ্চু অগ্রে এপ্রকার আশ্চর্য্য স্পর্শ শক্তি আছে, যে তাহারা ঐ স্পর্শ শক্তির গুণে অলক্ষিত ও অন্ধকারময় স্থানে অনায়াসে আপনাদিগের ভোজ্য বস্তু জানিতে পারে। টৌকান নামক এক প্রকার পক্ষী নিবিড় অন্ধকারময় স্থানে বিহঙ্গ জাতির গভীর কুলায় মধ্যে চঞ্চু নিবিষ্ট করিয়া কেবল ডিম্ব আহার করিয়াই জীবন ধারণ করে, এজন্য জগদীশ্বর তাহার চঞ্চুতে এ প্রকার অদ্ভুত স্পর্শ শক্তি প্রদান করিয়াছে। উক্ত পক্ষীর চঞ্চু অগ্রে কতক গুলি সূক্ষ্ম স্নায়ু আশ্চর্য্য ধমনি দেখিতে পাওয়া যায়।*

তিনি যদি আমাদিগকে স্পর্শেন্দ্রিয় প্রদান না করিতেন, তাহা হইলে আমাদিগের [illegible] আর অনেক ইন্দ্রিয়ও বিফল হইত। আমরা চক্ষুঃ শ্রোত্র বিশিষ্ট হইয়াও যাবজ্জীবন দর্শনাদি বিষয়ে ভ্রান্ত থাকিতাম, আমরা কোন দৃশ্য বস্তুরই প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিতে পারিতাম না। পূর্ব্ব পূর্ব্ব [illegible]

* English Reader, No. VI., p. 71.

াত্রাদি অপরাপর ইন্দ্রিয় সকল একে একে হিত হইতে থাকে, কিন্তু আশ্চর্য্য স্পর্শ ন্দ্রিয় মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত আমাদিগের সঙ্গে থাকে, া কদাপি আমাদিগের ত্যাগ করে না। বৃদ্ধা- য় যখন মনুষ্য কর্ণেতে শ্রবণ করিতে বা ক্ষুতে দর্শন করিতে পায় না, তখন তাহার পর্শেন্দ্রিয় শিথিল হয়, বাক্‌যন্ত্র রুদ্ধ হইতে থাকে, ...ালেও তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিলে সে ...ত পারে।

স্পর্শ ইন্দ্রিয় অন্ধ ব্যক্তির চক্ষুর কার্য্য সাধা ...র এবং বধিরের শ্রবণ-শক্তির প্রতিনিধি হয়। ... কোন অন্ধ ব্যক্তির স্পর্শ-ইন্দ্রিয় এত সতেজ ..., যে সে কোন বস্তু স্পর্শ করিয়া তাহার বর্ণ ... জ্ঞাত হইতে পারে। বইল নামক এক জন ...িত ব্যক্ত করিয়াছেন, যে এক ব্যক্তি কেবল ...র্শ দ্বারা বস্ত্রের নীল পীত প্রভৃতি বর্ণ জানিতে ...রিত। অন্যান্য সকল বর্ণ অপেক্ষা তাহাকে ...বর্ণ অধিক বন্ধুর ও নীলবর্ণ অধিক মসৃণ বোধ ...ত এবং সে ঐ রূপ স্পর্শজ্ঞানের তারতম্য ...নুসারে সকল বর্ণই অবগত হইতে পারিত। ...তবর অপুহেম সাহেব ব্যক্ত করিয়াছেন, ... কোন এক অন্ধ বালিকার এরূপ আশ্চর্য্য ...র্শ শক্তি ছিল, যে নির্দ্দিষ্ট কালে ...ালয়

হইতে বস্ত্র আসিলে, সে সমুদায় বস্ত্রের মধ্য হইতে আপনার বস্ত্রগুলি চিনিয়া লইত। ঐ বস্ত্র সকল যে রূপে ব্যবস্থিত থাকুক, উক্ত কন্যা কদাপি আপন বস্ত্র চিনিয়া লইতে ভ্রান্ত হইত না। এক ব্যক্তি অন্ধ স্বীয় অসামান্য স্পর্শেন্দ্রিয় বলে কোন অশ্বের কাণ দোষ প্রকাশ করিয়াছিল, অনেক অশ্ব পরীক্ষা ব্যবসায়ী লোকে চক্ষুর্বিশিষ্ট হইয়াও উক্ত অশ্বের ঐ দোষ জানিতে পারে নাই, অনন্তর উল্লিখিত অন্ধের নিকট হইতে উহা অবগত হইয়া বিস্ময়াপন্ন হইল এবং তাহাকে ঐ দোষ জ্ঞাত হইবার সন্ধান জিজ্ঞাসা করাতে অন্ধ কহিল, যে আমাকে ঐ অশ্বের এক চক্ষু অন্য চক্ষু অপেক্ষা বিশেষ শীতল বোধ হওয়াতেই আমি উহার কাণ দোষ জানিতে পারিয়াছি। সণ্ডর্সন নামক এক জন সুপ্রসিদ্ধ অন্ধপণ্ডিত রোম দেশীয় মুদ্রা সকল শ্রেণীবদ্ধ থাকিলেও কেবল হস্ত দ্বারা একবার স্পর্শ করিয়া এমন আশ্চর্য্য রূপে তন্মধ্য হইতে কৃত্রিম ও অকৃত্রিম মুদ্রা সকল বাছিয়া লইতেন, যে কোন ব্যক্তি চক্ষুষ্মান্ সুনিপুণ মুদ্রা পরীক্ষকেও সে প্রকার পারিত না। উক্ত পণ্ডিতের মস্তকের উপর দিয়া মেঘ গমন করিলেও তিনি জানিতে পারিতেন। [illegible]কিয়া নগর নিবাসী দুই ব্যক্তি অন্ধ

উল্লেখ করা গিয়াছে, যে আমরা দুই চক্ষু দ্বারা যে
কোন বস্তু নিরীক্ষণ করি, তাহা বস্তুতঃ এক হইয়াও
আমাদিগের চক্ষে দুই দেখায়, কিন্তু কেবল আশ্চর্য্য
স্পর্শেন্দ্রিয় আমাদিগের উক্ত ভ্রম দূর করে। বালক
যদি ং না স্পর্শেন্দ্রিয় চালনা করিতে পারে এবং
[illegible] রূপেই তাহার দৃষ্টি ভ্রম দূর হয় না। কোন
জন্মান্ধ ব্যক্তি যখন কোন রূপে দৃষ্টিশক্তি প্রাপ্ত হয়,
তখন সে সমস্ত দৃশ্য বস্তুকে অতি বিপরীত ভাবে
দর্শন করে, সে তৎকালে কোন বস্তুরই প্রকৃত
আকার ও প্রকৃত অবস্থা দেখিতে পায় না।
তাহার বোধ হয় যে সকল বস্তুই তাহার অঙ্গের
সঙ্গে লিপ্ত হইয়া রহিয়াছে এবং সকল বস্তুরই
ঊর্দ্ধ ভাগ নিম্নে ও অধোভাগ উপরে রহিয়াছে।
অনন্তর সে যখন হস্ত দ্বারা বস্তু সকল স্পর্শ করিতে
প্রবৃত্ত হয়, তখন তাহার উল্লিখিত ভ্রম রাশি
তিরোহিত হইতে থাকে, তখন সে প্রত্যেক বস্তুর
প্রকৃত আকার, প্রকৃত সংখ্যা ও প্রকৃত স্থান অব-
গত হয় এবং ক্রমে এই রূপে তাহার নিত্য অভ্যাস
দ্বারা এমনি একটি অপূর্ব্ব স্বভাব জন্মিয়া যায়, যে
সে পরিণামে কোন বস্তু নিরীক্ষণ করিলে তাহা
স্পর্শ না করিয়াও ঐ পূর্ব্ব সংস্কার হেতু তাহার
প্রকৃত জ্ঞান প্রাপ্ত হয়। চেসেল্ডন নামক এক
জন সাহেব কোন জন্মান্ধ ব্যক্তির চক্ষু রোগ

আরোগ্য করিয়া দেখিলেন, যে সে ব্যক্তি প্রথমতঃ যে কোন পদার্থ দর্শন করিল তৎসমুদায়কে সে আপন অঙ্গ স্পৃষ্ট বোধ করিল। এই জন্য অবক্ষুর সমান বস্তু মাত্রকে তাহার প্রিয় বোধ হইয়াছিল এবং অসমান পদার্থ সকল তাহাকে ক্লেশ দায়ক বোধ হইল। শিশু সন্তান যেমন দৃশ্য বস্তু সকলকে আপন শরীর সন্নিকৃষ্ট বলিয়া জ্ঞান করে সেই রূপ শব্দ সকলকেও বাহ্য পদার্থ না জানিয়া আপন কর্ণ কুহর স্থিত অভ্যন্তর বিষয় বলিয়াই প্রত্যয় যায়। স্পর্শেন্দ্রিয় দ্বারা যত দিন পর্য্যন্ত বাহ্য বিষয়ের প্রকৃত দূরত্বানুভূত না হয়, তত দিন পর্য্যন্ত মানবের শ্রুতি ভ্রমও দূর হয় না।

স্পর্শেন্দ্রিয় বিষয়ে আর একটি অদ্ভুত ব্যাপা দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা বস্তু মাত্রকে স্পর্শ করিয়া এক মনে করি, কিন্তু কি কৌশলে যে স্পর্শন দ্বারা বস্তুর একত্ব অনুভূত হয় তাহা নির্দেশ করা কঠিন। জগদীশ্বর যে প্রকার নিয়মে আমাদিগের শরীরে স্পর্শেন্দ্রিয় প্রদান করিয়াছেন, তাহার বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম হইলেই আমাদিগকে বিষম ভ্রমে ভ্রান্ত হইতে হয়। করতলে ক্ষুদ্র বর্ত্তুলাকার কোন পদার্থ রাখিয়া তাহাকে যদি স্বাভাবিক রূপে তর্জনী ও অনামিকা এই দুই অঙ্গুলীর দ্বারা ঘুরাণ যায়, তাহা হইলে তাহা একটি মাত্রই বোধ হয়;

কিন্তু ঐ দুই অঙ্গুলীকে যদি কিঞ্চিৎ ভাবান্তর করা যায় অর্থাৎ এক অঙ্গুলীর উপর অন্য অঙ্গুলী রাখিয়া তদ্দ্বারা অনভ্যস্ত রূপে ঐ বস্তুকে ঘুরাণ যায় তাহা হইলে এক বস্তুকে দুইটি বোধ হয়, অতএব বিলক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে যে আমাদিগের শরীররচয়িতা জগদীশ্বর যে ইন্দ্রিয়কে যে প্রকার রচনা করিয়াছেন, তাহার কিঞ্চিন্মাত্র অন্যথা হইলেই আমাদিগের সুখের হানি ও দুঃখের উৎপত্তি হইত। তাঁহার কৌশলই আমাদিগের সুখের মূল, এবং তাঁহার করুণাই আমাদিগের সকল সম্পদ।

সমাপ্ত

পশুদিগের সংস্কার।

যে শক্তি দ্বারা পক্ষী জাতি নীড় নির্ম্মাণ করিতে পারগ হয়, মধু মক্ষিকা দিগের যে শক্তি থাকাতে তাহারা আশ্চর্য্য মধু ক্রম প্রস্তুত করিতে পারে এবং উষ্ট্রের যে শক্তি থাকাতে উষ্ট্র বহু দূর হইতে নদ নদী প্রভৃতি জলাশয় জানিতে পারে, সাধারণত সেই শক্তিকেই পণ্ডিতগণ সংস্কার বলিয়া উক্ত করেন। পশুদিগের উক্ত সংস্কার অতি অদ্ভুত বৃত্তি, উহা কস্মিন্ কালেও পরিবর্ত্তিত বা উন্নত হইবার নহে, চির দিন সমভাবে থাকে। শতবর্ষ পূর্ব্বে যে জাতীয় পশুকে যে প্রকার কার্য্য করিতে দেখাগিয়াছে শতবর্ষ পরেও সে পশুকে সেই রূপ কার্য্য করিতে দেখাযায়, উক্ত সংস্কার প্রভাবে এক এক পশু এমন এক এক অদ্ভুত কার্য্য সম্পন্ন করে, যে মনুষ্য শতবর্ষ পরিশ্রম করিলেও তাহাতে বুদ্ধি প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় না। আমেরিকা দেশীয় বীবর নামক পশুর বাসস্থান নির্ম্মাণ করণের বিষয় যে ব্যক্তি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, বা গ্রন্থাদি মধ্যে পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাকেই চমৎকৃত হইতে হইয়াছে। উহারা যেরূপ অসাধারণ কৌশল পূর্ব্বক আপনাদিগের আবাস গৃহ প্রস্তুত করে তাহা নানা

পণ্ডিত কর্ত্তৃক বিশেষ রূপে লিখিত হইয়াছে। জল মার্জ্জারদিগের বাস স্থান নির্ম্মাণ করাও অল্প আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। উহারা আপনাদিগের আবাস স্থান নির্ম্মাণ করিতে যে প্রকার কৌশল প্রকাশ করে, বিশেষ বুদ্ধিমান্ লোকেও হঠাৎ সে প্রকার শিল্প নৈপুণ্য প্রকাশ করিতে সক্ষম হয় না। উহারা নদ নদী প্রভৃতি কোন জলাশয়ের তীরে মৃত্তিকার নিম্নে গহ্বর করিয়া আপনাদিগের আবাস স্থান প্রস্তুত করে এবং নদ নদী প্রভৃতির জলমগ্ন তলস্থ্ ভূমিতে ছিদ্র করিয়া ঐ বাস স্থানে গতায়াত করিবার পথ প্রস্তুত করে। উহারা আপনাদিগের বাস স্থানে প্রবেশ করণার্থ জল মধ্যে যে রন্ধ্র প্রস্তুত করে, তাহা উক্ত জলাশয়ের জল হইতে ক্রমে ঊর্দ্ধাভিমুখে চালিত হইয়া ঐ বাস স্থানের সহিত মিলিত হয়। জল মার্জ্জারদিগের বাস গহ্বরের মধ্যে তিন চারিটি পৃথক্ পৃথক্ প্রকোষ্ঠ থাকে এবং উহারা সেই সমস্ত প্রকোষ্ঠ জলাশয়ের গর্ব্ভ হইতে এত ঊর্দ্ধ দেশে নির্ম্মাণ করে, যে তন্নিকটস্থ জলাশয়ের জল অপেক্ষাকৃত সমধিক বৃদ্ধি হইলেও তাহা প্লাবিত হইতে পারেনা। মারমট নামক জন্তুদিগের আবাস নির্ম্মাণ

বিষয়েও বিশেষ নৈপুণ্য দৃষ্ট হয়। উক্ত জন্তুরা পর্ব্বত বা গিরিতলে মৃত্তিকার নিম্নে কিয়দ্দূর অন্তর করিয়া দুইটি পৃথক্ ছিদ্র নির্ম্মাণ করিয়া আইসে এবং তাহা ক্রমে ঊর্দ্ধদিকে ঈষৎ বক্রভাবে চালিত করিয়া উভয় ছিদ্রের মুখ একত্র মিলিত করে। যে স্থানে ঐ উভয় ছিদ্রের মুখ আসিয়া পরস্পর মিলিত হয়, সেই স্থানে উহারা বাসোপযোগী সম-তল বিশিষ্ট একটি মূল গহ্বর নির্ম্মাণ করে। ঐ গহ্বর তলে উহারা তৃণ ও শৈবাল দ্বারা অপূর্ব্ব কোমল শয্যা বিস্তারণ করে। উল্লিখিত ছিদ্র দ্বয়ের মধ্যে একটি দ্বারে উহারা আপনাদিগের বাস স্থানে গতায়াত করিয়া থাকে এবং আর একটির মধ্যে উহারা মল মূত্রাদি ত্যাজ্য বস্তু পরিত্যাগ করে। উক্ত প্রকার এক একটি বাস গৃহের মধ্যে কতিপয় মারমট একত্র বাস করে। এবং উহারা সকলে একত্র মিলিত হইয়া সমবেত চেষ্টা দ্বারা ঐ বাস গৃহের সমস্ত কার্য্য সমাধা করিয়া থাকে। শীত ঋতুর উপক্রম দেখিয়াই উহারা আপনাদিগের বাস গৃহের প্রবেশ পথ রুদ্ধ করিয়া ফেলে এবং আগামী বসন্ত কাল পর্য্যন্ত সেই গহ্বরে নিদ্রিত থাকে। এতদ্দেশীয় বাবুই নামক পক্ষির বাসা অনে-

কেই সন্দর্শন করিয়াছেন; উক্ত পক্ষীরা আপনাদিগের নীড় নির্ম্মাণ বিষয়ে যে অনুপম কৌশল প্রকাশ করে, মহামহা শিল্পকারী বিচক্ষণ লোকেরাও তাঁহার অনুকরণ করিতে সমর্থ হয় না। উহারা যে কি রূপ কৌশল দ্বারা অতি সূক্ষ্ম তৃণপর্ণাদি একত্র সংযুক্ত করিয়া এ প্রকার অপূর্ব্ব নীড় প্রস্তুত করে, তাহা বোধ গম্য করিবার সাধ্য হয় না। উহাদিগের নীড়ের সন্ধি স্থানে কোন গ্রন্থি কি কোন প্রকার বৃক্ষ নির্য্যাসাদি কিছুই দৃষ্ট হয় না, অথচ ঐ নীড়ের পৃথক্ পৃথক্ তৃণ সকল পরস্পর এ প্রকার দৃঢ়তর রূপে বদ্ধ হইয়া থাকে, যে সামান্য বল দ্বারা ঐ নীড় ছিন্ন করা যায় না। প্রত্যেক পক্ষীই আপনার শরীরের আয়তন ও শাবকের সংখ্যানুসারে বাস স্থান নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। সারস ও শকুনী প্রভৃতি যে সকল পক্ষীর শরীর বৃহৎ এবং যে সমস্ত পক্ষী এক কালে অধিক ডিম্ব প্রসব করে, তাহারা সচরাচর উচ্চ ও প্রশস্ত নীড় নির্ম্মাণ করিয়া থাকে; এবং চাতক ও খঞ্জন প্রভৃতি ক্ষুদ্রকায় পক্ষী গণকে সর্ব্বদা অপ্রশস্ত ও অনুন্নত নীড় প্রস্তুত করিতে দেখা যায়। মনুষ্য যেমন বুদ্ধি দ্বারা সন্তান প্রসূত হইবার পূর্ব্ব লক্ষণ

অবগত হইয়া সূতিকাগারের সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত করিয়া রাখে, পক্ষীগণও সেইরূপ সংস্কার দ্বারা শাবক উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বাবস্থা জানিতে পারিয়া সতর্ক হয়। যে সকল পক্ষী সম্বৎসর কাল নানা স্থানে কেবল উড্ডীন হইয়া ভ্রমণ করে, শাবক প্রসূত হইবার পূর্ব্বে সে সকল পক্ষীও নীড় নির্ম্মাণ করিতে ব্যস্ত হয়, এবং অন্যান্য সময় যে সমস্ত পক্ষী জাতির মধ্যে কিছুমাত্র দাম্পত্য ভাব দেখিতে পাওয়া যায় না, শাবক উৎপত্তির সময় উপস্থিত হইলে তাহাদিগের মধ্যেও বিলক্ষণ স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধ স্থির হয়। ঋতুবিশেষে অনেকানেক পক্ষী স্ত্রী পুরুষ যুগ্ম বদ্ধ হয় এবং দাম্পত্য রূপ দৃঢ়তর বন্ধনে বদ্ধ থাকিয়া স্ত্রী পুরুষ উভয়েই নীড় নির্ম্মাণ ও শাবক প্রতিপালনাদি কার্য্য সমাধা করিতে নিযুক্ত থাকে; এবং যদবধি উহাদিগের উভয়ের শরীর জাত শাবক স্বয়ং আত্ম রক্ষা ও জীবিকা সমাহরণ করিতে সমর্থ হয়, তদবধি ঐ পক্ষী দ্বয়ের মধ্যে আর কোন সম্বন্ধের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব ইহা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে, যে কেবল প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত জগদীশ্বর পক্ষী জাতিকেও সময় বিশেষে

উল্লিখিত দর্শাস্ত্রী নিরঙ্কুশ রূপ অচ্ছেদ্য বন্ধনে বদ্ধ থাকিবার ভাব প্রদান করিয়াছেন। মনুষ্য জাতি যেমন সদ্যোজাত বালকের শয়নের জন্য সুকোমল শয্যা প্রস্তুত করে, পক্ষী গণও সেইরূপ করিয়া থাকে। ডিম্ব প্রসবের পূর্ব্বে পক্ষীগণ কেশ কার্পাস ও পত্রাদি মসৃন এবং কোমল পদার্থের দ্বারা স্ব স্ব নীড়ের মধ্যে উপাদেয় শয্যা প্রস্তুত করে। সিংহ ব্যাঘ্র শৃগালাদি বিবর বাসী জন্তুরা বিশেষ কৌশল পূর্ব্বক আপনাদিগের আকার প্রকার ও সুখ স্বচ্ছন্দতার উপযোগী বাস স্থান নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। ব্যাঘ্র কদাপি শৃগালের গর্ত্ত মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার অনিষ্ট সাধন করিতে পারে না এবং শৃগালও কখন পক্ষীর নীড় আক্রমণ করিয়া তাহার হানি জন্মাইতে পারে না। জগদীশ্বর পশু পক্ষী প্রভৃতি জীব জন্তু দিগকে উপযুক্ত আবাস প্রস্তুত করিবার এই অসাধারণ শক্তি অর্পণ করাতেই এক পর্ব্বত ও এক অরণ্য মধ্যে করী সিংহ, হরিণী ব্যাঘ্র ও অহি নকুল প্রভৃতি খাদ্য খাদক পশুগণ পরস্পর নির্ব্বিঘ্নে বাস করিতে পারিতেছে।

পশু পক্ষীদিগের বাস স্থান নির্ম্মাণ বিষয়ে

যেমন অদ্ভুত সংস্কার শক্তি দেখিতে পাওয়া যায়, সেই রূপ অপরাপর নানাবিধ আশ্চর্য্য কৌশল দ্বারা উহারা আত্ম রক্ষা ও সন্তান পালন করিয়া থাকে। যে বনে মর্কটাদির অধিক দৌরাত্ম্য সে বন মধ্যে পক্ষীরা নীড় নির্ম্মাণ করিবার জন্য উপায়ান্তর অবলম্বন করে; যে সকল পক্ষী অন্যান্য বন মধ্যে প্রকাশ্য স্থলে নীড় নির্ম্মাণ করিয়া থাকে উক্ত বন মধ্যে তাহারা আর সে প্রকার না করিয়া অতি গুপ্ত স্থলে বাস স্থান প্রস্তুত করে। পক্ষীগণ প্রায় মনুষ্যাদি বৈরী বর্গের দৃষ্টির অগোচর স্থল দেখিয়াই আবাস প্রস্তুত করিবার চেষ্টা করে। গ্রীষ্মাধিক্য দেশে যে সকল পক্ষী বৃক্ষ শাখায় নীড় নির্ম্মাণ করে, হিম প্রধান দেশে সেই সকল পক্ষীকে গিরি গহ্বর মধ্যে বাস করিতে দেখা যায়; পশু পক্ষী দিগের আত্ম রক্ষার নিমিত্ত পরমেশ্বর নখ দন্ত শৃঙ্গ প্রভৃতি যাহাকে যে প্রকার উপায় প্রদান করিয়াছেন, বিপদ কালে সে পশু ও সে পক্ষী আপনা হইতেই সেই উপায় অবলম্বন করিতে প্রবৃত্ত হয়, তজ্জন্য তাহাদিগের কিছু মাত্র উপদেশ আবশ্যক হয় না। গো মহিষ ও মেষ ছাগ প্রভৃতি শৃঙ্গ ধারী পশুগণ যুদ্ধ কালে

স্বীয় স্বীয় শৃঙ্গ অগ্রবর্ত্তী করিয়া শত্রু আক্রমণ ও আত্মরক্ষা করিয়া থাকে। শৃঙ্গী পশুরা যেমন বিপদ কালে শৃঙ্গ ব্যবহার করিতে উদ্যত হয়, সেই রূপ সিংহ ব্যাঘ্র ও ভল্লুক প্রভৃতি দন্তী এবং নখী পশুরা কোন বিপদে পতিত বা যুদ্ধে উদ্যত হইলে নখ দন্ত প্রভৃতি স্বীয় স্বীয় অস্ত্র সঞ্চালন করিতে প্রবৃত্ত হয়। মহিষাদি শৃঙ্গধারী পশুরা কদাপি স্বীয় বৈরির প্রতি দন্তাঘাত বা নখাঘাত করিতে উদ্যত হয় না এবং ব্যাঘ্রাদি নখী দন্তী জন্তুগণকেও কদাপি মস্তকাঘাত বা পদাঘাত করিতে দেখা যায় না। শিকার করিবার সময় হস্তী আপন বধ্য বৈরীকে শুণ্ড দ্বারা আক্রমণ করে, দন্তাঘাতে বিদীর্ণ করে এবং কখন বা পদতলে নিক্ষেপ করিয়া স্বীয় গুরুতর অঙ্গ ভার দ্বারা দলন পূর্ব্বক বধ করে। হস্তীর দেহ অতিশয় ভার বিশিষ্ট বলিয়া উক্ত পশু যেমন স্বীয় শত্রুকে সর্ব্বদা পদতলে নিক্ষেপ পূর্ব্বক নিপীড়ন করিয়া বধ করিবার চেষ্টা পায় অশ্ব প্রভৃতি অন্যান্য পশু দিগকে কখন সে প্রকার করিতে দেখা যায় না। অশ্বগণ যখন অরণ্য মধ্যে নিদ্রা যায়, তখন তন্মধ্যে একটি অশ্ব জাগ্রত থাকিয়া প্রহরির কার্য্য সম্পাদন করে এবং

শশ নামক জন্তু যখন শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়, তখন সে স্বীয় গমন কৌশল দ্বারা তাহা হইতে পরিত্রাণ পায়—সংস্কার দ্বারা ইতর জন্তুরা তাহাদিগের শত্রু মিত্র অবগত হইতেও সমর্থ হয়। সর্প মার্জার ও শৃগালাদি কোন কোন হিংস্র জন্তু পক্ষী হিংসা করিয়া থাকে এজন্য পক্ষী জাতি ঐ সকল জন্তু দেখিলেই মুক্ত কণ্ঠে স্বজাতীয় ধ্বনী করিতে প্রবৃত্ত হয়। কুক্কুটী যখন শ্যেন প্রভৃতি কোন প্রকার হিংস্র পক্ষির সাক্ষাৎ পায়, তখন সে এক প্রকার সঙ্কেত শব্দ দ্বারা স্বীয় শাবক গণকে সতর্ক করে এবং শাবক গণও সেই সঙ্কেত শব্দ বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ সাবধান হয়। মারমট নামক জন্তুরা যৎকালে অরণ্য মধ্যে ক্রীড়া করে, তৎকালে তাহাদিগের মধ্যে একটিকে উহারা প্রহরী নিযুক্ত করিয়া রাখে, ঐ প্রহরী যদি নিকটে বৈরস্বরূপ কোন মনুষ্য বা কুক্কুর কি কোন পক্ষীকে আসিতে দেখে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ সে এক প্রকার সঙ্কেত শব্দ করিয়া স্বজাতি দিগকে সতর্ক করে এবং তাহারা সেই শব্দ শুনিয়া [illegible]র মধ্যে প্রবেশ করিলে প্রহরীও তাহাদিগের অনুগামী হয়। ইতর জীব জন্তুদিগের সংস্কার কখন

কখন মনুষ্যের পরিণামদৃষ্টিকেও অতিক্রম করিয়া কার্য্য করে। সংস্কার দ্বারা কোন কোন জীব অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি প্রভৃতি ভাবী ব্যাপারও অগ্রে জানিতে পারে। যখন আমরা কোন মতেই বৃষ্টির সম্ভাবনা মনে করিতে পারিনা, যখন আকাশে কিছু মাত্র মেঘের চিহ্ন দৃষ্ট হয় না, তৎকালেও ভেক চাতক প্রভৃতি কতিপয় জীব বৃষ্টির পূর্ব্ব লক্ষণ জানিত পারিয়া উল্লাস ধ্বনী প্রকাশ করিতে থাকে। সংস্কার প্রভাবে কোন কোন পক্ষী ঋতু বিশেষে দেশ বিশেষে অবস্থান করিয়া আত্ম রক্ষা করিয়া থাকে। এদেশে বর্ষাকালে নানা জাতীয় নূতন নূতন পক্ষী দেখা যায়, কিন্তু বর্ষান্তে তাহারা সকলেই এদেশ হইতে অন্তর্হিত হয়। অনেক পক্ষী গ্রীষ্ম কালে শীত প্রধান দেশে বাস করে এবং শীত কালে উষ্ণ দেশে আসিয়া উপস্থিত হয়। সংস্কার দ্বারা অনেকানেক পশু শারীরিক রোগের ঔষধ অবগত হইয়া বিচক্ষণ চিকিৎসকের ন্যায় আপনাদিগের চিকিৎসা করিয়া থাকে। ভল্লুক এবং নকুল হইতে অনেক প্রকার ক্ষত রোগের ও বিষঘ্ন ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে। বিড়াল জাতির কোন রোগ বিশেষ উপস্থিত হইলে

তাহাদিগকে এক প্রকার তৃণ ভক্ষণ করিয়া বমন করিতে দেখা যায়।

ইতর জন্তুদিগের বৎস পালন ব্যাপারও অল্প আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, উহা মনে হইলেও মানস-মন্দিরে জগদীশ্বরের মহিমা দেদীপ্যমান হইয়া উঠে। চঞ্চল স্বভাব পক্ষিগণ সততই নানা স্থানে অস্থির হইয়া ভ্রমণ করিয়া থাকে; কিন্তু ডিম্ব প্রসব করিবার পরেই অমনি উহারা আশ্চর্য্য বাৎসল্য ভাবে বদ্ধ হইয়া নিরন্তর নীড় মধ্যে অবস্থিতি করে এবং স্বীয় শরীর দ্বারা সেই প্রসূত ডিম্ব আচ্ছাদন করিয়া তাহাকে সমুচিত উষ্ণাবস্থায় রক্ষা করে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পক্ষীদিগের অণ্ড উক্তপ্রকারে আচ্ছাদন করিয়া না রাখিলে উহার উত্তাপ নষ্ট হইয়া শীঘ্রই ডিম্বের হানি হইতে পারে। কিন্তু বৃহৎ বৃহৎ পক্ষি-গণের অণ্ডেতে সমধিক উষ্ণতা বিদ্যমান থাকাতে তাহা ঐ প্রকার করিয়া আচ্ছাদন করিবার আবশ্যক হয় না বলিয়া বৃহৎ পক্ষিগণ ডিম্বপ্রসবান্তে মধ্যে মধ্যে স্থানান্তরও গমন করিয়া থাকে কিন্তু যৎকালে তাহারা বাস স্থান পরিত্যাগ করিয়া গমন করে, তখন প্রসূত ডিম্ব গুলিকে নানাবিধ তৃণাদি দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়া যায়। যে জন্তুর যে প্রকার সংস্কার থাকা আবশ্যক পরমেশ্বর তাহাকে সেই রূপ সংস্কার প্রদান করিয়াছেন, কাহারও কোন

অংশে মমতা রাখেন নাই। এক প্রকার পক্ষী, ডিম্ব প্রসব করিয়া স্থানান্তর গমন করে; কিন্তু ডিম্ব প্রস্ফুটিত হইবার সময় উপস্থিত হইলে সংস্কার দ্বারা জানিতে পারিয়া প্রত্যাগমন পূর্ব্বক স্বীয় চঞ্চু দ্বারা সেই সকল ডিম্ব বিদীর্ণ করিতে আরম্ভ করে। অনেকানেক জীব জন্তু গর্ভ ধারণ করিয়া অবধি শাবকের নিমিত্ত ভোজ্য আহরণ করিতে আরম্ভ করে এবং কোন কোন কীট পতঙ্গাদি স্বজাতীয় জীবিকাস্থান সন্দর্শন করিয়া সেই স্থানে ডিম্ব প্রসব করে। জীবিতাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অসমসাহসিক কর্ম্ম করিয়াও কোন কোন জন্তু সন্তান রক্ষা করিয়া থাকে। মেষী কুক্কুটী প্রভৃতি যে সমস্ত পশু পক্ষ্যাদি স্বভাবতঃ শান্তপ্রকৃতি, শাবক রক্ষার জন্য তাহারাও উগ্র স্বভাব ধারণ করিয়া থাকে। যাহারা ঋক্ষশাবক ধৃত করিয়া বিক্রয় করে, তাহারা কদাপি ভল্লূকী বিদ্যমান থাকিতে শাবকের প্রতি আক্রমণ করে না। ভল্লূকীর সমক্ষে তাহার শাবকগণের প্রতি আক্রমণ করিলে ঘোর প্রমাদ উপস্থিত হয়। আক্রমণকারী ব্যক্তির প্রাণ রক্ষা পাওয়া ভার হয়। এই রূপ স্বাভাবিক সংস্কারপ্রভাবে পশু পক্ষী প্রভৃতি জীব জন্তু সকল স্ব স্ব সমস্ত প্রয়োজন সিদ্ধ করিয়া সুখে জীবন ধারণ করিতেছে। সংস্কার জীবের প্রধান সহায়। মনুষ্য-

শিশুর স্তন্য পান করাও সংস্কারের কার্য্য। বুদ্ধির অভাব স্থলেই জগদীশ্বর সংস্কার প্রদান করিয়াছেন, বুদ্ধি যে স্থলে কার্য্য করিতে অপারগ হয়, সে স্থলে সংস্কার কার্য্য করে। সংস্কারবলে আমরাও অনেক বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিয়া থাকি।

হে মানব! একবার চিন্তা করিয়া দেখ, কাহার নিকট হইতে অবোধ পশ্বাদি অভ্রান্ত সংস্কার প্রাপ্ত হইয়া বুদ্ধিমান মনুষ্যের ন্যায় কার্য্য করিতেছে: কোন্ যন্ত্রী এই বিশ্বরূপ যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া ইহার তান দ্বারা মানবের মন মোহিত করিতেছেন? কেবল এই বিশ্বযন্ত্রের তান শ্রবণ করিয়া বিমোহিত হইলেই কি মনুষ্যনামের গৌরব হইবে? একবার ইহার রচয়িতার জ্ঞান শক্তি ও মহিমা স্মরণ পূর্ব্বক তাঁহাকে মনের সহিত নমস্কার করিয়া আপনার কর্ম্ম সিদ্ধ ও জন্ম সফল কর।

পরম কৌশলকারী পরমেশ্বর পৃথিবীতে যে প্রকার কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন, তন্মধ্যে মানব দেহের কৌশলের তুল্য অদ্ভুত কৌশল, বোধ হয়, আর কুত্রাপি বিদ্যমান নাই। মানব দেহ কেবল কৌশলময়। তিনি মনুষ্যশরীরে যে সমস্ত সূক্ষ্মানু সূক্ষ্ম কৌশল সম্পাদন করিয়াছেন, সে সমুদায়ের কথা দূরে থাকুক, তাহার স্থূল স্থূল বিষয় ভাবিতে হইলেও এক কালে বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইতে হয়। জগদীশ্বরের কৌশলানুসারে প্রতি নিমেষে আমাদিগের দেহের মধ্যে যে সমস্ত অদ্ভুত ব্যাপার সম্পন্ন হইতেছে, আমরা যদি এক বার তাহার প্রতি মনোনিবেশ করি, তাহা হইলেই তাঁহার জ্ঞান, শক্তি ও করুণা আমাদিগের মনে দেদীপ্যমান হইয়া উঠে, তাঁহার মহিমা আলোচনা করিবার জন্য আমাদিগকে আর কুত্রাপি দৃষ্টিপাত করিতে হয় না। আমাদিগের শরীরের অন্তর্ব্বাহ্য সকল অংশই উচ্চৈঃস্বরে তাঁহার মহিমার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে এবং আমাদিগের আপাদমস্তক সকল অঙ্গেই তাঁহার করুণা প্রকাশিত রহিয়াছে। মনুষ্যের মনোহর মুখশ্রী সন্দর্শন করিয়া সকল লোকে

পুলকিত হয়, যে মুখশ্রী সমুদায় সুন্দর পদার্থের মধ্যে অগ্রগণ্য বলিয়া পরিগৃহীত হইলেও হইতে পারে এবং কবিগণ যাহার সহিত পূর্ণ শশধর ও বিকসিত পদ্ম পুষ্পের শোভার তুলনা করিয়াও তৃপ্ত হয়েন নাই, পরম কৌশলকর্ত্তা পরম পুরুষ সেই মুখেতে যে কি অনুপম কৌশল প্রকাশ পূর্ব্বক তাহার এতাদৃশ অসামান্য শ্রী সম্পাদন করিয়া তাহাকে মনুষ্যের উপকারী করিয়াছেন, তাহা বাক্য দ্বারা ব্যক্ত হইতে পারে না! মুখমণ্ডল মনুষ্যের যেমন সৌন্দর্য্যের মূলাধার, সেই রূপ সকল জ্ঞানেন্দ্রিয়েরও অধিষ্ঠান স্থল। মনুষ্যের মুখ রচনা দ্বারা জগদীশ্বর এক স্থলে সৌন্দর্য্য ও উপকারিত্ব গুণ সম্পাদন করিয়া একেবারে কৌশলের শেষ করিয়াছেন। মনুষ্যের মুখেতে জগদীশ্বর যে কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার তুলনা দিবার আর স্থল দৃষ্ট হয় না। চক্ষু কর্ণ নাসিকা প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল যে স্থলে যোজনা করিলে সুন্দর রূপে মনুষ্যের দর্শনাদি ক্রিয়া নির্ব্বাহ পাইতে পারে, জগদীশ্বর ঐ সকল ইন্দ্রিয়কে সেই স্থলেই সংস্থাপন করিয়াছেন, অথচ তদ্দারাই মনুষ্যের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হইয়াছে। জগদীশ্বর মনুষ্যমুখের যে স্থলে চক্ষু সংযোজনা করিয়াছেন, চক্ষু যদি সে স্থলে সংস্থিত না হইয়া তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধ বা অধোভাগে সংস্থাপিত

হইত এবং তিনি উহাকে যে প্রকারে নির্ম্মাণ করিয়াছেন ; যদি সে রূপে নির্ম্মাণ না করিয়া অন্য রূপে নির্ম্মাণ করিতেন, তাহা হইলে যে কোন রূপেই মনুষ্যের দর্শন কার্য্য এক্ষণকার মত সুচারু রূপে নির্ব্বাহিত হইত না, তাহাতে আর সন্দেহ নাই, নেত্রতত্ত্বজ্ঞ বিচক্ষণ পণ্ডিতেরা বিবিধমতে তাহা প্রমাণ করিয়াছেন এবং জগদীশ্বর কর্ত্তৃক মনুষ্যের নেত্রদ্বয় যে রূপে রচিত হইয়াছে, তাহা যদি সে রূপে রচিত না হইয়া প্রকারান্তরে রচিত হইত এবং যে স্থলে সংস্থিত হইয়াছে সে স্থলে না থাকিয়া স্থানান্তরে থাকিত, তাহা হইলে যে মানবের মুখমণ্ডল কদাপি এপ্রকার শ্রীসম্পন্ন হইত না তাহাতে আর কোন সন্দেহ হইতে পারে না। এই রূপ নাসিকা ও কর্ণ প্রভৃতি অন্যান্য ইন্দ্রিয় সকল যদি এক্ষণকার অপেক্ষা অন্য প্রকারে রচিত বা অন্য স্থানে সংস্থাপিত হইত, তাহা হইলেও মনুষ্যের শ্রবণ আঘ্রাণ প্রভৃতি অন্যান্য কার্য্য নির্ব্বাহ হইবার পক্ষে বিশেষ ব্যাঘাত উপস্থিত হইত এবং তাহার সৌন্দর্য্যেরও অনেক হানি হইত। যে সমস্ত তত্ত্বদর্শী পণ্ডিত নাসিকাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয় সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারা বিলক্ষণ অবগত হইয়াছেন, যে আমাদিগের শরীরের মধ্যে ঘ্রাণেন্দ্রিয় নাসিকাকে ও শ্রবণেন্দ্রিয় কর্ণকে যে রূপে

রচনা করিলে ও যে স্থানে যোজনা করিলে আমরা সুন্দররূপে আঘ্রাণ ও শ্রবণ ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া সুখী হইতে পারি, করুণাসাগর পরমেশ্বর উহাদিগকে সেই রূপেই রচনা ও সেই স্থলেই যোজনা করিয়াছেন। আমাদিগের নাসিকা মুখের পুরোভাগে এই রূপ উন্নত ভাবে থাকাতেই আমরা সম্মুখস্থ সুগন্ধ দ্রব্যের ঘ্রাণ গ্রহণ করিয়া সুখী হইতেছি ও শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া সমাধা করিয়া জীবন ধারণ করিতেছি এবং আমাদিগের শ্রবণেন্দ্রিয় কর্ণ মস্তকের উভয় পার্শ্বে অবস্থিত আছে বলিয়াই আমরা অতি সহজে চতুর্দ্দিক্ হইতেই সর্ব্ব প্রকার শব্দ শ্রবণ করিয়া সুখী ও সতর্ক হইতেছি। অতএব বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে, যে অনন্ত জ্ঞানময় আদি পুরুষ বিশেষ কৌশল পূর্ব্বক যথা নিয়মে ও যথা স্থানে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় যোজনা দ্বারা মনুষ্যের মুখমণ্ডল রচনা করিয়া তাহাকে এতাদৃশ শ্রীমান্ ও কার্য্যোপযোগী করিয়াছেন। চক্ষু কর্ণ ও নাসিকা প্রভৃতি যে সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা মনুষ্যমুখের এতাদৃশ রূপ উৎপন্ন হইয়াছে, মুখেতে সেই সকল অঙ্গ বিদ্যমান থাকা নিতান্ত আবশ্যক। বিশেষতঃ ললাট, গণ্ড, ওষ্ঠ, চিবুক প্রভৃতি অপরাপর ভাগেতেও জগদীশ্বরের করুণা-পূর্ণ হস্তের অনুপম কৌশল সুস্পষ্ট প্রকাশিত রহিয়াছে। জগ-

দীশ্বর যেরূপ আশ্চর্য্য কৌশলে উল্লিখিত সমুদায় ভাগের শ্রী সম্পাদন করিয়াছেন তাহা বর্ণনের অতীত। জগদীশ্বর যে কয়েক খণ্ড অস্থি সহকারে হনু ও চিবুকাদির রচনা করিয়াছেন, তাহার এক খণ্ড ন্যূন বা অধিক হইলেও মনুষ্য, মুখ বিস্তারাদি করিতে পারিত না এবং মুখমণ্ডলেরও কোন শ্রী থাকিত না। মনুষ্যের মুখমণ্ডলকে শ্রীসম্পন্ন ও কার্য্যোপযোগী করিবার জন্য জগদীশ্বর যে কি পর্য্যন্ত কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বর্ণন করিয়া শেষ করা যায় না। শারীরস্থানবিদ্যাব্যবসায়ী পণ্ডিতগণ শব-শরীর ব্যবচ্ছেদ করিয়া দেখিয়াছেন, যে মুখমণ্ডলের ঊর্দ্ধদেশে ১৩ খণ্ড মাত্র অস্থি বিদ্যমান আছে, উহার উভয় পার্শ্বে ছয় খণ্ড করিয়া দ্বাদশ খণ্ড অস্থি আছে এবং এক খণ্ড মধ্য ভাগে রহিয়াছে। মুখমণ্ডলের ঊর্দ্ধদেশের অন্তর্ভাগে যেমন ১৩ খণ্ড অস্থি দৃষ্ট হয় সেইরূপ উহার অধোভাগ ব্যবচ্ছেদ করিলেও উভয় দিকে তিন খণ্ড করিয়া আর ছয় খণ্ড অস্থি দেখিতে পাওয়া যায়। এই কয়েক খণ্ড নির্দ্দিষ্ট অস্থি ও কতক গুলি শিরা ও রস রক্তাদি পদার্থ দ্বারা এতাদৃশ সৌন্দর্য্যশালী মুখের রচনা করা যে কত দুর পর্য্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় তাহা মনেতে ধারণ করা অসাধ্য! মানবের মুখমণ্ডল রচনা-

বিষয়ে জগদীশ্বর আর একটি অদ্ভুত কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি প্রত্যেক ব্যক্তির মুখে-তেই দুই চক্ষু দুই কর্ণ এক নাসিকা প্রদান করিয়াছেন এবং আর আর সর্ব্ব প্রকারেও সমান করিয়া রচনা করিয়াছেন, অথচ প্রত্যেক মনুষ্যের মুখশ্রীই পৃথক পৃথক হইয়া রহিয়াছে, সম্পূর্ণ রূপে অভিন্নাকার দুই জন মনুষ্য দৃষ্ট হওয়া এক প্রকার অসম্ভব। কোটি লোক একত্রিত হইলেও তাহার মধ্য হইতে আপন পরিচিত ব্যক্তিকে চিনিয়া লওয়া যায়। সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এক সমান করিয়া এপ্রকার বিভিন্ন প্রকার রূপ সম্পন্ন করা দৃষ্টিগোচর না করিলে কি কেহ সম্ভব বলিয়াও মনে করিতে পারে? কোন উৎপন্নমতি শিল্পকর আজন্ম পরি-শ্রম করিলেও এ কৌশলে বুদ্ধি নিবেশ করিতে সমর্থ হয় না।

পরমেশ্বর মনুষ্যের চক্ষু কর্ণ ও হস্ত প্রভৃতি কোন কোন অঙ্গ দুইটি করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন এবং নাসা রসনা প্রভৃতি কতিপয় অঙ্গ একটী করিয়াই রচনা করিয়াছেন, কিন্তু ইহার মধ্যে বিশেষ তাৎপর্য্য এই দৃষ্ট হইতেছে, যে ঈশ্বর মানবের হস্ত পদাদি যে যে অঙ্গকে দুইটি করিয়া রচনা করিয়াছেন, সে সমুদয় উঁহার দেহের উভয় পার্শ্বে সংযোজন করিয়া দিয়াছেন এবং নাসিকা ও জিহ্বা প্রভৃতিকে

যে অঙ্গকে একটি মাত্র করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন তাহা মনুষ্য দেহের মধ্যভাগেই সংস্থাপন করিয়াছেন অথচ ঐরূপ কৌশল দ্বারাই মনুষ্যশরীর আশ্চর্য্য শ্রীসম্পন্ন ও কার্য্যোপযোগী হইয়াছে। মনুষ্য যেমন এক চক্ষু বা এক কর্ণ হইলে তাহার দেহ যাত্রা নির্ব্বাহ হওয়া অনেক কঠিন হইত এবং তাহার নাসামূলে এক মাত্র চক্ষু ও ললাট বা গ্রীবা দেশে একটি মাত্র কর্ণ সংযুক্ত হইলে তাহার কিছুমাত্র সৌন্দর্য্য থাকিত না, সেই রূপ মনুষ্য যদি এক ভুজ ও এক পদ হইত, তাহা হইলেও উহার প্রয়োজন সাধন পক্ষে বিশেষ বাধা উপস্থিত হইত এবং উহার দেহের উভয় পার্শ্বে বাহু দ্বয় ও পদ দ্বয়ের সৃষ্টি না হইয়া যদি উহার কণ্ঠমূলে এক হস্ত ও নাভিদেশে একটী পদের সৃষ্টি হইত, তাহা হইলেও উহার শরীরের কিছু মাত্র সৌন্দর্য্য থাকিত না। মনুষ্যদেহ রচনার বিষয় ভাবিতে হইলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়! মনুষ্যের বাহুদ্বয় এই রূপ দেহের উভয় পার্শ্বে বিলম্বিত থাকা যে কি পর্য্যন্ত আবশ্যক, তাহা কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিলে সকলেরই বোধগম্য হইতে পারে। ভোজন পান ও আত্মরক্ষাদি যে সকল কার্য্য নির্ব্বাহের উদ্দেশে জগদীশ্বর মনুষ্যকে হস্ত প্রদান করিয়াছেন, হস্ত যদি শরীরে উভয় পার্শ্বে এই রূপে বিলম্বিত না থাকিত, তাহ

হইলে কখনই তদ্দ্বারা উহার সে সমুদায় কর্ম্ম নির্ব্বাহিত হইত না। মনুষ্যের উভয় স্কন্ধদেশে উভয় বাহু সংলগ্ন না থাকিলে তদ্দ্বারা মানবের বহু প্রকার কার্য্য যে সুচারু রূপে নির্ব্বাহিত হইত না, শরীরতত্ত্ববিৎ সুধীগণ তাহা বিশেষ রূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন এবং তাহা নানা পণ্ডিত নানা প্রকার গ্রন্থে বিস্তার ক্রমে বর্ণন করিয়া গিয়াছেন *। হস্ত যেমন মনুষ্যদেহের উভয় পার্শ্বে সংযুক্ত থাকা নিতান্ত আবশ্যক, সেই রূপ মনুষ্যের পদদ্বয়ও কটি মূলের উভয় দিকে সংস্থাপিত হওয়া সম্পূর্ণ আবশ্যক। জগদীশ্বর যদি মনুষ্য শরীরের উভয় পার্শ্বে এই রূপ পদদ্বয় প্রদান না করিয়া তাহার নাভিমূলে একটীমাত্র পদের সৃষ্টি করিতেন, তাহা হইলে যেমন তাহার শারীরিক সৌন্দর্য্যের ব্যাঘাত হইত, সেই রূপ তাহার গমন ক্রিয়ার পক্ষেও বিশেষ ব্যাঘাত জন্মিত। মানবের পদরচনা বিষয়ে জগদীশ্বর যে কি পর্য্যন্ত কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বর্ণনাতীত! মনুষ্য কেবল তাঁহারই কৌশলপ্রভাবে এই পদদ্বয় দ্বারা এতাদৃশ সমুন্নত শরীরের ভার বহন পূর্ব্বক দীর্ঘ কাল দণ্ডায়মান থাকিতে সমর্থ হয়। মনুষ্যের প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে কোন প্রকার অবলম্বন

* Bell on the mechanism of the band.

যোজনা না করিলে সে প্রতিমূর্ত্তিকে কেবল পদ-ভরে ব্যাপক কাল মৃত্তিকার উপরি উন্নত ভাবে স্থাপন করিয়া রাখা অসাধ্য, তাহার নিম্নে কোন প্রকার প্রশস্তায়তন পদার্থ সংযোগ করিয়া না দিলে অত্যল্প আঘাত দ্বারাই তাহা ভূতলে পতিত হয়; কিন্তু মনুষ্য কেবল পদের উপর নির্ভর করিয়া অনায়াসে দীর্ঘ কাল দণ্ডায়মান হইতেছে, অব-লীলাক্রমে গমনাগমন করিতেছে এবং কোন প্রকার বিঘ্ন ব্যতিরেকে অতি সত্বর বেগে ধাবিতও হইতেছে। মনুষ্য নিতান্ত অসাবধান না হইলে আর সহসা কোন ক্রমে পতিত হয় না। অপরা-পর জড় বস্তু পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তির দ্বারা যে রূপ আকৃষ্ট হইয়া থাকে, মনুষ্য দেহও যে তদ্রূপ আকৃষ্ট হয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই; কিন্তু জগদীশ্বর এরূপ আশ্চর্য্য কৌশল পূর্ব্বক মনুষ্যের পদদ্বয়ের রচনা করিয়াছেন এবং তাহাকে এরূপ আশ্চর্য্য শক্তি প্রদান করিয়াছেন, যে সে তদ্দ্বারা অবলীলাক্রমে পৃথিবীর আকর্ষণের প্রতিবিধান করিয়া আপনার গমনাদি ক্রিয়া সমাধা করিতে সমর্থ হয়, শিশু সন্তানও এক বার চলিতে শিখিলে আর সহসা ভূতলে পতিত হয় না।

মনুষ্যশরীর রচনা বিষয়ে পরমেশ্বরের যে প্রকার সাধারণ পদ্ধতি দেখিতে পাওয়া যায়, স্থল

বিশেষে তাহার অন্যথাচরণ করিয়াও তিনি মানবের সুখ বৃদ্ধি ও সৌন্দর্য্য সাধন করিয়াছেন। মনুষ্যদেহের অপরাপর অস্থিময় ভাগ যে রূপ মাংস চর্ম্মাদি দ্বারা আবৃত, উহার দন্ত সে রূপ নহে। মনুষ্যের দন্তকে যদি জগদীশ্বর মাংসাদি কোন প্রকার কোমল পদার্থ দ্বারা আবৃত করিতেন, তাহা হইলে তাহার আর ক্লেশের পরিশেষ থাকিত না। তাহা হইলে হয় মনুষ্যকে চর্ব্বণ শক্তি বর্জ্জিত হইতে হইত, অথবা ঐ চর্ব্বণ ক্রিয়া তাহার বিশেষ ক্লেশের কারণ হইত।

মনুষ্য দেহের প্রত্যেক লোমকূপেতেও জগদীশ্বরের কৌশল ও করুণা প্রকাশিত রহিয়াছে। আমাদিগের এক একটি লোমকূপ এক একটি কল্যাণদ্বার। আমাদিগের শরীরস্থ প্রত্যেক লোমকূপ দ্বারা ঘর্ম্মাদি দেহান্তর্গত অনিষ্টকারী দুষ্ট পদার্থ নির্গত হইয়া আমাদিগের সুস্থতা সম্পাদন করিয়া থাকে। আমাদিগের শরীরে লোমকূপ সমূহ না থাকিলে যে আমাদিগের কি দশা উপস্থিত হইত, তাহা অতি সহজেই সকলের অনুভূত হইতে পারে, যে সময় যে ব্যক্তির লোমদ্বারসকল কোন কারণ বশত রুদ্ধ হয়, তখনি তাহার শরীরে বিশেষ পীড়া উপস্থিত হইতে থাকে। লোম রন্ধ্র সকল এক কালে রুদ্ধ হইলে আমাদিগের জীবন

ধারণ করাই কঠিন হইয়া উঠিত। অতএব বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে, যে মানব দেহের যে স্থলে যে রূপ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সংযোগ করিলে তাহার সুখ স্বচ্ছন্দতা ও স্বাস্থ্য ভোগ হইয়া নির্ব্বিঘ্নে জীবন ধারণ হইতে পারে, পরম করুণাকর পরমেশ্বর সেই স্থলে সেই রূপ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সংযোগ করিয়াই তাহাকে এতাদৃশ অসামান্য শ্রীসম্পন্ন ও সংসারের কর্ম্মোপযোগী করিয়াছেন।

মনুষ্যের হস্ত পদ চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি বহিরঙ্গেতে জগদীশ্বরের যাদৃশ কৌশল প্রকাশিত রহিয়াছে, উহার শরীরের সমুদায় অন্তর্ভাগেও তাঁহার তাদৃশ কৌশল বিদ্যমান আছে। শারীর-স্থান বিদ্যা ব্যবসায়ী পণ্ডিত গণ যখন শব শরীর ব্যবচ্ছেদ করিয়া উহার অন্তর্ভাগ পরীক্ষা করিয়া দেখেন, তখন তাহার প্রত্যেক অস্থি খণ্ডেতে ঈশ্বরের অদ্ভুত কৌশল কলাপ সন্দর্শন করিয়া বিমোহিত হয়েন। কোন পূর্ণবয়স্ক যুবা পুরুষের শরীর ছেদ করিলে তন্মধ্যে ২৫৪ খণ্ড অস্থি দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ঐ সমস্ত পৃথক্ পৃথক্ অস্থি খণ্ডকে একত্র সম্বন্ধ করণার্থে জগদীশ্বর যে রূপ আশ্চর্য্য কৌশল পূর্ব্বক অস্থি সন্ধি সকল সম্পাদন করিয়াছেন এবং ঐ অস্থি সকলকে মনুষ্যের কর্ম্মোপযোগী করণার্থে যে কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আমরা বর্ণন

করিয়া শোষ করিতে পারি না। যে যে অস্থিকে যে প্রকারে গ্রন্থন করিলে মনুষ্য মুখেতে হস্ত পদাদি সঞ্চালন করিয়া জীবন ধারণ করিতে পারে, পরমেশ্বর তাহাকে তদ্রূপ করিয়াই সংযোগ করিয়াছেন। হস্ত পদাদির সঞ্চালন দ্বারা শরীরের যে সকল অস্থিস্থলে সর্ব্বদা অস্থিতে অস্থিতে ঘর্ষিত হইবার সম্ভাবনা, সেই সকল স্থলের অস্থিকে পরমেশ্বর এক প্রকার কোমল ও মসৃণ পদার্থ দ্বারা আবরণ করিয়াছেন এবং কোন শিল্পীয় যন্ত্রের চক্রের গতি সহজ করণার্থে তাহাতে যেমন কোন শিল্পকারেরা তৈলাদি স্নেহ পদার্থ প্রদান করে, পরমেশ্বরও মনুষ্যের দেহের প্রত্যেক অস্থিতে তদ্রূপ তৈলবৎ এক প্রকার পদার্থ সংযোগ করিয়া তাহাকে সঞ্চালনক্রিয়াতে সহজ করিয়াছেন। শরীরের মধ্যে সকল অস্থিতেই ঈশ্বরের এক একটি বিশেষ কৌশল দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু তন্মধ্যে মনুষ্যের মেরুদণ্ডেতে তাঁহার অত্যদ্ভুত কৌশল বিদ্যমান আছে। শয়ন উত্থান ও উপবেশন কালে মনুষ্যকে সরল, বক্র ও অবনত হইয়া নানা ভাবে স্থিতি করিতে হয়, এই জন্য জগদীশ্বর বিশেষ কৌশল পূর্ব্বক মেরুদণ্ডের অস্থিকে তদুপযুক্ত করিয়া রচনা করিয়াছেন। জানু বা জঙ্ঘার ন্যায় যদি মেরুদণ্ড এক খণ্ড অস্থি দ্বারা রচিত হইত, তাহা হইলে

আর মনুষ্যের ক্লেশের শেষ থাকিত না; তাহা হইলে নানা কারণে মেরু দেশের অস্থি অচিরে চূর্ণ হইয়া যাইত, এজন্য জগদীশ্বর উহাকে ২৪ খণ্ড পৃথক্ পৃথক্ অস্থি দ্বারা নির্ম্মাণ করিয়া মনুষ্যের অসংখ্য ক্লেশের প্রতিবিধান করিয়া রাখিয়াছেন। উহার প্রত্যেক খণ্ডেরই দুই প্রান্তের আকার দুই প্রকার। এক প্রান্ত কিঞ্চিৎ উন্নত ও অপর প্রান্ত কিঞ্চিৎ গহ্বর বিশিষ্ট। এক খণ্ডের অবনত প্রান্ত মধ্যে অপর খণ্ডের উন্নত পার্শ্ব প্রবিষ্ট করিয়া জগদীশ্বর মেরু দণ্ডের সন্ধি বন্ধন সিদ্ধ করিয়াছেন। মনুষ্যের মেরুদণ্ড সন্দর্শন করিলে বোধ হয় যে বিশ্ব কৌশলকারী জগদীশ্বর বিশেষ নৈপুণ্য সহকারে বিনা সূত্রে আশ্চর্য্য অস্থিমালা গ্রন্থন করিয়াছেন। তাঁহার কৌশল গুণে মেরু দণ্ডের এক খণ্ড অস্থিও সন্ধিভ্রষ্ট হইয়া পড়িতে পারে না, অথচ মনুষ্যও অনায়াসে তাহা অবনত ও উন্নত করিয়া সরল বা বক্র ভাবে অবস্থান করিতে পারে। মজ্জা মনুষ্যের প্রধান ধাতু। মজ্জাতে কিঞ্চিৎ আঘাত লাগিলে মনুষ্যের জীবন রক্ষা পাওয়া কঠিন হয়, এজন্য জগদীশ্বর ঐ মজ্জাকে অতি যত্নে অস্থিময় কোষমধ্যে রক্ষা করিয়াছেন সুতরাং কোন মতেই মজ্জাতে আঘাত লাগিবার সম্ভাবনা নাই। মস্তকস্থিত মস্তিষ্ক হইতে নির্গ

হইয়া মেরুদণ্ডাস্থির মধ্য দিয়া মনুষ্যের মজ্জা ক্রমে সঞ্চালিত হইয়াছে। মনুষ্যের প্রত্যেক শিরা ও মাংসপেশীতেও ঈশ্বরের অনুপম জ্ঞানের সুস্পষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। শরীরের অনেক মাংসপেশীকে জগদীশ্বর আমাদিগের আজ্ঞাবহ করিয়াদিয়াছেন; আমরা ইচ্ছা করিলেই ঐ সমস্ত মাংসপেশীর সঞ্চালন দ্বারা আপনাদিগের ভোজন পানাদি ক্রিয়া সমাধা করিতে পারি। আমাদিগের ইচ্ছানুসারে আমরা কোন কোন মাংসপেশী সঞ্চালন করিয়া কোন কোন অঙ্গের চালনা করিতে পারি, এবং আমাদিগের ইচ্ছাব্যতিরেকেও শরীরের মধ্যে কোন কোন স্থানের গতি আপনা হইতে সম্পন্ন হয়। আমরা যখন নিদ্রিত থাকি, তখনও আমাদিগের হৃদয় ও পাকস্থলী প্রভৃতি কোন কোন অঙ্গের গতি ক্রিয়া সম্পন্ন হইতে থাকে; ঐ সকল স্থানের গতি আমাদিগের ইচ্ছার অনুগত হইলে নিদ্রাবস্থায় তাহা রুদ্ধ হইত এবং আমরা নিদ্রিত হইলেই আর তাহা হইতে আমাদিগকে গাত্রোত্থান করিতে হইত না, এক নিদ্রাতেই আমাদিগের মহা নিদ্রা উপস্থিত হইত। এই জন্য জগদীশ্বর ঐ সমস্ত অঙ্গের গতিকে আমাদিগের ইচ্ছার অধীন করেন নাই। যে সকল অঙ্গের গতিকে আমাদিগের ইচ্ছার অধীন করিলে

শরীর ভ্রমণ করিয়া পুনর্ব্বার হৃদয়ে প্রত্যাগমন করিবার উপক্রম করে, তখন উহার প্রকৃতি এত দুষ্ট যে কোন ব্যক্তি উহার এক বিন্দু মাত্র উদরস্থ করিলে অমনি তাহার প্রাণ বিয়োগ হইতে পারে কিন্তু ঐ অবস্থাতেই উহা সংশোধিত হয়। দেহ-পরিভ্রান্ত বিকৃত শোণিত যেমন আমাদিগের বক্ষঃ-স্থলের দক্ষিণ পার্শ্বে আসিয়া উপনীত হয়, অমনি উহা নিশ্বাস বায়ু দ্বারা সংশোধিত হইতে আরম্ভ করে। জগদীশ্বর আমাদিগের বক্ষঃস্থলের বাম পার্শ্বে যেমন রক্তাধার হৃদয়ের রচনা করিয়াছেন, তেমনি উহার দক্ষিণ দিকে এক আশ্চর্য্য বায়ু যন্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন। আমাদিগের নিশ্বাস ক্রিয়া দ্বারা উক্ত বায়ু যন্ত্র সর্ব্বদাই চালিত হইতেছে এবং প্রত্যা-গত দুষ্ট শোণিতকে নিয়তই সংশোধন করিতেছে, ঐ বায়ু যন্ত্রের গতি ক্ষণকালের নিমিত্তও বিরত হয় না, মনুষ্য অত্যল্প কাল মাত্রও নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া থাকিতে পারে না এবং অল্প কালের জন্যেও ঐ বায়ু যন্ত্রের কার্য্যের বিরাম হয় না। হৃদয় হইতে শরীরের বাম দিক্ দিয়া যে বিশুদ্ধ শোণিত প্রবা-হিত হয়, উক্ত শোণিত বিকৃত হইয়া প্রত্যাগমন করিবার সময় আর সে বাম দিক্ দিয়া আইসে না, তাহা নিয়তই বক্ষঃস্থলের দক্ষিণ দিক্ দিয়া ফিরিয়া আইসে এবং তথায় উল্লিখিত বায়ু যন্ত্র দ্বারা

সংশোধিত হয়। শরীরান্তর্গত বিকৃত শোণিত যদি উল্লিখিত প্রকার নিশ্বাস বায়ু দ্বারা শোধিত না হইত, তাহা হইলে অত্যল্প কালের মধ্যেই মনুষ্যের সংহার দশা উপস্থিত হইত।

দেহান্তর্গত পাকস্থলীর, যকৃদ্যন্ত্রের ও মস্তিষ্ক প্রভৃতি অপরাপর স্থানের কার্য্যও অল্প আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। উহাদিগের এক একটি স্থানের বিষয়ে মনোযোগ করিলেও অবাক্ হইতে হয়। আমাদিগের পাকস্থলী মধ্যে যে পাচক রস বিদ্যমান আছে, তাহার এমনি তীব্র শক্তি, যে মনুষ্যের যখন প্রাণ বিয়োগ হয়, তখন উক্ত রস স্বীয় শক্তি দ্বারা ঐ মৃত দেহের মাংস চর্ম্ম প্রভৃতি পদার্থ সকলকে ক্ষয় করিতে আরম্ভ করে, কিন্তু মনুষ্যের জীবিতাবস্থায় ঐ রস তাহার কোন প্রকার অনিষ্ট সাধন না করিয়া বিশেষ কল্যাণেরই কারণ হয়। মনুষ্য যতক্ষণ জীবিত থাকে, ততক্ষণ উক্ত রস তাহার পাকস্থলীর মধ্যে থাকিয়া কেবল সমুদায় ভুক্ত বস্তুকে জীর্ণ করে, কিন্তু শরীরের কোন অংশকে ক্ষয় করে না। যখন আমরা মনে করিয়া দেখি যে কেবল এক পাকস্থলীর পরিপাক শক্তির গুণে সামান্য তৃণ শস্যাদি অনায়াসে রস রক্ত রূপে পরিণত হয়, তখন কি জগদীশ্বরের জ্ঞানশক্তি ও করুণা আমাদিগের মনে জাজ্বল্যতর প্রতীত

হয় না? বিশেষত পাকস্থলীর মধ্যে আর একটি অদ্ভুত কৌশল দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদিগের ভুক্ত বস্তু মাত্র সকলই প্রথমত পাকস্থলী মধ্যে পতিত হয়, কিন্তু পাকস্থলী মধ্যে উহা সুন্দর রূপে জীর্ণ হইলে নানা প্রকারে পরিণত ও বিভক্ত হইয়া নানা পথে গমন করে, সার ভাগ সকল রস রক্ত হইবার জন্য এক দিকে যায় এবং সমুদায় অসার ভাগ শরীর হইতে নির্গত হইবার জন্য পথান্তরে গমন করে। অসার বস্তুর মধ্যেও জলীয় ভাগ এক পথে যায় ও অন্যান্য কঠিনাংশ আর এক পথ দিয়া নির্গত হয়। পরমেশ্বরের মহিমাপ্রভাবে উহাদিগের মধ্যে কেহ কখন আপন আপন নির্দ্দিষ্ট পথ পরিত্যাগ করে না। উহাদিগের মধ্যে যে ভাগ যে নিয়মে যে পথে গমন করে, যদি ক্ষণ কালের জন্য তাহার অন্যথা হয়, তাহা হইলে মনুষ্য আর কোন মতেই জীবন ধারণ বা সুস্থতা রক্ষা করিতে পারে না। যে পথ দিয়া সারাংশ সকল রস রক্ত হইতে গমন করে, সে পথে সমুদায় অসার ভাগ সঞ্চালিত হইলে যে মনুষ্যের দেহ রক্ষা পাওয়া কঠিন হইয়া উঠে, তাহা কে না স্বীকার করিবেন, কোন ভুক্ত বস্তু যদি সুন্দর রূপে জীর্ণ না হইয়া কোন কারণে পাকস্থলী হইতে পরিচ্যুত হয়, তাহা হইলে পুনর্ব্বার তাহা এক

রাখিয়াছেন তাহা কি বলিব! যদি অকস্মাৎ ভোজন কালে কখন কাহারও শ্বাসনির্গমন পথে একটি মাত্র অন্নও প্রবিষ্ট হয় তাহা হইলে তাহার জীবন রক্ষা পাওয়া সংশয় হইয়া উঠে। পরমেশ্বর মানবের অবস্থার সহিতও বাক্‌যন্ত্রের সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। মনুষ্যশিশুর বয়ো বৃদ্ধি হইয়া যখন শ্রবণ দর্শনাদি দ্বারা সকল ভাব উদ্ভূত হইতে থাকে এবং বাক্য বিন্যাস দ্বারা সেই ভাব ব্যক্ত করিবার প্রয়োজন হয়, তখন তাহার বাক্যযন্ত্রও আপনা হইতে সুসম্পন্ন হইয়া উঠে।

মস্তিষ্ক মনের যন্ত্র বিশেষ। মস্তিষ্কের প্রতি কোন আঘাত উপস্থিত হইলে মনুষ্যের জীবন রক্ষা পাওয়া কঠিন হয় এই জন্য জগদীশ্বর ঐ মস্তিষ্ককে বিশেষ যত্ন পূর্ব্বক মনুষ্যের শিরো দেশে দৃঢ়তর অস্থিময় কপাল মধ্যে রক্ষা করিয়াছেন। দেহমধ্যে অন্যান্য যত গহ্বর আছে তাহার কোন গহ্বরই উক্ত প্রকার দৃঢ়তর অস্থি দ্বারা আবৃত নহে, জগদীশ্বর কেবল প্রয়োজনানুসারে মস্তিষ্ককে ঐরূপ অস্থিময় কপাল মধ্যে রক্ষা করিয়াছেন। মস্তিষ্কের সহিত মনুষ্যের শরীরের আশ্চর্য্য সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। মস্তিষ্ক হইতে শ্বেতবর্ণ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ধমনি সকল সর্ব্বশরীর ব্যাপিয়া রহিয়াছে। পদাঙ্গুলির অগ্র ভাগে

অকস্মাৎ আঘাত লাগিলেও তখনি তাহা মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত সঞ্চালিত হয়। যেমন কোন রাজদুর্গ বা রাজভবনের চতুর্দ্দিকে প্রহরী নিযুক্ত থাকে, সেই রূপ পরমেশ্বরও দর্শন শ্রবণ ও আঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয় সকলকে চতুর্দ্দিকে প্রহরী স্বরূপ নিযুক্ত করিয়া কপাল রূপ অস্থিময় দুর্গ মধ্যে মস্তিষ্ক রূপ মহা যন্ত্রকে স্থাপন করিয়াছেন।

গর্ভ* ।

গর্ভ সম্বন্ধীয় সকল বিষয়ই বিস্ময়কর। গর্ভ সংস্থান হওয়া, গর্ভ রক্ষা পাওয়া এবং গর্ভ পালিত হওয়া, ইহার কিছুই সাধারণ ব্যাপার নহে। ইহা এক একটি বিষয়েতেই ঈশ্বরের অপার মহিমা প্রকাশ রহিয়াছে। যে অসীম শক্তিসম্পন্ন আদি পুরুষের অনির্ব্বচনীয় মহিমাপ্রভাবে সামান্য বীজ গর্ভে বৃহৎ বৃক্ষের সমুদায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থিত থাকে, সেই পুরুষের শক্তিক্রমেই মাংস শোণিত ও অস্থিময় উদরমধ্যে গর্ভ হস্ত পদাদি সমুদায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সহকারে অক্লেশে অবস্থিতি করিতে পারে। শারীরস্থান বিদ্যাব্যবসায়ী পণ্ডিত গণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, উদরমধ্যে স্থানে গর্ভ অবস্থান করে, গর্ভ সঞ্চার হইবার পূর্বে সে স্থান সন্দর্শন করিলে কোন মতেই এমন বো হয় না যে, কোন ক্রমেই তথায় এক বিন্দুমাত্র অপর পদার্থ স্থান পাইতে পারে, কিন্তু গর্ভ সঞ্চারের সঙ্গেসঙ্গেই তাহার স্থান প্রস্তুত হইতে থাকে। যে কোষ মধ্যে গর্ভের সঞ্চার হয়, তাহার না জরায়ু বা গর্ভাশয়। ঐ জরায়ুর এমনি চমৎকা গুণ যে, দিন দিন যত গর্ভের বৃদ্ধি হইতে থাকে

* উদরস্থ সন্তান।

বৰ্দ্ধিত হইতে থাকে ; অনন্তর প্রসব কাল পর্য্যন্ত উহা আর সত্বরে বৰ্দ্ধিত হয় না, ক্রমে ক্রমে উহার বৃদ্ধির অবস্থা মন্দীভূত হইয়া যায়। গর্ভ যদি প্রসব কাল পর্য্যন্ত ক্রমাগতই বৰ্দ্ধিত হইত, তাহা হইলে সঙ্কীর্ণ গর্ভাশয়ের মধ্যে কখনই উহার স্থান হইত না, এবং গর্ভিণীও কখন নির্ব্বিঘ্নে গর্ভ ধারণ করিতে পারিত না, অবশ্যই গর্ভ ও গর্ভবতী উভয়ের পক্ষেই বিষম বিঘ্ন উপস্থিত হইত। কিন্তু জগদীশ্বর স্বীয় কারুণ্য গুণে অনুপম কৌশল প্রকাশ পূর্ব্বক উক্ত সম্ভাবিত বিঘ্নের পরিহার করিয়াছেন। ছয় মাস পর্য্যন্ত যে পরিমাণে গর্ভের বৃদ্ধি হয়, পরে আর সে পরিমানে হয় না। ছয় মাসের পর নয় মাস পর্য্যন্ত উহার অঙ্গ সকল সুসম্পন্ন হইতে থাকে এবং অবস্থা পরিপক্ক হয়। শারীরস্থান বিদ্যা-ব্যবসায়ী পণ্ডিতগণ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যে, সামান্যাবস্থাপেক্ষা সসত্বাবস্থায় জরায়ুর পরিমাণ ১২ গুণ বৃদ্ধি হয়। পূর্ণ গর্ভিণী স্ত্রীলোকের জরায়ু ঊর্দ্ধে প্রায় ১৬ অঙ্গুলি পরিমিত বিস্তৃত হইয়া থাকে। কিন্তু করুণানিধান বিশ্বরচয়িতা পরম পুরুষের কি অদ্ভুত মহিমা! তিনি ঐ সঙ্কীর্ণ জরায়ু মধ্যেই সর্ব্বাবয়ব সম্পন্ন মনুষ্য সন্তানকে রক্ষা করিয়া অনায়াসে প্রতিপালন করেন। মনুষ্যশরী

নিশ্চয় নাই। যদি কোন কারণ বশতঃ কখন কোন গর্ভের কোন ক্ষুদ্র পদার্থ প্রকৃত অবস্থা হইতে কিঞ্চিৎ অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়, বা উহার অবস্থিতির ভাবের কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য হয়, তাহা হইলে সে গর্ভ ও গর্ভধারিণীর জীবন রক্ষা পাওয়া কঠিন হইয়া উঠে। বিশেষতঃ গর্ভ পূর্ণ হইলে উহা আপনা হইতে প্রসূত হওয়া আরও অদ্ভুত ব্যাপার। উক্ত ব্যাপার স্মরণ করিলে মন এক কালে ঈশ্বরের মহিমা সাগরে মগ্ন হইয়া যায়। গর্ভ প্রসূত হইবার জন্য জগদীশ্বর যে সকল উপায় করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা দেখিলে বোধ হয় যে বিশ্ব বিধাতা যেন স্বয়ং ধাত্রী রূপ ধারণ করিয়া প্রসূতির প্রসব যন্ত্রণা দূর করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। জরায়ু মধ্যে প্রথমতঃ যখন গর্ভের সঞ্চার হয়, তখন তাহার পদদ্বয় অধোভাগে ও মস্তক ঊর্দ্ধ ভাগে থাকে, অনন্তর গর্ভ যত দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে আরম্ভ করে, ততই উহা ক্রমে হেলিয়া পড়ে এবং দশমাস পরিপূর্ণ হইলে উহার মস্তক, প্রসবের কালে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। তখন উহার মস্তক অধোদিকে ও পদদ্বয় ঊর্দ্ধদিকে হয় এবং প্রসব বেদনা উপস্থিত হইলে উহা অনায়াসেই ভূমিষ্ঠ হইতে পারে। গর্ভের মস্তক ঐ রূপ অধোভাবে স্থিত না হইলে যে গর্ভ ও গর্ভিণী উভয়ের

অশেষ প্রকার যন্ত্রণা উপস্থিত হইত, তাহা ব্যক্ত করাই বাহুল্য, তাহা প্রায় সকলেই অবগত আছেন এবং পণ্ডিতগণ তাহা বিশেষ করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ গর্ভাবস্থা পূর্ণ হইলে ঐ গর্ভ আপনা হইতে বহির্গত হইবার চেষ্টা করে; তৎকালে উহার এরূপ এক আশ্চর্য্য শক্তি উপস্থিত হয়, যে উহা সেই শক্তি সহকারে আপনার বেগেই ভূমিষ্ঠ হয়। করুণা পূর্ণ জগদীশ্বর প্রসব ক্রিয়া সমাধান জন্য নানা উপায় বিধান করিয়া দিয়াছেন। যদি কেবল গর্ভের চেষ্টা দ্বারা প্রসব ক্রিয়া সম্পন্ন হইত, তাহা হইলে মৃতগর্ভ আর কদাপি ভূমিষ্ঠ হইত না এবং অনেক গর্ভবতী স্ত্রী মৃত গর্ভ যন্ত্রণায় প্রপীড়িত হইয়া প্রাণত্যাগ করিত; কিন্তু জগদীশ্বর উপায়ান্তর বিধান করিয়া উল্লিখিত সম্ভাবিত বিপদের প্রতিবিধান করিয়া রাখিয়াছেন। গর্ভবতী স্ত্রীর উদরস্থ কতিপয় মাংসপেশীর সঞ্চালন ক্রিয়া ও জরায়ুর সঙ্কোচ ক্রিয়াই সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার প্রতি প্রধান কারণ। নয় মাস পরিপূর্ণ হইলে গর্ভাশয় ক্রমে সঙ্কুচিত হইতে থাকে এবং তদুপরিস্থিত মাংসপেশী সকল আপনা হইতে গর্ভকে ঠেলিতে আরম্ভ করে। গর্ভ প্রসূত হইবার সময় তৎপার্শ্বস্থ অস্থিও আপনা হইতে শিথিল হইতে আরম্ভ করে, সুতরাং মৃত-

গর্ভও অনায়াসে গর্ভিণীর উদর হইতে স্খলিত হয়।

গর্ভের শরীর মধ্যে যেরূপ অদ্ভুত কৌশলে শোণিত সঞ্চারিত হয় এবং উহা যে প্রকারে আহার প্রাপ্ত হয়, তাহা নিতান্ত বিস্ময়কর ব্যাপার। তদ্দ্বারা জগদীশ্বর এক কালে আপনার করুণা কলাপের শেষ করিয়াছেন। তিনি যেমন সদ্যো-জাত সন্তানের জীবন ধারণের জন্য নবপ্রসূতির মনে স্নেহ ও স্তনে দুগ্ধ অর্পণ করেন, সেই রূপ গর্ভের প্রাণরক্ষার জন্যও গর্ভবতী স্ত্রীর উদর মধ্যে নানা উপায় সংস্থাপন করিয়াছেন। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পর তাহার শরীরে যে নিয়মে শোণিত সঞ্চালিত হয়, গর্ভাবস্থায় সে নিয়মে হইবার কোন উপায় নাই। ইহা অনে-কেই অবগত হইয়াছেন যে, মনুষ্য নিশ্বাস দ্বারা যে বায়ু গ্রহণ করে, তদ্দ্বারা তাহার শরীরস্থ দুষ্ট শোণিত সংশোধিত হয় এবং সেই শোণিত হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার শিরা পথে সর্ব্ব শরীর সঞ্চরণ করে। শরীরস্থিত বায়ু যন্ত্রের সঞ্চালন ক্রিয়াই শোণিত সঞ্চরণের প্রতি প্রধান কারণ, আমাদিগের দেহান্তর্গত বায়ুযন্ত্র যদি ক্ষণকালের জন্যও রুদ্ধ হয়, তাহা হইলেই তৎক্ষণাৎ আমা-দিগের সংহার দশা উপস্থিত হয়; কিন্তু মনুষ্য যখন গর্ভাবস্থায় অবস্থান করে তখন তাহার বায়ু

ক্রিয়া সম্পন্ন বা উক্ত বায়ু যন্ত্র সঞ্চালিত হইবার কোন উপায়ই থাকে না। তৎ কালে তাহাকে বায়ু শূন্য রসরক্তময় চর্ম্মাবৃত জরায়ুরূপ কারাগারে বন্দী থাকিতে হয়, সুতরাং তখন তাহার বায়ু যন্ত্র রুদ্ধ থাকে। মনুষ্য সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পর যে অবস্থায় অবস্থান করে, ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে তাহাকে তাহার সম্পূর্ণরূপ বিপরীত অবস্থায় থাকিতে হয়, এজন্য জগদীশ্বর উদরস্থ সন্তানের শোণিত সঞ্চরণের এক পৃথক্ উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। পোত্রী* নামে এক অপূর্ব্ব যন্ত্র দ্বারা উহার শোণিত সঞ্চালন ও ভোজন ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ঐ পোত্রী এক পরমাদ্ভুত যন্ত্র। উহা গর্ভ সঞ্চার হইবার পূর্ব্বেও থাকে না এবং গর্ভ প্রসূত হইবার পরেও থাকে না। গর্ভ উৎপন্ন হইবার পরে উহার উৎপত্তি হয় এবং প্রসব কাল পর্য্যন্ত উহা আপনার কার্য্য সাধন করিয়া গর্ভ ভূমিষ্ঠ হইবার পর আপনা হইতেই গর্ভধারিণীর উদর হইতে স্খলিত হয়। উক্ত পোত্রী গর্ভ ও গর্ভধারিণী উভয়ের শরীরের মধ্য ভাগে থাকে। উদরস্থ সন্তানের নাভিদেশে যে নাড়ী দৃষ্ট হয়, উক্ত নাড়ীর অগ্রভাগের সহিত উহার যোগ থাকে এবং উহা গর্ভধারিণীর শরীর হইতে শোণিত ও পুষ্টি-

* যাহাকে ফুল বলে।

কর সার পদার্থ সংগ্রহ করিয়া ঐ নাড়ী পথে সঞ্চালন করত গর্ভের শরীরকে পোষণ করে। সামান্যতঃ মনুষ্যশরীরে যেমন কৃষ্ণ ও লোহিত দুই বর্ণের শিরাতে দুই প্রকার শোণিত সঞ্চরণ করে, গর্ভ শরীরে সে রূপ করে না। উহার শরীরে ঈষৎ লোহিত বর্ণ এক প্রকার শোণিতই দৃষ্ট হয়। গর্ভের শরীরে শোণিত সংশোধিত হইবার উপায় নাই বলিয়া জগদীশ্বর উহার শরীরের শোণিতকে গর্ভধারিণীর বক্ষঃ স্থলে আনিয়া সংশোধিত করেন। গর্ভের রক্ষার জন্য জগদীশ্বর যে সমস্ত অদ্ভুত কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ব্যক্ত করিবার শব্দ নাই। গর্ভ ধারিণীর শরীর হইতে গর্ভের আহার প্রাপ্ত হওয়া যে কি পর্য্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় তাহা কি বলিব! গর্ভের আকার যখন যে পরিমাণে বর্দ্ধিত হয়, তখন গর্ভধারিণীর শরীর হইতে উহা সেই পরিমাণেই আহার লাভ করে। গর্ভ যখন ক্ষুদ্র থাকে তখন গর্ভধারিণীর শরীর হইতে তদনুরূপে অল্প মাত্রই পুষ্টিকর সার ভাগ উহার শরীরে যায় এবং যখন উহা কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিত হয়, তখন সেইরূপ সমধিক মাত্রা প্রাপ্ত হয়। এই নির্দ্দিষ্ট নিয়মের কদাপি ব্যতিক্রম ঘটে না, ইহার কিঞ্চিন্মাত্র অন্যথা হইলেই তৎক্ষণাৎ মহানর্থ উপস্থিত হইতে পারে। অধিক

ভোজন ও অল্পাহার দ্বারা যেমন আমাদিগের নানা রোগ উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা, সেই রূপ উহার দ্বারা উদরস্থ সন্তানেরও নানা রোগ জন্মিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ; কিন্তু জগদীশ্বরপ্রসাদাৎ তাহা কস্মিন্ কালেও ঘটিতে পারে না ; ওষ্ঠ তালুকা জিহ্বা দন্ত ও পাকস্থলী প্রভৃতি নানা অঙ্গের সমবেত ক্রিয়া দ্বারা যে ভোজন কার্য্য সম্পন্ন হয়, ঈশ্বরের মহিমা-বলে গর্ভ শরীরে তাহা এক পোত্রী রূপ অদ্ভুত যন্ত্র দ্বারা অনায়াসে সিদ্ধ হইয়া থাকে। জগদীশ্বর যদি গর্ভ রক্ষার নিমিত্ত উল্লিখিত প্রকার নানাবিধ অদ্ভুত কৌশল প্রকাশ না করিতেন, তাহা হইলে পৃথিবী হইতে মনুষ্য কুল এত দিনে বিলুপ্ত হইয়া যাইত।

শৈশবাবস্থা।

মনুষ্য যৎকালে মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হয়, তৎকালে যেন সে এক লোক হইতে লোকান্তরে আগমন করে। সে জননীর জঠরমধ্যে যে প্রকার অবস্থায় অবস্থান করে, পৃথিবীতে আসিয়া তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তাহাকে সহসা বায়ুশূন্য তিমিরাবৃত জরায়ু শয্যা পরিত্যাগ করিয়া এক কালে আলোকময় বায়ু সাগরে আসিয়া মগ্ন হইতে হয় এবং ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে সে যেমন জরায়ু মধ্যে এক প্রকার জলীয় পদার্থে মগ্ন থাকে, ভূমিষ্ঠ হইবার পর আর সে প্রকার থাকে না; কিন্তু জগদীশ্বরের এমনি আশ্চর্য্য শক্তি, যে হঠাৎ এতাদৃশ পরিবর্ত্তন দ্বারা ভূমিষ্ঠ সন্তানের কিছুমাত্র অনিষ্ট ঘটেনা,, সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বেই তিনি তাহাকে পৃথিবীতে বাস করিবার উপযুক্ত করিয়া রাখেন। জগদীশ্বর মনুষ্যের মনের সহিত উহার শরীরের এক চমৎকার সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, উহার মানসিক বৃত্তি সকল যেমন ক্রমে ক্রমে প্রস্ফুটিত হয়, সেই রূপ উহার চক্ষু, কর্ণ, হস্ত, পদাদি ইন্দ্রিয় সকলও ক্রমে তাহার উপযোগী হইয়া উঠে। মনুষ্যশিশু ভূমিষ্ঠ হইয়া ক্রমে ক্রমে

নানা বিষয় শ্রবণ দর্শন করিয়া যখন কতিপয় বাহ্য বিষয়ের জ্ঞান লাভ করে এবং যখন তাহার মনোমধ্যে জ্ঞান তৃষ্ণা কৌতূহল প্রভৃতি নানা প্রকার ভাবের আবির্ভাব হয় ও তাহার সেই সমস্ত ভাব ব্যক্ত করিবার আবশ্যক হয়, তখনি তাহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইতে আরম্ভ হয়। কিন্তু যত দিন পর্য্যন্ত তাহার মনেতে প্রকৃত রূপে বাহ্য বিষয়ের জ্ঞান না জন্মে এবং নানা প্রকার আন্তরিক ভাবের উদয় না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত তাহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইয়া মনোগত ভাব ব্যক্ত করিবারও সাধ্য হয় না। মনুষ্যশিশুকে উল্লিখিত রূপ নিয়মের অধীন করিয়া জগদীশ্বর যে তাহার কি পর্য্যন্ত কল্যাণ সাধন করিয়াছেন তাহা বর্ণনাতীত। মনোগত ভাব ব্যক্ত করিবার প্রয়োজন হইলে তাহা প্রকাশ করিতে না পারা যে কিপর্য্যন্ত ক্লেশের বিষয়, তাহা বাক্যহীন মূক ব্যক্তিই বিলক্ষণ অনুভব করিতে পারে। বিশেষতঃ শিশুর শ্রবণ দর্শনাদি ইন্দ্রিয়েতে জগদীশ্বরের আর একটি অনুপম কৌশল দৃষ্ট হইতেছে। উহার সকল ইন্দ্রিয় একদা প্রস্ফুটিত হয় না এবং এক কালে সকল ইন্দ্রিয় দ্বারা কার্য্য করিবারও আবশ্যক হয় না। ভূমিষ্ঠ হইবার পরে বালক প্রথমতঃ চক্ষু দ্বারা দৃশ্য বস্তু সকল দর্শন করিতে পারে, অনন্তর কিছু দিন বিলম্বে শব্দ শুনিতে পায়, এবং বহু দিন পরে

হস্ত সঞ্চালন করিয়া দ্রব্যাদি স্পর্শ করিতে আরম্ভ করে। বালকের দর্শন শ্রবণাদি ইন্দ্রিয় সকল উল্লি-খিত রূপে ক্রমে ক্রমে প্রস্ফুটিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক এবং তদ্দ্বারা উহার বিশেষ কল্যাণ উদ্ভব হয়। সদ্যোজাত সন্তানের সমুদায় ইন্দ্রিয় যদি এক কালে প্রস্ফুটিত হইত এবং তাহাকে যদি একদা সকল ইন্দ্রিয় দ্বারা কার্য্য করিতে হইত, তাহা হইলে আর তাহার ক্লেশের শেষ থাকিত না, তাহা হইলে তাহাকে বিষম ভ্রমে পতিত হইতে হইত। তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া যখন প্রথমত বাহ্য বিষয় সকল শ্রবণ দর্শন করিতে আরম্ভ করে, তখন প্রত্যেক দৃশ্য বস্তু তাহার দুই চক্ষে দুই দুই বোধ হয় এবং প্রত্যেক শব্দকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে অনুভূত হয় ও তৎকালে সে যদি কোন বস্তুকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিয়া দেখে তাহা হইলে তাহার পাঁচটি অঙ্গুলী দ্বারা এক বস্তুকে পাঁচটি বলিয়া বোধ হইতে পারে। কিন্তু বালকের ঐ সমস্ত ভ্রম দূর করণার্থে জগদীশ্বর এক চমৎকার উপায় করিয়াছেন, উহার এক ইন্দ্রিয় দ্বারা অপর ইন্দ্রিয়ের ভ্রম সংশোধিত হয় এবং ক্রমে অভ্যাস দ্বারা উহার ঐ সমস্ত ভ্রম দূরীভূত হইয়া যায়। যত দিন পর্য্যন্ত বালকের সকল ইন্দ্রিয় সুসম্পন্ন হইয়া [illegible] ভ্রম সংশোধন করিতে না পারে

এবং যত দিন পর্য্যন্ত উহার অভ্যাস দৃঢ়ীভূত না হয়, তত দিন পর্য্যন্ত উহার ভ্রম সঙ্কুল পদার্থ জ্ঞান বাক্য দ্বারা প্রকাশ করিবারও সাধ্য হয় না।

বালকের অন্যান্য অবস্থাভেদের সহিত আকৃতিরও অবস্থাভেদ হইয়া থাকে। বালক যখন নিতান্ত শৈশবাবস্থায় অনবরত শয্যাশায়ী হইয়া কাল যাপন করে, তখন তাহার শরীর অপেক্ষা মস্তকের ভার অধিক থাকে, পরে যত তাহার বয়োবৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হয়, তত তাহার মস্তক অপেক্ষা শরীরের ভার অধিক হয় এবং সে অক্লেশে আপনার মস্তকভার বহন করিয়া স্বচ্ছন্দে গমনাগমন করিতে পারে। বালক দণ্ডায়মান হইবার পূর্ব্বে উহার অঙ্গ সকলও তদুপযোগী হইয়া উঠে। ক্রমে উহার বলহীন কোমলাস্থি সকল কঠিন ও সবল হয় এবং উহার মাংসপেশী সকল দৃঢ় হইতে থাকে। এই রূপে বালকের শরীর ক্রমে ক্রমে সুসম্পন্ন হইয়া মানবের প্রকৃতাকারে পরিণত হয়। রোগাদি কোন বিশেষ ব্যতিক্রম ভিন্ন বয়োধিক বালকের মস্তক কদাপি তাহার শরীর অপেক্ষা বৃহৎ হয় না।

যে পর্য্যন্ত বালকের সকল ইন্দ্রিয় কার্য্য করিবার উপযুক্ত না হয়, সে পর্য্যন্ত তাহার অধিক কাল নিদ্রাতেই গত হয়। সবিশেষ ক্ষুৎ পিপাসা বা কোন

প্রকার যন্ত্রণা বোধ না হইলে আর তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হয় না। অল্পবয়স্ক বালকের ভোজন বিষয়েও জগদীশ্বরের আশ্চর্য্য মহিমা দেখিতে পাওয়া যায়। নিদ্রাবস্থা ব্যতীত শিশু সন্তান আর প্রায় কোন সময়েতেই আহার ভিন্ন স্থির থাকিতে পারে না কিন্তু যখন তাহার বয়োবৃদ্ধি হইয়া সকল শরীর সম্পন্ন হয়, তখন তাহার ভোজনের স্পৃহাও ক্রমে অল্প হইয়া যায়। শৈশবাবস্থায় মনুষ্যের শরীর ক্রমে বর্দ্ধিত হওয়া আবশ্যক, সুতরাং তখন সর্ব্বদা ভোজন করিতে না পারিলে কোন মতেই শরীরের উন্নতি হয় না এই জন্য জগদীশ্বর শিশু সন্তানকে সমধিক ভোজনের স্পৃহা প্রদান করিয়াছেন এবং বয়োবৃদ্ধি হইলেই উহার আর তদ্রূপ দেহ বর্দ্ধিত হইবার আবশ্যকতা থাকে না বলিয়া উহার ভোজনের স্পৃহাও ক্রমে হ্রাস হইয়া যায়। বালকের আহার বিষয়ে আর একটি চমৎকার ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যায়। যৌবনাবস্থাপেক্ষা শৈশবাবস্থায় আহারের স্পৃহা অধিক থাকে বটে কিন্তু যুবা পুরুষ অপেক্ষা ক্ষুদ্র শিশু সমধিক ক্ষুধা সহ্য করিতে পারে। নানা স্থান হইতে এ বিষয়ের ভূরি ভূরি নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। কোন কোন দুর্ভিক্ষের সময় জনক জননী ক্রমাগত অনশন করিয়া প্রাণ-ত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু তাহাদিগের দুগ্ধপোষ্য

শিশু সন্তানকে ঐ মৃত জননীর বক্ষ দেশের উপর ক্রীড়া করিতে দেখা গিয়াছে। জগদীশ্বর শিশু সন্তানকে যেমন সাংঘিক ক্ষুধা সহ্য করিয়া অনশনের হস্ত হইতে ত্রাণ পাইবার উপায় প্রদান করিয়াছেন, সেই রূপ উহাকে আর আর অনেক বিপদ অতিক্রম করিবারও শক্তি দিয়াছেন। দুগ্ধপোষ্য বালকের কোমলাঙ্গ নিরীক্ষণ করিলে আপাততঃ ইহা মনে হওয়া সম্ভব যে উহা অত্যল্প শীতস্পর্শেই কাতর হইয়া অচিরে নষ্ট হইতে পারে কিন্তু ইহা প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হইয়াছে, যে তুষারময় স্থানে জননী হিম দ্বারা প্রপীড়িত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে, অথচ তাহার ঐ শিশু সেই তুষারাবৃত হিমময় স্থানে স্বচ্ছন্দে ক্রীড়া করিতেছে। শিশু সন্তান যে কি কারণে এতাদৃশ উৎকট বিপদ হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হয়, পণ্ডিতেরা তাহার কারণানুসন্ধান করিয়াও স্থির করিয়াছেন, যুবা পুরুষাপেক্ষা বালকের শরীরস্থ শুক্র শিরা সকল [illegible] অপেক্ষায় স্থূল এবং ধমনি সকল অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও [illegible] এবং উহাদিগের শরীরে রক্তের [illegible] থাকাতে এবং সত্বর বেগে শোণিত সঞ্চালিত হওয়াতে উহারা অধিক কাল অনাহারে জীবন ধারণ করিতে পারে এবং উৎকট হিমপীড়া হইতেও পরিত্রাণ পায়। উহাদিগের শরীরস্থ শোণিতই

উহাদিগের জীবিকার কার্য্য নির্ব্বাহ করে এবং দেহকে উষ্ণ রাখে।

ইহা সকলেই বিদিত আছেন, যে শৈশবাবস্থায় মনুষ্য মাতৃস্তন্য পান করিয়াই জীবন ধারণ করে; কিন্তু উক্ত অবস্থায় উহার আপনার শরীরেও এক প্রকার দুগ্ধ থাকে। কিঞ্চিৎ বল পূর্ব্বক টিপিলে বালকের স্তন হইতেও দুগ্ধ নির্গত হইতে দেখা যায়। বালকের শরীরস্থ দুগ্ধও উহার কিয়দংশ পুষ্টি সাধন করে, কিন্তু বয়োবৃদ্ধি হইলে আর ঐ দুগ্ধ বালকের পক্ষে উপকারী হয় না বলিয়া তাহা আপনা হইতেই লুপ্ত হয়। বালকের রক্ষার নিমিত্ত পরমেশ্বর দেশ বিশেষে উপায় বিশেষ স্থাপন করিয়াও আপনার মহিমা প্রকাশ করিয়াছেন। যে সমস্ত হিমপ্রধান দেশে স্ত্রীলোকের সন্তান অল্প হয়, সে সমস্ত দেশের প্রসূতিরা দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত সন্তানকে স্তন্য পান করায় এবং অতিদীর্ঘ কাল পর্য্যন্ত তাহাদিগের স্তনেতে দুগ্ধ থাকে। কেনেডা ও গ্রীনলণ্ড প্রভৃতি স্থানে প্রসূতিদিগকে একদা তিন চারিটি সন্তানকে স্তন্য পান করাইতে দেখা গিয়াছে।

মনুষ্যের শারীরিক উন্নতির সহিতই মানসিক বৃত্তির উন্নতি হইয়া থাকে; কিন্তু শৈশবাবস্থায় ইহারও কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়;

মনুষ্য যখন মাতৃগর্ভ হইতে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়, তখন সে পার্থিব সকল বিষয়েতেই অনভিজ্ঞ থাকে, সুতরাং তখন তাহার সম্বন্ধে অনেক বিষয়ের জ্ঞান লাভ করা আবশ্যক বলিয়া জগদীশ্বর বালককে এক আশ্চর্য্য জ্ঞানতৃষ্ণা ও কৌতুহল প্রদান করেন। ইহা সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষ করা যায়, যে অতি শৈশবাবস্থায় মনুষ্যের যেমন নানা বিষয় জ্ঞাত হইবার ইচ্ছা দেখা যায় তিন চারি বৎসরের বালকের সেরূপ প্রবৃত্তি দৃষ্ট হয় না। ভূমিষ্ঠ হইবার পর বালক যে পর্য্যন্ত না চক্ষু কর্ণ ও ত্বক দ্বারা নানা প্রকার বাহ্য বিষয়ের জ্ঞান লাভ করে সে পর্য্যন্ত তাহার জ্ঞানতৃষ্ণা ও কৌতুহল নিয়তই প্রবল থাকে। ক্ষুদ্র শিশু যে স্থানে গমন করে সেই স্থানেই চঞ্চল ভাবে তত্রস্থ সকল বস্তু নিরীক্ষণ করে এবং যাহার সহিত সাক্ষাৎ হয়, তাহারই নিকট হইতে সম্মুখস্থ সকল বিষয়ের নাম জানিয়া লয়। এই রূপে শ্রবণ দর্শন ও জিজ্ঞাসা দ্বারা বালক যখন নানা প্রকার বাহ্য বিষয়ের জ্ঞান লাভ করে, তখন আর তাহার পূর্ব্ববৎ জ্ঞানতৃষ্ণা থাকে না, তখন কোন নূতন বিষয় শিক্ষা করিতে হইলে তাহার বিশেষ ক্লেশ বোধ হয়, ক্ষুদ্র বালকের কোন নূতন বিষয় শিক্ষা করিতে যেমন আহ্লাদ হয়; পঞ্চমবর্ষীয় বালকের সে প্রকার হয়

না। ষষ্ঠ সপ্তম বর্ষীয় বালককে তাড়না না করিলে আর কোন জ্ঞান শিক্ষায় রত করা যায় না। কিন্তু প্রথমাবস্থায় বালক আহ্লাদ পূর্ব্বকই অভিনব বিষয় শিক্ষা করিতে রত হয়। ভূমিষ্ঠ হইবার পর মনুষ্য প্রথম ও দ্বিতীয় বৎসরে যে পরিমাণে জ্ঞান লাভ করে, যাবজ্জীবনের মধ্যে আর সে পরিমাণে করিতে পারে না।

বালকের যত দিন পর্য্যন্ত আত্মরক্ষা ও আত্মপোষণ করিবার শক্তি না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত মনুষ্যের মানসস্থিত স্নেহ তাহার প্রতি আপনা হইতেই ধাবিত হইতে থাকে। সহায়হীন শিশু সন্তানের কষ্ট দেখিলে যে দুঃখ বোধ করে না, পৃথিবীতে প্রায় এরূপ নিষ্ঠুর লোকই দেখিতে পাওয়া যায় না। পরম শত্রু ব্যক্তির ক্ষুদ্র বালককে বিপদাপন্ন দেখিলেও দয়ার উদয় হয়। যাহার মন কোন প্রকার মোহ দ্বারা এক কালে বিকৃত হইয়া না যায় এবং যাহার অন্তঃকরণ হইতে দয়া এক কালে প্রস্থান না করে, সে কোন মতেই স্তন্যপায়ী শিশুর প্রতি শত্রুতা ব্যবহার করিতে পারে না। চুম্বুক মণি যেমন লৌহ প্রাপ্ত হইলে আপনা হইতে তাহাকে আকর্ষণ করে, দুগ্ধপোষ্য বালকের সুখকর মুখমণ্ডলও সেই রূপ নর নারীর মানসস্থিত স্নেহকে আকর্ষণ করিয়া থাকে।

যৌবনাবস্থা

শৈশবাবস্থা অতীত হইলে পর মনুষ্য যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হন এবং ঐ অবস্থাতে তাহার শরীরের ও মনের বিশেষ পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। শৈশবাবস্থাপেক্ষা যৌবনাবস্থায় মনুষ্যের হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কোন স্থূল পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয় না, কিন্তু তাহার আকারের এত বৈলক্ষণ্য হয়, যে কোন বালক কি বালিকাকে দীর্ঘ কালের পর একবারে যৌবনাবস্থায় সন্দর্শন করিলে তাহাদিগকে চিনিতে পারা কঠিন হয়। কি স্ত্রী, কি পুরুষ, যৌবন প্রাপ্ত উভয় জাতির শরীরেতেই পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে, কিন্তু ইহার মধ্যে আশ্চর্য্য এই যে ঐ পরিবর্ত্তন দ্বারা উভয় জাতিরই সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি ও উপকার সাধন হইয়া থাকে। স্ত্রী জাতির যে অঙ্গ যে রূপে পরিবর্ত্তিত হইলে তাহাকে সুঠাম ও সুরূপা দেখায়, তাহার সে অঙ্গ সেই রূপেই পরিবর্ত্তিত হয় এবং পুরুষ যাহাতে আপনার উপযুক্ত সৌন্দর্য্য ও লাবণ্য প্রাপ্ত হইতে পারে যৌবনকালে তাহারও অঙ্গ সকল সেই

প্রকারে পরিণত হয়। বাল্যাবস্থায় স্ত্রীজাতির যে সকল অঙ্গ স্থূল ও ক্ষীণ থাকাতে তাহাদিগের সৌন্দর্য্যের কিঞ্চিৎ ত্রুটি থাকে, যৌবনাবস্থায় তৎ তৎ অঙ্গের রূপভেদ হইয়া তাহাদিগের সৌন্দর্য্য পূর্ণাবস্থায় পরিণত হয়। আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই, যে যৌবনের প্রারম্ভে স্ত্রীর শরীরের অনেক স্থূল ভাগ ক্ষীণ হইতে আরম্ভ করে এবং অনেক ক্ষীণ স্থান স্থূলত্ব প্রাপ্ত হইতে থাকে, এবং ঐ রূপে উক্ত জাতির নানা অঙ্গের নানা প্রকার পরিবর্ত্তন হইয়া কেবল সৌন্দর্য্যেরই বৃদ্ধি হয়। যৌবনাবস্থায় স্ত্রীজাতির শরীর যেমন সুললিত ও সুকোমল ভাব প্রাপ্ত হয়, পুরুষের শরীর কদাপি সে প্রকার ভাব পায় না। যৌবন কালে পুরুষ জাতিকে সংসার রূপ কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়া নানা প্রকার শ্রমসাধ্য উৎকট কর্ম্ম সাধন করিতে হয় বলিয়া করুণাকর জগদীশ্বর উহাদিগের শরীরকে প্রকারান্তরে পরিণত করেন, তৎকালে উহাদিগের অস্থি সকল কঠিন হইয়া এবং মাংসপেশী সকল শক্তি হইয়া, শরীর বিলক্ষণ প্রঢ়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ হইয়া থাকে। স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতির শরীর যে যৌবনাবস্থায় উক্ত প্রকার নির্দ্দিষ্ট নিয়মে পরিবর্ত্তিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক এবং তদ্দ্বারা যে উহাদিগের বিশেষ

কল্যাণ উৎপন্ন হয় তাহাতে কোন কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। যৌবন কালে যদি পুরুষের শরীর উপযুক্ত রূপে বলিষ্ঠ ও দৃঢ়িষ্ঠ না হইয়া স্ত্রীলোকের ন্যায় কোমল ও দুর্বল হয় তাহা হইলে সে কোন প্রকার শ্রমসাধ্য কর্ম্ম সাধন করিয়া সংসারের উপযোগী হইতে পারে না এবং স্ত্রীজাতির অঙ্গও যদি কোমল ও [illegible] না হইয়া পুরুষের ন্যায় কঠিন হয়, তাহা হইলেও উক্ত জাতির কিছু মাত্র সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য থাকে না। পৃষ্ঠদেশস্থিত মেরু দণ্ডই [illegible] শরীরস্থ অস্থিময় পিঞ্জরের মূলাধার এবং [illegible] মেরুদণ্ডকে অনুপম কৌশল [illegible] সুদৃঢ় ও নমনশীল করিয়া আমাদিগের [illegible] উপযোগী করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু যৌবন কালে ঐ মেরুদণ্ডেরও কিঞ্চিৎ আকৃতি ভেদ হইলে পরেই উহা যে প্রকার দৃঢ় ও নমনশীল হইলে উৎকৃষ্ট রূপে আমাদিগের কর্ম্মোপযোগী হইতে পারে, বাল্যাবস্থায় সে প্রকার থাকে না; বাল্যাবস্থায় উহার প্রকৃতি নিতান্ত দুর্ব্বল থাকে, কিন্তু যত বয়োবৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হয় ততই উহা সবল ও কঠিন হয়। প্রাপ্ত বয়সে উক্ত মেরুদণ্ড যে প্রকার দৃঢ় হয় তাহাতে উহার নমন ক্রিয়া সম্পন্ন হওয়া কোন ক্রমেই সম্ভব বোধ হয় না, কিন্তু জগদীশ্বরের

কৌশলপ্রভাবে উহা যত প্রবৃদ্ধ হইতে থাকে ততই বলশীল হয়।

ভূমণ্ডলে যে সমস্ত স্ত্রী পুরুষ জন্ম গ্রহণ করে যৌবন কালে তাহারা সকলেই এক প্রকার পরিবর্ত্তন প্রাপ্ত হয় না। কোন দেশের মনুষ্য বিশেষ বলিষ্ঠ হয়, কোন দেশের মনুষ্য তাদৃশ বলবান্ হয় না; কোন দেশের লোককে অতিশয় অধ্যবসায়ী বীর্য্যবান্ ও কর্ম্মক্ষম দেখা যায়, কোন দেশীয় লোকের ঐ সমস্ত বিষয়ে কিঞ্চিৎ ত্রুটিও থাকে। যৌবন কালে এক দেশের মনুষ্য অধিক দীর্ঘ হয় এবং অপর দেশীয় লোককে সে প্রকার দীর্ঘ দেখা যায় না। এক দেশের স্ত্রীলোকদিগের গ্রীবা উন্নত, নেত্র উজ্জ্বল বর্ণ ও কপোল লোহিত বর্ণ হয় এবং অন্য দেশীয় স্ত্রীজাতির ঐ অবস্থায় হ্রস্ব গ্রীবা, কৃষ্ণ বর্ণ চক্ষু ও অলোহিত মুখশ্রী প্রাপ্ত হয়। যৌবন কালে কোন দেশীয় স্ত্রী পুরুষের নাসিকা দীর্ঘ ও উন্নত হয় এবং কোন দেশের স্ত্রী পুরুষের নাসিকা সে প্রকার না হইয়া ঈষৎ হ্রস্ব ও অবনত হইয়া থাকে। ভ্রমণকারী বহুদর্শী পণ্ডিত ব্যক্তিরা নির্দেশ করিয়াছেন, যে ঐ রূপে দেশভেদে স্ত্রী পুরুষদিগের আকৃতি ও প্রকৃতির অনেক বৈলক্ষণ্য ঘটে, কিন্তু উক্ত প্রকার বৈলক্ষণ্য ঘটন জন্য মনুষ্য জাতির কিছু মাত্র ক্লেশ

উৎপন্ন হয় না. দেশ ভেদ যেমন স্ত্রী পুরুষের আকার প্রকারের প্রভেদ দৃষ্ট হয়, সেই রূপ সৌন্দর্য্য বিষয়ক রুচিরও অনেক ইতর বিশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। যৌবনাবস্থায় যে দেশীয় লোকের যে প্রকার আকার হইয়া উঠে, তদ্দেশীয় মনুষ্যের চক্ষে সেই আকারই সুন্দর ও সুদৃশ্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়, সুতরাং দেশ ভেদে স্ত্রী পুরুষের আকৃতি ভেদ হওয়াতেও কোন দেশীয় লোকেরই নেত্র পীড়া জন্মিতে পায় না। যে সমস্ত দেশে মনুষ্য সৈনিক বীর্য্যবান্ সাহসী ও বলবান্ না হইলে কোন ক্রমেই জীবন ধারণ করিতে পারে না, যৌবনাবস্থাতে সেই সকল দেশীয় লোকের মনেতে আপনা হইতে সাহস ও বীর্য্যের আবির্ভাব হয় এবং শরীরেতে ও সমধিক বল উৎপন্ন হয়। পৃথিবীর উষ্ণ কটিবন্ধস্থিত আফ্রিকা দেশীয় মনুষ্যদিগকে সতত প্রখর সূর্য্য উত্তাপ সহ্য করিতে হয় বলিয়া তাহাদিগের শোণিত গাঢ় ও চর্ম্ম স্থূল হয়, কিন্তু ঐ সকল মনুষ্যের স্থূল চর্ম্ম ও গাঢ় শোণিত না হইয়া যদি তাহাদিগের শরীর সূক্ষ্ম ত্বকে আচ্ছাদিত হইত এবং শোণিতও তরল হইত তাহা হইলে তদ্দ্বারা তাহারা বিশেষ ক্লেশই প্রাপ্ত হইত। যাহারা আরব দেশের বা আফ্রিকার কি অন্যান্য স্থানের

মরুক্ষেত্র দিয়া সর্ব্বদা গতায়াত করিয়া থাকে ক্রমে তাহাদিগের ক্ষুৎ পিপাসা সহ্য করিবার শক্তি অধিক হয়। অরণ্যবাসী বন্য মনুষ্যদিগের যত বয়ঃক্রম বৃদ্ধি হয়, ততই তাহাদিগের নানাবিধ নিবিড় অরণ্যে বিচরণ করিয়া মৃগয়া করিবার সাহস বৃদ্ধি হয়। সাগরতীরস্থ বা সমুদ্রাদি পরিবেষ্টিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপবাসী মনুষ্যগণ আপনাদিগের বয়োবৃদ্ধি সহকারে সমুদ্র যাত্রা করিতে এবং সমুদ্র জলে সন্তরণ ও অবতরণ করিয়া মৎস্যাদি বহু প্রকার পণ্য দ্রব্য লাভ করিতে অধিক উৎসাহান্বিত হয়। এই রূপে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের মনুষ্য যৌবনাবস্থাতে স্বীয় স্বীয় কর্ম্মোপযোগী ভিন্ন ভিন্ন প্রকার শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়।

যৌবনাবস্থায় আমাদিগের মনেতে অনেক প্রকার প্রয়োজনোপযোগী অভিনব ভাবের আবির্ভাব হয় এবং অনেক প্রকার অনুপযোগী ভাব মন হইতে তিরোহিত হইয়া থাকে। যে ক্রীড়াসক্তি শৈশবাবস্থার একমাত্র প্রিয়তর ও প্রবলতর বিষয়, যে ক্রীড়ার জন্য বালক প্রিয়তম জননীর ক্রোড় পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়া কাল যাপন করে, যৌবনের প্রারম্ভে সে ইচ্ছাও আপনা হইতে দিনে দিনে অন্তর্হিত হইয়া যায়। বালককে ক্রীড়ার্থ দ্রব্য প্রদান করিলে এবং সর্ব্বদা

উৎকৃষ্ট অট্টালিকাতে বাস করাইলে তাহার মনে যাদৃশ আহ্লাদ না জন্মে, অতি যৎসামান্য ক্রীড়া পদার্থ প্রদান করিলে অথবা ক্রীড়া সময়ে আপন সহচর বালক বালিকা সহিত বাস করিতে দিলে তাহার মনে তাদৃশ আহ্লাদের উদয় হয়. কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে অনন্তর সেই প্রাণময় প্রিয়তম ক্রীড়াবস্তু তাহার অবহেলা হয়। শৈশবাবস্থায় আপনার গ্রাম ভবন ও পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনী প্রভৃতিকে পরিত্যাগ করিয়া স্থানা-ন্তর গমন করিতে মনোমধ্যে যাদৃশ ক্লেশ জন্মে এবং অপরিচিত দূর দেশ যাত্রা করিতে যে প্রকার ত্রাস উপস্থিত হয়, যৌবন অবস্থায় সে রূপ হয় না। যৌবন কালের প্রারম্ভ সময়ে মনুষ্যের মানসক্ষেত্রে পর্য্যটনস্পৃহা, ও অর্থ লালসা প্রভৃতি নানা প্রকার প্রবৃত্তি উদ্বেলিত হইয়া উঠে এবং তন্নিমিত্ত যুবা পুরুষ আত্মীয় স্বজন প্রতিবন্ধককে তুচ্ছ করিয়া বহুদূর দেশ পর্য্যটন পূর্ব্বক জ্ঞান ধন প্রভৃতি নানা বিষয় উপার্জ্জন করিয়া আপনার প্রয়োজন সিদ্ধ করে। যোড়শবর্ষ যুবা পুরুষ যদি বালকের ন্যায় স্বদেশ ও স্বজন বর্গকে পরি-ত্যাগ করিয়া দূর দেশ যাত্রা করিতে শঙ্কিত ও ক্ষুব্ধ হইত, তাহা হইলে আর পৃথিবী কখন এতা-দৃশ শ্রীসম্পন্ন হইতে পারিত না এবং মনুষ্যকুল-

ও কখন ক্রমোন্নতি লাভে সক্ষম হইত না। শৈশবাবস্থায় যে সমস্ত ভাব কখন স্বপ্নেও আলোচিত করা যায় না, জগদীশ্বরের উদ্দেশ্য সিদ্ধ নিমিত্ত যৌবন কালে সেই সমস্ত অননুভূত ও অপূর্ব্ব ভাব আসিয়া সর্ব্বদাই মনোমধ্যে উদিত হয়। কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে যে সাংসারিক বহু প্রকার কর্ম্ম নিস্পাদন করিবার জন্যে যৌবনাবস্থায় যেমন শারীরিক বল বৃদ্ধি হয়, সেই রূপ তাহার উপযোগী অনেক আন্তরিক ভাবেরও প্রাদুর্ভাব হয়। বালকের অপেক্ষা যুবা পুরুষের অধ্যবসায় ও তিতিক্ষা প্রভৃতি অন্যান্য বৃত্তি শত গুণে বলবতী হয় এবং যুবা ব্যক্তি ঐ সমস্ত উত্তেজিত বৃত্তি সম্পন্ন হইয়া নানা সময় নানা বিপদ অতিক্রম ও নানা কষ্ট সহ্য করিতে সক্ষম হয়। বাল্য কালে যে বাৎসল্য ভাব ও স্নেহ ভাবের কিছু মাত্র অনুভবও থাকে না, কালান্তরে মনুষ্য একেবারে সেই ভাবে মুগ্ধ হইয়া যায়। মনুষ্য যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া পুত্র কন্যা প্রভৃতি পরিবারে বেষ্টিত হয় তখন তাহার মনের ভাব আর এক প্রকার হইয়া উঠে, তখন তাহার আপনার শরীরের প্রতি যত্ন থাকে না এবং আপনার শয়ন ভোজনেরও কোন নিয়ম থাকে না, তখন তাহার [illegible]ন্তানদিগে

সুখেতেই সুখ বোধ হয় এবং দুঃখেতে দুঃখের উদয় হয়। তখন সে ব্যক্তি যে স্থলে ও যে অবস্থায় অবস্থান করে, তাহার মনে সর্ব্বদাই কেবল সেই সমস্ত স্নেহাস্পদ পুত্রাদির প্রতিমূর্ত্তি জাগরূক থাকে। সন্তান হইলে পর যে মনুষ্য কি প্রকার অভেদ্য স্নেহ পাশে বদ্ধ হয়, তাহা প্রায় সকল পিতা মাতারই বিদিত আছে। প্রথম বয়সে যে ব্যক্তি অত্যল্পমাত্র ক্লেশে ক্লিষ্ট হয় এবং কোন রূপেই দুঃখের ভার সহ্য করিতে পারে না, সন্তান হইলে পর তাহাদিগের লালন পালন করণার্থে সেই ব্যক্তিকে আহ্লাদ পূর্ব্বক অসামান্য ক্লেশ স্বীকার করিতে দেখা যায় সন্তানাদির প্রতিপালন জন্য সে উৎকট উৎকট ক্লেশকেও সুখ জ্ঞান করে।

বয়ঃপ্রাপ্ত স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতির মনে এক প্রকার ভাবের আবির্ভাব হয় না; যাহার যে বিষয় সাধন করা বিশেষ আবশ্যক, তাহার মনে সেই প্রকার ভাব প্রবল হইতে থাকে। বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষের মনে যেমন শৌর্য্য বীর্য্য ও সাহস প্রভৃতি কঠোর ভাবের প্রাদুর্ভাব হয়, স্ত্রী জাতির মনে সে প্রকার হয় না। স্ত্রী জাতিদিগের যত বয়োবৃদ্ধি হইতে থাকে, ততই তাহাদিগের মনেতে স্নেহ দয়া ক্ষমা প্রভৃতি কোমল ভাবের প্রাবল্য হইতে থাকে এবং তাহাদিগকে সতত সাংসারিক কর্ম্ম নিষ্পা-

দনে ইচ্ছুক হইতে দেখা যায়। বয়ঃক্রম ভেদে স্ত্রী ও পুরুষ উভয় জাতির মনে যে কি প্রকার ভিন্ন ভিন্ন প্রবৃত্তির প্রাদুর্ভাব হয়, তাহা স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতির আচার ব্যবহার রীতি নীতি ও ক্রীড়া কৌতুক প্রভৃতির বিষয় আলোচনা করিয়া দেখিলেই বিলক্ষণ জানা যাইতে পারে। মনুষ্য জন্মের মধ্যে যৌবনাবস্থাই শ্রেষ্ঠ অবস্থা, কবি গণ উক্ত অবস্থাকে জীবনের সারাংশ বলিয়া বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। যৌবনাবস্থা আমাদিগের ধন জ্ঞান ধর্ম্মাদি সর্ব্বার্থ সাধন করিবার মুখ্য সময় ঐ অবস্থায় মনুষ্যের বুদ্ধিবৃত্তি সকল যেমন প্রস্ফু-টিত ও উত্তেজিত হয়, সেইরূপ ধর্ম্ম প্রবৃত্তি সকল ও সবলা হইয়া উঠে। যৌবন কালই মানব জা-তির সকল ক্ষমতা সকল শক্তি প্রকাশ করিবার মুখ্যকাল; মনুষ্য যে সমস্ত অসাধারণ কর্ম্ম সম্পা-দন করিয়া অবনিমণ্ডলে আপনার কীর্ত্তিকে চির-স্থায়ী করে, যে সমস্ত বুদ্ধি কৌশল প্রকাশ করিয়া কখন কখন দেববৎ প্রতীয়মান হয় এবং যাহার দ্বারা পৃথিবীর সমস্ত জীব জন্তুর উপর আধিপত্য করিতে পারে, সে সমস্ত ব্যাপারই যৌবন কালে সম্পন্ন হইয়া থাকে। অনেক কবি যৌবনকেই জীবন বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, ফলতঃ জগদীশ্বর যদি আমাদিগকে যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হইবার অধিকারী

না করিয়া বাল্য কালমাত্র আমাদিগের জীবনের সীমা করিয়া দিতেন, তাহা হইলে আমরা মনুষ্য নামের কিছু মাত্র গৌরব বৃদ্ধি করিতে পারিতাম না।

গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী।

তৃতীয় অধ্যায়।

গুরুবন্দনা।

গুরুদেব দয়া কর দীন হীন জনে।
মম মতি ভকতি প্রণতি ও চরণে॥
গুরু তুমি জগন্নাথ জগতের গুরু।
তব দয়া তুল্য নহে কোটি কল্প তরু॥
সরোবর শরীর সরোজশিশু জ্ঞান।
ফুটে যদি তোমার চরণ করে ধ্যান॥
গুণের অতীত গুণ বর্ণিতে কে পারে।
বুদ্ধি সাধ্য নহে সে বর্ণনে বর্ণ হারে॥
ঠেকিয়াছি ঘোর দায় করি নিবেদন।
হইয়াছে এ শরীরে অপূর্ব্ব গ্রহণ॥
জ্ঞান চন্দ্র অজ্ঞান রাহুতে গিলিয়াছে।
স্থিতি নয় নয় দণ্ড সদা কাল আছে॥
একা নহে রাহু সঙ্গে সেনা ছয় জনা।
ছাড়ে পাছে দণ্ডে দণ্ডে দেয় কুমন্ত্রণা॥

মন যে আমার সে মনের মত নয়।
রাহু অনুগামী সে রাহুর মত কয়॥
কুপথে কুসঙ্গে মন করিছে বিহার।
আমি যদি ভাল ভাব মন ভাবে আর॥
হিংসা দ্বেষ মুক্তি পথ করিছে বারণ।
ভাবিতে না দেয় প্রভু তোমার চরণ॥
দয়া কর দয়াময় শ্রীনাথ আমারে।
মুক্ত কর এই দায় এ পাপ সংসারে॥
দাসের দুর্গতি হর দূর কর খেদ।
ইঙ্গিতে অসিতে প্রভু কর রাহু ছেদ॥
রাহু গেলে জ্ঞানোদয় হইবে যখন।
অনায়াসে পলাইবে রিপু ছয় জন॥
জন্মে জন্মে তোমার দাসের আমি দাস।
এই ভিক্ষা চাহি পূর্ণ কর অভিলাষ॥

উপাসনা হেতু ব্রহ্মের রূপ কল্পনা।

নিরঞ্জন নিরাকার এক ব্রহ্ম নাহি আর
উপাসনা হেতু অবতার।
ভেদ জ্ঞানে নাহি মুক্তি মিছা নয় শিব উক্তি
কে জানে কেমন মায়া যার॥

প্রকৃতি পুরুষ কায়   চনক দলের প্রায়

মূল শক্তি ইচ্ছায় সৃজন।

আপনার তিন গুণে   প্রসবিলা তিন জন

বিধি বিষ্ণু দেব ত্রিলোচন ॥

বসন্ত বর্ণন।

মলয় পর্ব্বত হৈতে আইল পবন।

শীতল সুগন্ধ মন্দ বহে সমীরণ ॥

মধুকরী মধুকর আমোদে মাতিয়া।

মধু খায় ফুলে ফুলে বেড়ায় নাচিয়া ॥

ময়ূরী ময়ূর নাচে দেখি কাদম্বিনী।

গান করে কুহুস্বরে পিকসীমন্তিনী ॥

ডাহুক ডাহুকী সঙ্গে জলেতে খেলায়।

খঞ্জন খঞ্জনী তাহে নাচিয়া বেড়ায় ॥

মরাল মরালবধূ খেলে সরোবরে।

কলরব নানা জলে কৌতুকে বিহরে ॥

পৃথিবী পর্ব্বতে যত পুষ্পবন ছিল।

বসন্তের আগমনে প্রফুল্ল হইল ॥

পুষ্প গন্ধ নিয়া বায়ু করিল ভ্রমণ।

বিরহি জনার মন করে উচাটন ॥

নীরস আছিল তরু সরস লইল।
ভগবতী আগমনে সুফল ফলিল॥
সকল হয়েছে পূর্ণ জল সুমধুর।
দয়া করি দুগ্ধ গাভি দিতেছে প্রচুর॥

কলি বর্ণন।

তারিণী বলেন পৃথিবীতে পাপচয়।
আমার গমন করা কিরূপেতে হয়॥
কলিকালে মানব করিবে পাপ কত।
লোভেতে করিবে লোক পরকাল হত॥
মদনে মাতিয়া লোক গুরুকে নিন্দিবে।
দেব দ্বিজ গুরু লোক কেহ না মানিবে॥
ইহাতে নরক আর তোমার লিখন।
অনুচিত সে পাপির মুখ দরশন॥
পিতা মাতা সেবা না করিবে পাপ যত।
কটু কবে হইয়া ভার্য্যার অনুগত॥
এক ব্রহ্ম উপাসনা হেতু অবতার।
করিবে পাষণ্ড লোক ভেদ দেবতার॥
কন্যা পুত্র বিক্রি হবে পশু পক্ষি মত।
করিবে পাতক হবে সে দেশ পতিত॥

গৃহির উচিত সেবা করিবে অতিথ।
হইবে অধম লোক তাহাতে বঞ্চিত॥
করিবে অতিথি সেবা চতুর্বর্গ পায়;
না করিলে পাপ দিয়া পুণ্য নিয়ে যায়॥
পাগল হইয়া পতি ছাড়িবেক সতী।
অসতীর অনুগত হবে দুষ্টমতি॥
গুরু আজ্ঞা অবজ্ঞা করিবে মূঢ় নর।
পাইয়া পরম মন্ত্র ছাড়িবে পামর॥
কুহকে কামিনী ত্যজি পাপে হবে রাজি।
বুঝিবে না পাপি লোক সেই ভোজ বাজি॥
স্বামির সেবায় নারী হইবে বিহীনা।
ছাড়িয়া পতির সেবা হবে পরাধীনা॥
স্বামির শাপেতে নষ্ট হবে অহঙ্কার।
দুর্গতি না যাবে বাছা কভু কুলটার।
পতিব্রতা সতীর পরশে হবে সুখ।
পাপীয়সী পরশিলে পাব বড় দুখ॥
ভেদাভেদ ভেদ ক্রমে হবে প্রবঞ্চনা।
পরামর্শ জিজ্ঞাসিলে দিবে কুমন্ত্রণা॥
পরদারা হরণে না জাতি ভেদ রবে।

ক্ষুধায় তৃষ্ণায় যদি অন্ন জল চায়।
দয়া না করিবে দুষ্ট প্রাণ যদি যায়॥
সাধু নিন্দা নীচ কর্ম্ম করিবে নির্ব্বোধ।
বিনি অপরাধে গুরু করিবেন ক্রোধ॥
আত্মীয় স্বজনে আগে করিয়া আশ্বাস।
প্রবঞ্চনা করিয়া করিবে সর্ব্বনাশ॥
থাকি আমি সর্ব্বদা জীবের ঘটে ঘটে।
স্ত্রী লোক আমার ছায়া জান তুমি বটে॥
নারী অপরাধে দণ্ড নহেত বিধান।
না বুঝিয়া আমারে করিবে অপমান॥
কুমতি করিবে পাপী হয়ে দস্যু চোর।
না বুঝে ভোগিবে পাপী রোগ আদি ঘোর॥
আর কি বলিব বিধি শেষে এই হবে।
আমারে ছুইয়া লোক মিথ্যা কথা হবে।
ভাবিয়া এসব পাপ মনে হয় ভয়।
ভূতলে গমন করা পরামর্শ নয়॥

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।

উপক্রমণিকা।

বিশ্বকার্য্যের কৌশলানুশীলন পূর্ব্বক বিশ্বপতির মহিমা আলোচনা করা যে নিতান্ত কর্ত্তব্য এবং নিতান্ত প্রমোদকর, তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য বাহুল্য প্রমাণের প্রয়োজন নাই। যে হেতু প্রায় সমস্ত বুদ্ধিজীবি লোকেই তাহা স্বীকার করিয়া থাকে। করুণানিধান বিশ্বপিতা মানব জাতিকে বিভিন্ন প্রকার সুখ ভোগের অধিকারী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু মনুষ্য তাঁহার মধুর তত্ত্বের স্বাদ গ্রহণ করিয়া যে প্রকার সুখী হয় আর কোন বিষয়েতেই তদ্রূপ হইতে পারে না। সামান্য শারীরিক সুখাপেক্ষা সূক্ষ্ম মানসিক সুখ যে অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ তাহাতে আর সংশয় কি? কিন্তু কেবল মানসিক সুখ সম্ভোগ অপেক্ষা সরস পরমার্থ তত্ত্বের অনুশীলন করা যে কত সুখজনক তাহা বাক্য দ্বারা ব্যক্ত করাই কঠিন। যখন কোন মহানুভাব তত্ত্বদর্শী স্থির চিত্তে কোন প্রকার নৈসর্গিক ঘটনার অলক্ষ্য কার্য্য কারণ সম্বন্ধ বিচার করিয়া জ্ঞাননেত্রে তদীয়

ক্ষ প্রত্যক্ষ করেন, তখন তাঁহার মনোমধ্যে যে প্রকার অলোকসামান্য প্রগাঢ়তর আনন্দের উদয় হয়, কোন প্রকার শারীরিক সুখই মনুষ্যকে সে প্রকার আনন্দ প্রদান করিতে পারে না। কিন্তু কোন জ্ঞানতৎপর অথচ পরমার্থ রস রসিক ব্যক্তি অপূর্ব্ব বিশ্বরচনার নিগূঢ় তত্ত্বানুশীলন করত তন্মধ্যে বিশ্বরচয়িতার জ্ঞান শক্তি ও করুণাদি প্রত্যক্ষ প্রতীতি করিলে যে প্রকার অনির্ব্বচনীয় সুখ অনুভব করেন, তাহার সহিত কি শারীরিক কি মানসিক আর কোন প্রকার সুখেরই তুলনা হইতে পারে না। ফলতঃ সংসার মধ্যে মনুষ্য জাতির মহত্ত্ব লাভের যে সকল পথ আছে, তন্মধ্যে পরমার্থরসানুশীলন করাই সর্ব্ব প্রধান। যে ব্যক্তি অবনীতলে অবতীর্ণ হইয়া বিশ্বকৌশল পর্য্যালোচনা করিয়া বিশ্বকর্ত্তার মহিমা কলাপ প্রত্যক্ষ না করিলে, এক প্রকার তাহার জন্মই বৃথা। যে মনুষ্য কোন নিশ্চিন্ত সময়ে ব্রহ্মাণ্ডের কার্য্য কারণ ভাব বিচার করিয়া ব্রহ্মাণ্ড পতির অপার মহিমা সমুদ্রে স্বীয় মনকে মগ্ন না করিয়াছে; বুঝি যে কি পর্য্যন্ত মহত্ত্ব লাভের উপায় ও কত দূর প-

পারে নাই। যদি কার্য্য দ্বারা অবলম্বন করিয়া মূল কারণ নির্দ্ধারণ করা জ্ঞান চরিতার্থ করিবার প্রধান পথ বলিয়া গণ্য হয়, যদি কোন মঙ্গল সঙ্কল্প পুরুষের দুঃশীলাভিপ্রায় জ্ঞাত হওয়া সুখের কারণ বলিয়া সিদ্ধ হয় এবং যদি উচ্চতর ও সূক্ষ্মতর বিষয়ের তত্ত্বাবধারণ করা মহত্ত্বের মূল বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তাহা হইলে বিশ্বকৌশল বিচার পূর্ব্বক ঈশ্বরের মহিমা চিন্তন করা যে নিতান্ত কর্ত্তব্য তাহাতে আর কিঞ্চিন্মাত্র সংশয় হইতে পারে না।

মনুষ্য যে পরিমাণে জগৎ কৌশল পর্য্যবেক্ষণ করে, সেই পরিমাণে জগৎ প্রসবিতা জগদীশ্বরকেও করতলন্যস্ত আমলকবৎ প্রত্যক্ষ করিতে থাকে, কিন্তু কেবল জগদীশ্বরের অস্তিত্বমাত্র প্রতিপন্ন হওয়া এবং তাঁহাতে আমাদিগের প্রত্যয় দৃঢ়ীভূত হওয়া তাঁহার মহিমা চিন্তনের একটিমাত্র ফল নহে, যে সকল লোক তাঁহার অস্তিত্ব নিজ শরীরের অস্তিত্বের ন্যায় প্রত্যয় করে এবং তাঁহাকে সর্ব্ব নিয়ন্তৃ ও সর্ব্বাধিপ রূপে বিশ্বাস করিয়া থাকে তাঁহার মহিমা চিন্তন দ্বারা সে সমস্ত লোকেরও প্রচুর ফল লাভ হইতে পারে। কোন কীর্ত্তিকুশল পুরুষের কেবল নাম শ্রবণ করিলে তা-

উপক্রমণিকা।

যাঁহার প্রতি যত না শ্রদ্ধা হয়, পুনঃ পুনঃ তাঁহার কীর্ত্তি ঘোষণা ও শক্তি সন্দর্শন করিলে তাঁহার প্রতি বিলক্ষণ শ্রদ্ধা জন্মে সন্দেহ নাই। ঈশ্বরপরায়ণ লোকে যত তাঁহার মহিমা আলোচনা করে, ততই তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি করিতে থাকে। অতএব কেবল অনীশ্বরবাদিদিগের হৃদয়ে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত করা মাত্র পশ্চাল্লিখিত গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে, যাহাতে ঈশ্বরপরায়ণ লোক তাঁহার অনুপম মহিমা অনুশীলন করিয়া তাঁহাতে ভক্তি ও প্রীতি উন্নত করিতে পারে, উহাও এই গ্রন্থের প্রধান উদ্দেশ্য। যে প্রকার পদ্ধতি অনুসারে জগদীশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন ও মাহাত্ম্য কীর্ত্তন বিষয়ক গুরুতর প্রস্তাব সম্পন্ন করিতে হয়, এবং তাহা সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার জন্য যে ক্ষমতার আবশ্যক করে, যদিও পশ্চাল্লিখিত গ্রন্থ তদ্রূপ পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হয় নাই এবং যদিও আমার তাহা সুসম্পন্ন করিবার শক্তিরও সম্পূর্ণ অভাব থাকে, তথাপি এই অসম্পন্ন গ্রন্থান্তর্গত প্রস্তাব গুলি পাঠ করিলে লোকের মনে ঈশ্বর প্রীতি ও ঈশ্বর ভক্তি বৃদ্ধি ভিন্ন হ্রাস হইবে না, এবং ঈশ্বর প্রত্যয় দৃঢ়ীভূত হওন ব্যতীত শিথিল হইবারও কারণ দৃষ্ট হয় না।

বিশেষতঃ যে সমস্ত পুরুষ জগদীশ্বরের প্রেম পীযূষ পান করিয়া আপনাদিগের ধর্ম্ম তৃষ্ণা শান্তি করিতে ইচ্ছা করেন, এতাদৃশ গ্রন্থ পাঠ করা তাঁহাদিগের পক্ষে নিতান্ত কর্ত্তব্য ও নিতান্ত সুখজনক বলিয়া বোধ হইতেছে। সুন্দর বস্তুর প্রতি প্রীতি করিতে স্বতই মনের প্রবৃত্তি হয়, তাহাতে অপর কোন অনুরোধের আবশ্যক করে না। যে ভাগ্যবান পুরুষ স্বকীয় সাধন বলে জগদীশ্বরের অনুপম সৌন্দর্য্য সর্ব্বদা আপন জ্ঞান নেত্রে বর্ত্তমান রাখিতে পারে, পৃথিবীর কোন বিষয়েতে কি আর তাহার মনকে আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়? অতএব ঈশ্বরের মহিমা প্রতিপাদক এতাদৃশ গ্রন্থ আলোচনা দ্বারা সর্ব্বদা জ্ঞান নেত্রে তাঁহার মনোহর বিশ্বরূপ সন্দর্শন করা ঈশ্বরানুরাগির পক্ষে নিতান্ত বিধেয়।

ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় পদার্থই জগদীশ্বরের অনন্ত মহিমায় পূর্ণ রহিয়াছে এবং যাবতীয় বিদ্যাই তাঁহার অসীম মাহাত্ম্য প্রকাশ করিতেছে। কাল সহকারে যে পরিমাণে মনুষ্যের জ্ঞাননেত্র প্রস্ফুটিত হইতেছে, ততই মনুষ্য লোকে তাঁহার তত্ত্ব ব্যক্ত হইতেছে। আমরা যে কোন

বিদ্যার অনুশীলন করিয়া যে কোন বিষয়ের তত্ত্ব লাভ করি তাহাতেই তাঁহার মহিমা দেখিতে পাই। আমরা যদি জ্যোতির্ব্বিদ্যানুশীলন করিয়া গ্রহ নক্ষত্রাদির স্থিতি গতি ও আকৃতির বিষয় অবগত হই, তাহাতেও তাঁহার অনন্ত মহিমা প্রত্যক্ষ করি এবং যদি উদ্ভিদ ও প্রাণিবিদ্যাদি পর্য্যালোচনা করিয়া তৎ তৎ বিষয়ক জ্ঞান লাভ করি, তাহা হইলে তন্মধ্যেও তাঁহার অপার করুণা ও অনন্ত জ্ঞানের স্পষ্টসাক্ষি দেখিতে পাই। বস্তুতঃ সমগ্র পদার্থ ও সমুদাই পদার্থ বিদ্যা একত্রিত হইয়া কেবল তাঁহারই মাহাত্ম্য বর্ণন করিতেছে। এই জগতের এক সীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত তাঁহারই মহিমা রবে পরিপূর্ণ রহিয়াছে, এবং এই অসীম ব্রহ্মাণ্ড ও অনন্ত লোক নিত্যকাল পর্য্যন্ত তাঁহারই অমৃত গুণ গান করিবে। মনুষ্য যদি কোটি কোটি কল্প তাঁহার যশঃ ঘোষণা করে, তথাপি তাঁহার অপার মহিমা সিন্ধুর এক বিন্দুমাত্রেরও শেষ হয় না। " শফরী কি সন্তরণ করিয়া সিন্ধুর সীমা নিরুপণ করিতে পারে? না পতঙ্গ কখন পত্র পরিচালন করিয়া নভোমণ্ডল প্রদক্ষিণ করিতে পারে? তবে আমরা এই ধূলিময়

পিঞ্জরবদ্ধ কীট হইয়া কিরূপে তোমার মহিমা কীর্ত্তন করিব" ? "যদি সূর্য্যের কিরণ এক একটি করিয়া গণনা করা সম্ভব হয়, যদি ভূলোক হইতে দ্যুলোক পর্য্যন্ত সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত যাবতীয় পদার্থের অগণ্য পরমাণুপুঞ্জও গণনা করা সাধ্য হয়, তথাপি তোমার মহিমা নিরূপণ করা সম্ভব হইতে পারে না"। কিন্তু অবশ্য কর্ত্তব্য সম্যক সাধন করা যদি নিতান্ত অসাধ্যও হয়; তথাপি তাহার কিয়দংশ সাধনে হানি নাই, প্রত্যুত তদ্দ্বারা বিশেষ মঙ্গলোদ্ভবনেরই সম্ভাবনা। কল্যাণকর কার্য্য অসাধ্য বোধ হইলেও তাহাতে নিশ্চেষ্ট হওয়া অবিধেয়। এই বিশ্বাসে আমি কতকগুলি স্থূল স্থূল বিষয় অবলম্বন করিয়া এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ দ্বারা সাধারণ লোকের মনে বিশ্বকারণ বিশ্বেশ্বরের মহিমা প্রতিভাত করিতে চেষ্টা পাইয়াছি। কিন্তু কি পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহা কিছুই জানি না।

বিশ্বকার্য্যের মধ্যে বিশ্বেশ্বরের জ্ঞান, শক্তি ও করুণা প্রতিপন্ন করিতে এই গ্রন্থ মধ্যে নানা প্রকার বিজ্ঞান শাস্ত্রের যে সকল কথা উল্লেখ করিতে হইয়াছে, তৎসমুদায় যে সম্পূর্ণ রূপে ভ্রম শূন্য

হইয়াছে, আমার এমন বিশ্বাস নাই। কিন্তু যদি-ও তত্তাবৎ অভ্রান্ত না হইয়া থাকে, তথাপি তাহাতে জগদীশ্বরের মহিমার কিছুমাত্র হানি হই-বার সম্ভাবনা নাই। কালক্রমে মানব জাতির বুদ্ধিকলিকা যত প্রস্ফুটিত হইতেছে, ততই বি-জ্ঞান শাস্ত্রেরও উন্নতি হইতেছে। শত বৎসর পূর্ব্বে মনুষ্য যে সকল বিষয়কে অভ্রান্ত ও অপরি-বর্ত্তনীয় বলিয়া বোধ করিয়াছে, এক্ষণে তাহাতে স-হস্র প্রকার ভ্রম দর্শন করিতেছে এবং তাহাকে বি-শেষ রূপে পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইতেছে, কিন্তু তৎ তৎ বিষয় দ্বারা ঈশ্বরের মহিমা চিরদিনই সমান রূপেই প্রকাশ পাইয়া আসিতেছে। যদি-ও মনুষ্য কৃত কোন কোন বিজ্ঞান শাস্ত্রাদি স-মূলে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, তথাপি তৎ তৎ শাস্ত্র প্রতিপাদ্য বিষয় দ্বারা ঈশ্বরের মহিমা ব্যক্ত হইতে কখনই ত্রুটি হইবে না। বর্ত্তমান শারীর স্থান বিদ্যাবিৎ পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে জগ-দীশ্বর ২৫২ খণ্ড অস্থির সংযোগে এবং ৫২৭ টা মাংসপেশী সহকারে এতাদৃশ সুসৌষ্ঠব মনুষ্য দেহ রচনা করিয়াছেন, তিনি যে কএক খণ্ড অস্থি ও যে কএকটা মাংসপেশী দ্বারা মানব কলেবর নির্ম্মাণ

করিয়াছেন, তদ্দ্বারা আমাদিগের সমস্ত প্রয়োজন সিদ্ধ হইতেছে এবং উৎকৃষ্ট সৌন্দর্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। উত্তর কালে যদি এই মতের খণ্ডন হইয়া কোন অভিনব মতের সংস্থান হয় এবং তদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হয়, যে মানব দেহ ২৫২ খণ্ড অস্থি ও ৫২৭ টা মাংসপেশী সহকারে রচিত না হইয়া তদতিরিক্ত বা তন্ন্যূন সংখ্যক অস্থি ও মাংসপেশী সহকারে নির্ম্মিত হইয়াছে, তথাপি তদ্দ্বারা ঈশ্বরের মহিমা অবশ্যই প্রকাশ পাইবে। কারণ জগদীশ্বর যে কএক খণ্ড অস্থি ও যে কএকটা মাংসপেশী দ্বারা মানব দেহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহার একটিরও অভাব হইলে উপযুক্ত রূপে মনুষ্যের প্রয়োজন সাধন ও সৌন্দর্য্য সম্পাদন হইতে পারে না। মনুষ্য শরীরে তত্তাবৎ খণ্ড অস্থি ও মাংস পেশী বর্ত্তমান থাকা নিতান্ত আবশ্যক। অতএব বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে, যে মনুষ্যকৃত বিজ্ঞান শাস্ত্রের ভ্রম দ্বারা জগদীশ্বরের মহিমার কিছুমাত্র হানি হইবার সম্ভাবনা নাই। বিজ্ঞান শাস্ত্রদর্শী পণ্ডিত গণ এই গ্রন্থের মধ্যে যদি কোন স্থলে ভ্রম সন্দর্শন করেন, তবে তাহা এক কালে উপেক্ষা না করিয়া সে স্থলে স্বীয় মানসাহিত অভ্রান্ত জ্ঞানতত্ত্ব

নিয়োগ করিয়া তদবলম্বনে ঈশ্বরের মহিমা স্মরণ করিয়া কৃতার্থ হইবেন।

জ্ঞান তৎপর কৃতবিদ্য ব্যক্তিরা যে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ পাঠ করিয়া আপনাদিগের আশা এবং ইচ্ছানুরূপ কোন প্রকার জ্ঞানতত্ত্ব লাভ করিবেন, অথবা কোন বিদ্যার্থী বালক এতদ্গ্রন্থ পাঠ করিয়া কোন প্রকার সুসম্পন্ন বিজ্ঞানশাস্ত্রাধ্যয়নের ফল প্রাপ্ত হইবেন ইহা আমার উদ্দেশ্য নহে। এই গ্রন্থ মধ্যস্থ স্থূল স্থূল প্রস্তাব গুলির মধ্যে যদি কোন একটি প্রস্তাব বা কোন একটি স্থল পাঠ করিয়া কাহারও মনে একবার আপন সৃষ্টিকর্তার অসদৃশ মহিমা প্রতিভাত হয়; তাহা হইলেই আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ ও পরিশ্রম সফল হইবে। ঈশ্বরপরায়ণ মহাত্মা দিগের সমীপে অবশেষ আমার এই নিবেদন, যে তাঁহারা অবকাশানুসারে, এই পুস্তক খানি একবার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া এবং আপন উপদেশ্য বর্গকে এতন্মধ্যস্থ তত্ত্বের উপদেশ করিয়া আমার শ্রম সফল ও বাঞ্ছাপূর্ণ করেন।

শ্রীনবীনকৃষ্ণ শর্ম্মা।

কৌশল।

এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড যে কেবল কৌশলময় ইহা বিশ্বাস করিতে হইলে অগ্রে কৌশলের স্বরূপ ও ব্রহ্মাণ্ডের অবস্থার বিষয় বিচার করিয়া দেখা নিতান্ত আবশ্যক। আমাদিগের এই রূপ স্বভাব যে আমরা যখন বহুতর স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পদার্থকে পরস্পর সম্বদ্ধ হইয়া কোন একটি বিষয় সিদ্ধ করিতে দেখি, তখনি তাহাকে কৌশল মনে করি। এবং যখন কুত্রাপি কোন কৌশল সন্দর্শন করি, তখনি সেই কৌশলানুরূপ বুদ্ধিরও উপলব্ধি করিয়া থাকি। জগতে সহস্র সহস্র স্বতন্ত্র পদার্থ পরস্পর সম্বন্ধ বিশিষ্ট হইয়া এক একটি কার্য্য সাধন করিতেছে, এবং সহস্র স্থানে সহস্র প্রকার জ্ঞান কার্য্য দৃষ্ট হইতেছে, আমরা ব্রহ্মাণ্ডের যে দিকে নেত্র পাত করি, সেই দিকেই শত শত প্রকার কৌশলময় জ্ঞান কার্য্য দেখিতে পাই। অতএব ব্রহ্মাণ্ডকে কৌশলময়

জ্ঞান কার্য্য মনে করা এবং ঐ কৌশলের কারণ এক অচিন্ত্য-শক্তি-সম্পন্ন অনাদি পুরুষের অস্তিত্বে বিশ্বাস করা আমাদিগের প্রকৃতি মূলক প্রত্যয় সিদ্ধ বলিয়াই অবধারিত হইতেছে। অনেক বিতণ্ডাবাদী কুতার্কিক লোকে ব্রহ্মাণ্ডের কৌশল অস্বীকার করিতে অনেক প্রকার চেষ্টা পাইয়াছেন, কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। কুতার্কিকের তর্ক বলে যদিও কখন কোন মনুষ্যের বুদ্ধি জড়ীভূত হইয়া জ্ঞান নেত্র আচ্ছন্ন হইয়া যায়। কিন্তু তর্ক প্রভাবে কখন মানবের প্রকৃতির নাশ হয় না। তর্কবলে কোন ব্যক্তি কাহারও স্বীয় অস্তিত্বে অপ্রত্যয় জন্মাইতেও পারে না এবং তর্ক প্রভাবে কেহ প্রত্যক্ষ সিদ্ধ পদার্থের প্রতি কাহারও অবিশ্বাস উৎপাদন করিয়া দিতে সক্ষম হয় না। এইরূপ তর্কবলে কখনই কোন ব্যক্তি কার্য্যের প্রতি কারণের কর্তৃত্বে ও কৌশলের প্রতি জ্ঞানের কর্তৃত্বে অপ্রত্যয় জন্মাইতেও সমর্থ হয় না। আমরা যখনি কোন প্রকার কার্য্য সন্দর্শন করি, তৎক্ষণাৎই সেই কার্য্যকে কারণোদ্ভূত বলিয়া বিশ্বাস যাই এবং যেমন কোন প্রকার কৌশলময় জ্ঞান কার্য্য দেখি অ-

জ্ঞানময় পুরুষের কর্ত্তৃত্বে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া থাকি। আমরা যেমন কারণ ভিন্ন কার্য্যের উৎপত্তি মনে করিতে পারি না, সেই রূপ জ্ঞানবান্ পুরুষের কর্ত্তৃত্ব ব্যতিরেকেও কৌশলময় কার্য্যের উৎপত্তিতে প্রত্যয় করিতে সমর্থ হই না। কোন প্রকার কৌশল সন্দর্শন করিলে তাহার অনুরূপ জ্ঞানময় চেতনাবান্ কারণের অস্তিত্বে প্রত্যয় স্থাপন করা যে কি পর্য্যন্ত আমাদিগের প্রকৃতি সিদ্ধ, তাহা অতি সহজেই অনুভূত হইতে পারে।

এক জন সমুদ্র যাত্রী দৈবাৎ কোন দ্বীপ সন্নিকটে পোতভ্রষ্ট ও বিপন্ন হইয়া নানা প্রকার ভয়ে ভীত হইয়াছিল এবং কি প্রকারে সেই বিপদ হইতে মুক্ত হইবে এই চিন্তায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছিল। এমন সময় সেই হতভাগ্য পুরুষ ঐ দ্বীপের একস্থানে ক্ষেত্রতত্ত্ব বিদ্যার কতিপয় রেখাপাত সন্দর্শন করিয়া নষ্টশঙ্ক ও হর্ষ চিত্ত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে আপন সঙ্গিগণকে কহিল "যে আর আমাদিগের কিছুমাত্র শঙ্কা নাই, এস্থানে জ্ঞানবন্ত সভ্য মনুষ্যের বসতি চিহ্ন দৃষ্ট হইয়াছে, এক্ষণে আমাদিগের আশ্বাবন্ত হওয়া উচিত"। উল্লিখিত দ্বীপস্থিত ঐ রেখা সমুদায় সন্দর্শন করত উক্ত স-

মুদ্র যাত্রীর মনোমধ্যে যে প্রকার ভাবের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহা নিতান্তই আমাদিগের প্রকৃতি সঙ্গত এবং প্রত্যেক মনুষ্যেরই স্বতঃ সিদ্ধ প্রত্যয়মূলক। ঐ রেখাপাত সকল উক্ত ব্যক্তির নয়ন গোচর হইবামাত্রই সে উহাদিগকে যেমন পরস্পর সম্বন্ধ বিশিষ্ট ও কৌশল পূর্ণ সন্দর্শন করিল, অমনি তৎক্ষণাৎ উহা কোন ক্ষেত্রতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত কর্তৃক অঙ্কিত বিবেচনা করিয়া নিঃশঙ্ক হইল। উক্ত প্রকার সম্বন্ধবিশিষ্ট ক্ষেত্র পাত সন্দর্শন করিয়া কোন রূপেই উহার মনে এমন বিশ্বাস হইল না, যে সুশিক্ষিত মনুষ্য ভিন্ন অপর কোন পশু পক্ষী বা জীব দ্বারা উক্ত রেখা সম্পাদিত হইয়াছে। সে ব্যক্তি ঐ রেখাপাত সন্দর্শন করিবা মাত্রই বোধ করিল, যে অবশ্য কোন ক্ষেত্রতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক ভূমিতলে ঐ সমস্ত ক্ষেত্রের রেখাপাত করিয়াছেন। তাহার এমন বিশ্বাস হইল না, যে কোন পক্ষী চঞ্চু কি কোন সিংহাদির নখাগ্র অথবা কোন অসভ্য নরের হস্ত দ্বারা এপ্রকার কৌশলময় ক্ষেত্র সকল অঙ্কিত বা পাতিত হইয়াছে। ফলতঃ আমরা যদি কোন অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিয়া মনোহর অট্টা-

ন্নিকা বা রমণীয় নগরী সন্দর্শন করি, অথবা কোন সমুদ্র মধ্যস্থিত দ্বীপ মধ্যে অবতরণ করিয়া কোন গ্রন্থের কোন ভাগ নিরীক্ষণ করি, তাহা হইলে কি কোন রূপেই আমরা তাহা কোন জ্ঞানবান মনুষ্যের কার্য্য বিবেচনা না করিয়া অনিচ্ছোৎপন্ন আকস্মিক ঘটনা বলিয়া প্রত্যয় যাইতে পারি ? কথনই নহে,-এ প্রকার প্রত্যয় মানব জাতির প্রকৃতি বিরুদ্ধ। মনুষ্য যখনি কোন বহুতর স্বতন্ত্র পদার্থকে একত্র সম্বদ্ধ হইয়া কোন কার্য্য সম্পাদন বা কোন অভিপ্রায় সিদ্ধ করিতে সন্দর্শন করে, তখনি তাহাকে কোন জ্ঞানবন্ত কর্ত্তার অভিপ্রেত কার্য্য বলিয়া প্রত্যয় যায়। অতএব এই কৌশলময় জগৎ শৃঙ্খলা সন্দর্শন করিয়া ইহাকে অকারণোৎপন্ন আকস্মিক ঘটনা বা অনিচ্ছোৎপন্ন কার্য্য বিবেচনা করা কোন প্রকারেই মানব জাতির প্রকৃতিসিদ্ধ বলিয়া গণ্য করা বিচার সঙ্গত হইতে পারে না। যে জগতের ক্ষুদ্রতম কীট হইতে বৃহৎ হস্তী পর্য্যন্ত এবং সামান্য রেণু কণা হইতে অতিদূর স্থিত নভোমণ্ডলবর্ত্তী জ্যোতির্ময় নক্ষত্র পর্য্যন্ত, সমুদায় পদার্থকে এক কৌশল সূত্রে বদ্ধ থাকিয়া এক প্রকার অভিপ্রায় সিদ্ধ ও এক প্রকার কার্য্য সাধন

করিতে দেখা যাইতেছে, যে জগতের প্রত্যেক পদার্থেই এক অনাদি পুরুষের জ্ঞান, শক্তি ও করুণার চিহ্ন দেদীপ্যমান প্রকাশ রহিয়াছে, সেই অদ্ভুত সম্বন্ধ বিশিষ্ট জগৎ শৃঙ্খলাকে কি প্রকারে আমরা কৌশলময় জ্ঞান কার্য্য স্বীকার না করিয়া অকারণোৎপন্ন আকস্মিক ঘটনা বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারি? যখন স্বতন্ত্র পদার্থ সমূহকে পরস্পর সম্বন্ধ বিশিষ্ট সন্দর্শন করিলেই তাহা এক ব্যক্তির ইচ্ছোৎপন্ন জ্ঞান কার্য্য বলিয়া বিশ্বাস করি, তখন এই জগতীস্থ অসংখ্য পদার্থ রাশিকে দৃঢ়তর রূপে সম্বন্ধ বিশিষ্ট সন্দর্শন করিয়া এবং একসূত্রে সম্বদ্ধ দেখিয়া কি প্রকারে তাহা আকস্মিক ঘটনা বলিয়া স্থির থাকিতে পারি? বিশেষতঃ আমাদিগের এই রূপ প্রকৃতি যে আমরা যে কার্য্যে কোন প্রকার অভিপ্রায়ের চিহ্ন দেখিতে পাই, সে কার্য্যকে আর কোন রূপেই অনিচ্ছোৎপন্ন আকস্মিক ঘটনা বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারি না, তাহাকে তৎক্ষণাৎ ইচ্ছাসম্ভূত কার্য্য বলিয়া বিশ্বাস করি? আমরা এই প্রকৃতিসিদ্ধ প্রত্যয় অবলম্বন করিয়া প্রত্যেক কার্য্যের দোষাদোষ বিচার করিয়া থাকি এবং আমরা এই প্রত্যয় অনুসারে

দুষ্ক্রিয়ার দণ্ড বিধান ও সৎকার্য্যের পুরস্কার প্রদান করি। আমরা যে কার্য্যে যে পরিমাণে অসদভিপ্রায় দেখিতে পাই তাহাকে তত অসৎ কর্ম্ম বলিয়া গণ্য করি এবং যে কার্য্যে যে প্রকার সদভিপ্রায় দর্শন করি, তাহাকে তদ্রূপ সৎকার্য্য বলিয়া গ্রাহ্য করিয়া থাকি। আমরা যদি ক্ষণকালের জন্য এই প্রকৃতিসিদ্ধ প্রত্যয় উল্লঙ্ঘন করিয়া কার্য্য করি, তাহা হইলে আর কোন রূপেই মনুষ্য নামের যোগ্য হইতে পারি না। যে কার্য্যে কিছুমাত্র অভিপ্রায় দেখি, সে কার্য্যকে আমরা আর কখন কোন রূপেই আকস্মিক ঘটনা বলিয়া প্রত্যয় করিতে পারি না। অতএব যখন কার্য্য মাত্রে অভিপ্রায় দর্শন করিলে তাহাকে আকস্মিক ঘটনা বলিয়া প্রত্যয় করা আমাদিগের প্রকৃতি ও যুক্তি বিরুদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে, তখন সহস্র সহস্র অভিপ্রায় প্রকাশক জগৎ কার্য্যকেই কেবল আকস্মিক ঘটনা বলিয়া গণ্য করা কিরূপে আমাদিগের প্রকৃতিসিদ্ধ হইতে পারে? কেহ কেহ এপ্রকার আপত্তি করিয়া থাকেন, যে কোন মনুষ্যকৃত অট্টালিকাদি শিল্প কার্য্য দর্শন করিয়া তাহা কোন জ্ঞানবান পুরুষের নির্ম্মিত মনে করা আর এই জগৎ দেখিয়া ইহাকে

কোন জ্ঞানবান পুরুষের ইচ্ছোৎপন্ন বিবেচনা করা কখন সমান হইতে পারে না। জগতের সহিত মনুষ্য কৃত কোন প্রকার কার্য্যের কখনই সাদৃশ্য সম্ভবে না। আমরা কোন অরণ্য মধ্যে অট্টালিকাদি দেখিলে তাহা অবশ্য কোন মনুষ্যকৃত বিশ্বাস করি বলিয়া যে ব্রহ্মাণ্ডকেও কোন অনাদি পুরুষের রচিত প্রত্যয় করিব তাহার কোন বিশিষ্ট হেতু উপলব্ধ হয় না। আমরা অট্টালিকাদি শিল্প কার্য্য সকল চিরদিনই মনুষ্য দ্বারা রচিত হইতে দেখি, সুতরাং অপর যে কোন স্থানে তদ্রূপ অট্টালিকাদি দেখিতে পাই, তাহাকেও জ্ঞানবান মনুষ্যের রচনা বলিয়া প্রত্যয় যাই। কেবল এক উপমিতি জ্ঞান দ্বারা আমাদিগের উক্ত প্রকার প্রত্যয়ের উৎপত্তি হয়। কিন্তু এব্রহ্মাণ্ড অদ্বিতীয় কার্য্য, আমরা আর কুত্রাপি ইহার সদৃশ কার্য্য কোন কর্ত্তা হইতে উৎপন্ন দেখিতে পাই না, সুতরাং ব্রহ্মাণ্ডকেও কোন রূপে কোন কারণোদ্ভূত বা জ্ঞানকৃত কার্য্য বলিয়া প্রত্যয় করিতে প্রবৃত্ত হই না। আমরা যদি কোন কালে ব্রহ্মাণ্ড সদৃশ অপর কার্য্যকে কোন জ্ঞানবান কারণ হইতে উৎপন্ন হইতে দেখিতাম, তবে ইহাকেও একজন কর্ত্তার রচনা বলিয়া বিশ্বাস

আমরা যে কারণে অরণ্যস্থ অট্টালিকাকে অনভিপ্রেত আকস্মিক ঘটনা বলিয়া প্রত্যয় করিতে পারি না, সেই কারণে ব্রহ্মাণ্ডকেও আকস্মিক ব্যাপার বলিয়া বিশ্বাস যাইতে সমর্থ হই না। আমাদিগের এতদুভয় প্রত্যয় এক কারণ হইতেই উৎপন্ন হয়। উপমিতি ভিন্ন যে আর কোন বিষয়ের স্বরূপ জ্ঞান উদ্ভব হয় না, ইহা কোন কার্য্যেরই কথা নহে! জগতের মধ্যে আমরা অনেক উপমা রহিত অদ্বিতীয় পদার্থ দেখিতে পাই; কিন্তু তাহা বলিয়া কি আমরা সেই সকল অসদৃশ পদার্থের স্বরূপ কিছুমাত্র বুঝিতে পারি না? কোন মনুষ্য জন্মের মধ্যে যদি একবার কোন স্থানে একটি ঘটিকা যন্ত্র দর্শন করে, তাহা হইলে কি সে ব্যক্তি ঐ ঘটিকার সমুদায় তাৎপর্য্য ও উদ্দেশ্য অবগত হইয়া উহাকে কাহারও অনভিপ্রেত আকস্মিক কার্য্য বলিয়া প্রত্যয় করিতে পারে? অতএব ব্রহ্মাণ্ডের উপমিতির স্থল নাই বলিয়া যে আমরা ইহাকে কৌশলময় জ্ঞানোৎপন্ন কার্য্য বিবেচনা করিব না, এমন কখনই হইতে পারে না। বিশেষতঃ যদিও প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড কৌশল অপেক্ষা সামান্য মনুষ্যকৃত কার্য্যের কৌশল অনেক ভিন্ন; তথাপি যে উহার

সহিত উহার কোন অংশেরই তুলনা হইতে পারে না এমন নহে, আমরা যে যে চিহ্ন উপলক্ষ করিয়া মনুষ্যকৃত কোন কার্য্যকে কৌশলময় মনে করি, তৎ তৎ চিহ্ন অবলম্বন পূর্ব্বকই ব্রহ্মাণ্ডকে কৌশল পূর্ণ অনুভব করিয়া থাকি। অতএব এতদুভয়স্থলের অনুমিতি বিষয়েও কিছুমাত্র ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় না।

জল যথার্থই মনুষ্যের জীবন, জল মনুষ্যের যেমন উপকারী তেমনি সুলভ। জল সকল জীবের সর্ব্বতোভাবে আবশ্যক বলিয়া জগদীশ্বর উহা পৃথিবীর সর্ব্বস্থানেই স্থাপন করিয়াছেন। অনেকানেক দুর্লভ পদার্থ দ্বারা মনুষ্যের যে কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে, কেবল এক জলই সেই কার্য্য সাধন করিতে সমর্থ হয়। জল তুষার রূপে কঠিন অবস্থায় পরিণত হইয়া মর্ত্ত্য লোক বাসী জীবদিগের অশেষ কল্যাণ সাধনকরিতেছে, বাষ্প রূপ ধারণ করিয়া রাশি রাশি অদ্ভুত কার্য্যের কারণ হইয়া রহিয়াছে এবং তরল অবস্থায় অবস্থিত থাকিয়া জীবদিগের স্নান পানাদি নানা কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে। জলেতে যে সমস্ত অদ্ভুত গুণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা আর কোন পদার্থেই দৃষ্ট হয় না। জগদীশ্বরের এমনি আশ্চর্য্য কৌশল এবং প্রাণীপুঞ্জের প্রতি তাঁহার এরূপ অসাধারণ করুণা, যে সংসারের হিত সাধন জন্য তিনি কোন কোন বিষয়ে জলকে জড় বস্তুর নৈসর্গিক ধর্ম্মও অতিক্রম করিবার শক্তি প্রদান করিয়াছেন।

জড় বস্তুর মধ্যে যে সমস্ত পদার্থ ঘন ও তরল উভয় অবস্থাতেই পরিণত হইতে পারে, তাহাদিগের ধর্ম্ম এই, যে যৎ কালে তাহারা তরল অবস্থা হইতে ঘন অবস্থাতে পরিণত হয়, তৎকালে তাহাদিগের পরমাণু সকল একত্র সংহত হওয়াতে বিস্তৃতির হ্রাস ও ভারের বৃদ্ধি হয় এবং যে সময়ে ঘন ভাব হইতে তরলতা প্রাপ্ত হইতে আরম্ভ করে, তখন তাহারা ক্রমে বিস্তৃত ও লঘু হয়। কিন্তু জলেতে এ নিয়মের ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। জল যখন অত্যন্ত শীতল হইয়া তুষার অবস্থায় পরিণত হইতে আরম্ভ করে, তখন তাহার বিস্তৃতির ন্যূনতা না হইয়া বৃদ্ধি হইতে থাকে এবং সুতরাং তাহার পরিমাণও লঘু হয়। জল এইরূপ অসামান্য নিয়মের অধীন না হইলে পৃথিবীর মধ্যে অনর্থের আর সীমা থাকিত না। জল তুষার অবস্থায় পরিণত হইবার সময়ে বিস্তৃত ও লঘু না হইয়া যদি সংহত ও ভারী হইত, তাহা হইলে তুষার সকল আর কস্মিন্ কালেও জলের উপরিভাগে না ভাসিয়া স্বীয় গুরুত্ব হেতু ক্রমাগত অধস্তলে মগ্ন হইত এবং তাহাতে কস্মিন্ কালেও সূর্য্য উত্তাপ সংলগ্ন হইতে না পাওয়ায় তাহা আর

কোন প্রকারে দ্রবীভূত হইবার সম্ভাবনা থাকিত না, সুতরাং শীত প্রধান দেশের জল, হ্রদ, সরিৎ, সমুদ্র সকল ক্রমে ক্রমে কঠিন প্রস্তরবৎ তুষারময় হইয়া যাইত। তত্রস্থ মৎস্যাদি অসংখ্য জলচর নষ্ট হইত; বাণিজ্যের পথ রোধ হইত এবং প্রবিস্তীর্ণ শীত প্রধান দেশ সকল এক কালে শ্রীহীন ও লোক শূন্য হইয়া যাইত। হিম প্রধান দেশে শীত ঋতুতে যে প্রকার হিম পতিত হয়, তাহাতে তত্রস্থ জলাশয় সকলের জল এত শীতল হইতে পারে যে কোন প্রকারেই আর তন্মধ্যে মৎস্যাদি জলজন্তু জীবিত থাকা সম্ভব হয় না। কিন্তু শীতের প্রারম্ভে জল যেমন শীতল হইয়া মৎস্যাদি জলচরের বাসের অযোগ্য হইবার উপক্রম হয়, অমনি তাহার উপরি ভাগের জল ঘনীভূত হইয়া প্রস্তরবৎ তুষার রূপে ভাসিতে থাকে এবং আর এক বিন্দুমাত্র হিম সেই কঠিন তুষার ক্ষেত্র ভেদ করিয়া জলমধ্যে প্রবেশ করিতে শক্ত হয় না, তুষারের নিম্ন ভাগস্থ সমুদায় জলরাশি সমুচিত উষ্ণ অবস্থাতেই অবস্থান করে, এবং তন্মধ্যে মৎস্যাদি অসংখ্য জল জন্তু অবলীলা ক্রমে জীবন ধারণ করে। প্রভুত্ত কোন কোন স্থানে ঐ প্রকার তুষার ক্ষেত্র অপার সমুদ্রের

ৎপন্ন হয়। জগদীশ্বর যদি জলেতে উল্লিখিতরূপ অদ্ভুত কৌশল প্রকাশ না করিতেন, তাহা হইলে ইয়ুরোপ প্রভৃতি হিম প্রধান দেশের যে সকল শস্যশালিনী উর্ব্বরা ভূমি হইতে এক্ষণে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হইয়া বহুল প্রাণীর জীবিকা নির্ব্বাহ হইতেছে, সেই সমস্ত ভূমি এক কালে শস্যহীনা মরুভূমি হইয়া পতিত থাকিত।

জলের ভারত্ব গুণও এক পরমাদ্ভুত ব্যাপার। জল যে প্রকার ভার বিশিষ্ট হইলে সংসারের কোন বিষয়ের কোন প্রকার ব্যাঘাত না জন্মিতে পারে, ত্রিকালজ্ঞ জগদীশ্বর তাহাকে সেই প্রকার ভারী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। জল যদি ইহা অপেক্ষা আর কিঞ্চিৎ লঘু হইত, তাহা হইলে গো মনুষ্যাদি কোন প্রকার জীব আর জলেতে সন্তরণ করিতে শক্ত হইত না এবং পোত ও তরণী প্রভৃতিও তাহাতে ভাসিতে পারিত না। পাষাণ পিণ্ড জলেতে পতিত হইলে, তাহা যেমন তৎক্ষণাৎ মগ্ন হইয়া যায়, মনুষ্য পশ্বাদিও জলেতে পতিত হইবামাত্র অমনি সেই প্রকার মগ্ন হইয়া যাইত এবং পণ্য দ্রব্য পূর্ণ পোতাদির ভারও জল কখন ধারণ করিতে পারিতনা, সুতরাং বাণিজ্যের

[illegible] কালে রুদ্ধ হইয়া থাকিত এবং কোন দ্বী-
[illegible] হইতে আর কোন দ্বীপের সম্বন্ধ মাত্র থাকিত
না। প্রভৃতি জল যদি একণকার অপেক্ষা আর
কিঞ্চিৎ গুরু হইত, তাহা হইলেও অপার অনর্থ
ঘটিত না। মৎস্যাদি কোন প্রকার জলজন্তু আর
জলের ভার সহ্য করিতে পারিত না; সুতরাং
পৃথিবীর সমস্ত জলের ভাগ প্রায় জীবশূন্য হইত
এবং তাহা হইলে পৃথিবী কখনই এ প্রকার শোভ-
নতম ও উন্নত অবস্থায় পরিণত হইতে পারিত না।
অতএব জলকে যথাযোগ্য ভার বিশিষ্ট করিয়া
জগদীশ্বর যে কি পর্য্যন্ত আপনার মহিমা বিস্তার
করিয়াছেন, তাহা বর্ণনের অতীত।

অসীম জ্ঞানাকর পরম পুরুষ জলেতে যে উত্তাপ
ধারণ করিবার আর একটি আশ্চর্য্য কৌশল প্র-
কাশ করিয়াছেন, তাহাতেও তাঁহার অপার মহিমা
[illegible] তিনশের পারদ যে পরিমাণে
উ[illegible] একশের জল তদ-
পেক্ষা [illegible] উত্তাপ শোষণ
করিতে সমর্থ [illegible] বি-
দ্যমান থাকাতে আমাদিগের অশেষ প্রকার মঙ্গল

প্রখর উত্তাপে পৃথিবীর সমীপবর্ত্তী বায়ু অগ্নি সম উত্তপ্ত হইতে আরম্ভ হয়, তখন পৃথিবীস্থ জলরাশি তাহার অধিকাংশ উত্তাপ শোষণ করিয়া লইয়া বায়ুকে সমভাবে রক্ষা করে এবং শীত কালে যে সময় বায়ু সমধিক শীতল হইবার উপক্রম হয়, তৎকালে জল স্বীয় গর্ব্বস্থ সঞ্চিত উষ্ণতা উৎক্ষেপ করিয়া সে বায়ুর সমুচিত উষ্ণতা সাধন করে। এই রূপে জল শীত উষ্ণ উভয়ের শান্তা স্বরূপ হইয়া সংসার মধ্যে উহাদিগের কাহারও আতিশয্য উদ্ভব হইতে দেয় না এবং উহার প্রভাবে পৃথিবীতে শীত গ্রীষ্মের হঠাৎ পরিবর্ত্ত হইতে না পাইয়া অনেক প্রকার মহামারীও উৎপন্ন হইতে পারে না। অতএব জগদীশ্বর জলের সৃষ্টি করিয়া কেবল যে পৃথিবীকে আমাদিগের বাস যোগ্য করিয়াছেন এমত নহে, তাহার দ্বারা এ পৃথিবী আমাদিগের স্বাস্থ্যময় সুখ ধাম হইয়া রহিয়াছে। শীত ঋতুর পরিণামে পৃথিবীতে যে মনোহর বসন্ত ঋতুর উদয় হইয়া থাকে, জলের উল্লিখিত অদ্ভুত শক্তি তাহার এক প্রধান কারণ। শীতান্তে যখন গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাব আরম্ভ হয় এবং দিবাকর প্রচণ্ড কিরণ বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন জল তাহার অধি-

[illegible] শোষণ করিয়া লইয়া অপূর্ব্ব বসন্ত কালের সৃষ্টি করে। পরন্তু বায়ু হইতে জল তাহার অংশাংশ শোষণ করিয়া লয় বলিয়াই গ্রীষ্ম কালের উত্তপ্ত বায়ু দ্বারা নদ নদী ও পর্ব্বত স্থিত তুষার রাশি একদা দ্রবীভূত হইয়া নিকটস্থ গ্রাম [illegible] স-হসা প্লাবিত করিতে পারে না।

জল যে প্রকার অন্যান্য নানাবিধ গুণ দ্বারা জীববর্গের হিত সাধন করিতে প্রবৃত্ত রহিয়াছে, সেই রূপ উহার অদ্ভুত দ্রবকরী শক্তি দ্বারাও এ পৃথিবীর অসংখ্য উপকার দর্শিতেছে। জলের তুল্য এমন আশ্চর্য্য দ্রবকরী শক্তি আর কোন পদার্থেই দৃষ্ট হয় না। জলেতে পৃথিবীর প্রায় যাবতীয় পদার্থই দ্রবীভূত হইতে পারে। যে সমস্ত নদী অতি দূর পর্ব্বত হইতে প্রবাহিত হইয়া নানা প্রকার ধাতু রত্নাদির আকর স্থান ধৌত করিয়া গমন করে, সেই সমস্ত নদীর জলে প্রায় বহুবিধ কঠিন ধাতুর অংশ মিশ্রিত থাকিতে দেখা যায়। এতদ্ভিন্ন স্রোতস্বতী নদী প্রবাহে প্রায় সর্ব্বদাই নানা প্রকার উদ্ভিদ পদার্থের অংশও দেখিতে পাওয়া [illegible] অদ্ভুত দ্রবকরী শক্তি [illegible] পর্ব্বতাদির অমূল্য [illegible]

ভাগ বহন করিয়া অনন্যা বহুল দ্বীপ উপদ্বীপের অসারবতী ভূমিকে প্রভূত রূপে সারবতী করে। সহস্র সহস্র মনুষ্য একত্রিত হইয়া অত্যন্ত পরিশ্রম পূর্ব্বক সার বহন করিয়া যে সমস্ত বিস্তীর্ণ বালুকা-ময় দ্বীপ শস্যশালী করিতে না পারে, সেই সকল সুবিস্তৃত প্রান্তর ভূমি যদি একবার কোন নদী প্র-বাহে প্লাবিত হয়, তবে তাহা এমন আশ্চর্য্য উর্ব্বরা ও সারবতী হইয়া উঠে যে তাহাতে যে কোন শস্যের বীজ বপন করা যায়, তাহাই অপর্য্যাপ্ত রূপে ফলিতে থাকে। আমরা এক্ষণে পৃথিবীর যে দেশের যে সমস্ত ভূমি হইতে প্রচুররূপে নানা প্র-কার উৎকৃষ্ট শস্য প্রাপ্ত হইতেছি, তাহার অধিকাং-শই প্রায় পূর্ব্বোক্ত প্রকারে উর্ব্বরা ও ফলবতী হইয়াছে। জগদীশ্বরের কি আশ্চর্য্য করুণা। তিনি স্বয়ং কৃষাণ স্বরূপ হইয়া জল প্রবাহ উপলক্ষে আমাদিগের অসার মরুভূমিতে সার বহন করিতে নিযুক্ত রহিয়াছেন।

জলের ঐ আশ্চর্য্য দ্রবকরী শক্তি দ্বারা আমা-দিগের আরও অনেক মহদুপকার দর্শিয়া থাকে। ইহা এক্ষণে অনেকেই অবগত আছেন যে ভূমণ্ডলস্থ মহা মহা সাগর জলে যদি লবণ মিশ্রিত না থাকিত,

জন্তুর বাস যোগ্য হইয়া রহিয়াছে। অতএব সমুদ্র জল লবণাক্ত হওয়াতে আমাদিগের যে সকল মহৎ কল্যাণ উদ্ভব হইতেছে, তাহায় অদ্ভুত উপকারী শক্তি যে তাহার মূলীভূত কারণ তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

ইহা অনেকেরই বিদিত আছে যে মৎস্যাদি জল মধ্যে কাল যাপন করিয়া এই পৃথিবীর বায়ুর দ্বারা নিশ্বাস কার্য্য সমাধা করিয়া জীবিত থাকে। বায়ু যখন জলের সহিত সংস্পর্শ হয়, তখন তাহার কিয়দংশ ঐ জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া অবস্থিতি করে। মৎস্য প্রভৃতি জল জন্তু সেই বারি মিশ্রিত বায়ু গ্রহণ দ্বারা জীবিত থাকে। অতএব জলের সংস্পর্শ ব্যতীত মৎস্যের অস্তু পাওয়া সুকঠিন।

অনন্ত কৌশলকর্ত্তা পরমেশ্বর জলকে বাষ্প রূপে পরিণত হইবার শক্তি প্রদান করিয়াও সামান্য করুণা প্রকাশ করেন নাই। উক্ত শক্তি জন্য জল আমাদিগের বিশেষ সুখের কারণ হইয়া রহিয়াছে, জল বাষ্পরূপ ধারণ করিতে পারে বলিয়াই বায়ুর অন্তরে স্থিতি করিতে সমর্থ হয় এবং পুনর্ব্বার নীহার রূপে অবনিতলে পতিত হইয়া ঋতু বিশেষে নানা জাতীয় শস্য উৎপাদন করে

এবং উহার ঐ শক্তি থাকাতেই উহা সমুদ্র হইতে বাষ্পোত্থান পূর্ব্বক বায়ু সহকারে দেশ দেশান্তরে গমন করিয়া বৃষ্টিরূপে পতিত হইয়া অসংখ্য প্রাণীর জীবন দান করিয়া থাকে।

জল স্বয়ং গন্ধ বিহীন হইয়াও কখন কখন আমাদিগের ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সুখের কারণ হয়। জলের সহায়তা দ্বারা সুগন্ধ পুষ্পরেণু যে প্রকার বাষ্প রূপে পরিণত হইয়া আমাদিগের ঘ্রাণেন্দ্রিয় প্রবিষ্ট হইতে পারে, উহার সাহায্য ব্যতিরেকে কখনই সে প্রকার হইতে পারে না; এই নিমিত্ত বৃষ্টির অনতিবিলম্বে পুষ্প কানন বা গন্ধময় মৃত্তিকা হইতে যে প্রকার সতেজে সৌরভ নির্গত হয়, সেরূপ আর কোন সময় হয় না।

জল স্বীয় অদ্ভুত শক্তি দ্বারা বায়ু হইতে নানা প্রকার প্রাণ নাশক দূষিত বাষ্পের ভাগ শোষণ করিয়া উহাকে পরিষ্কার ও মনুষ্যের প্রাণ তুলা করিয়া রক্ষা করে। জলের উক্ত প্রকার শোষণ শক্তি না থাকিলে আমরা এক একটি নিশ্বাস ক্রিয়া দ্বারা প্রাণ ত্যাগ করিতাম। জলের সহায়তা দ্বারাই আমাদিগের শরীর মধ্যে শোণিত সকল যথানিয়মে সঞ্চালিত হইতেছে, জলের সাহায্যে আমরা

ইক্ষু হইতে তাহার অন্তরস্থ শর্করা নির্গত করিয়া সুখেতে উপভোগ করিতেছি এবং জলের রসকরী শক্তি দ্বারা পশু পক্ষী প্রভৃতি অসংখ্য জীব স্বীয় স্বীয় শরীরের কান্তি লাবণ্য ও কোমলতা রক্ষা করিতেছে। জলশূন্য নীরস দেহের যে কিছু মাত্র সৌন্দর্য্য থাকে না, তাহা অনেকেই বিদিত আছে। বাষ্পীয় পোত, বাষ্পীয় রথ ও অন্যান্য বহুবিধ বাষ্পীয় যন্ত্র দ্বারা সংসারের যে সমস্ত সৌভাগ্য বৃদ্ধি হইয়াছে, জল সে সমুদায়েরই মূল কারণ। জলীয়বাষ্প ভিন্ন কোন প্রকার বাষ্পীয় যন্ত্রের কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না এবং বাষ্পীয় যন্ত্র বিনা কখনই কোন রূপ অদ্ভুত শিল্প কার্য্য নির্ব্বাহ হয় না। অতএব বিচারক্রমে জলকেই শিল্প কার্য্যের প্রাণ স্বরূপ বলিতে হইবেক।

ঈশ্বরপরায়ণ তত্ত্বদর্শী ব্যক্তি যদি জলের সমস্ত গুণ আলোচনা করিয়া দেখেন, তবে উঁহার এক একটি বিন্দু মধ্যে তিনি ঈশ্বরের অপার করুণার সিন্ধু সন্দর্শন করিয়া ভক্তি প্রবাহে প্রবাহিত হয়েন।

সমুদ্র।

ভূমণ্ডলে যে সমস্ত বিস্তৃত পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে সমুদ্রের তুল্য আর কিছুই নাই। প্রায় পৃথিবীর তিন ভাগ সমুদ্র দ্বারা পরিবৃত হইয়া রহিয়াছে। কোন সাগর তীরে দণ্ডায়মান হইয়া তাহার বহু দূর বিস্তৃত অগাধ জল রাশির আশ্চর্য্য শোভা সন্দর্শন করিলে মনো মধ্যে যে প্রকার মহান্ ভাবের আবির্ভাব হয়, পৃথিবীর কোন পদার্থ নিরীক্ষণ করিলে আর মনেতে সে প্রকার ভাবের উদয় হয় না। এক স্থানে অবস্থিতি করিয়া অপ্রতিবন্ধকে যেমন সাগরের বহুদূর পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়, গ্রাম নগর পর্ব্বত কানন প্রভৃতি আর কিছুই সেরূপে দৃষ্টি গোচর হয়না। সমুদ্র যেমন যোরতর প্রশস্ত, তেমনি মহা গভীর, সমুদ্রের যে অপরিমেয় গভীরতার প্রবাদ শ্রবণ করা যায়, তাহা নিতান্ত অসঙ্গত বোধ হয় না। [illegible] [illegible] দ্বারা সমুদ্রের এক এক স্থানের যে গভীরতা নিরূপণ হইয়াছে, তাহাতে গভীর সাগর গর্ভকে [illegible] অতলস্পর্শই বোধ হইতে পারে। পোত পরিচালক নাবিক [illegible] বিবিধ উপায় দ্বারা পরিমাণ করিয়া দেখিয়াছেন, যে এক এক স্থানে

তিন চারি সহস্র হস্ত পরিমিত শৃঙ্খল জলমগ্ন করিলেও সমুদ্রতল প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

করুণাময় জগদীশ্বরের মহিমা প্রভাবে সমুদ্র-জলের কখন হ্রাস বৃদ্ধি নাই, উহা চির দিনই সমভাবে স্থিতি করে। ইহা প্রায় অনেকেই অবগত আছেন, যে দিবাকর দীপ্তি কর দ্বারা প্রতিনিয়তই সমুদ্র হইতে জল আকর্ষণ করিয়া থাকে, কিন্তু এরূপ নিবারণ দ্বারা যদি সাগর জলের ক্ষয় হইত, তাহা হইলে এত দিনে পৃথিবীর অনেক নদ হ্রদ ও তড়াগ প্রভৃতি জলাশয় সকল শুষ্ক হইয়া যাইত এবং প্রতি বর্ষে নদী নির্ঝর ও প্রস্রবণ প্রভৃতির প্রবাহ দ্বারা সমুদ্র মধ্যে যে জলরাশি পতিত হয়, যদি তদ্দ্বারা ক্রমে সমুদ্রের কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি হইত, তাহা হইলেও এ পৃথিবীর জনপদ সমস্ত এত দিনে জলমগ্ন হইয়া যাইত, কিন্তু ঈশ্বরের করুণা গুণে কোনরূপেই সাগর জলের হ্রাস বৃদ্ধি হইতে পারে না এবং সংসারের কোন দুর্ঘটনাও ঘটে না, সূর্য্য কিরণ দ্বারা প্রতি বর্ষে সমুদ্র হইতে যে পরিমাণে জল ক্ষয় হয়, সমুদায় নদ নদী স্বীয় প্রবাহ দ্বারা সেই ক্ষতি পূরণ করে, সুতরাং সাগর জল চির দিনই সম ভাবে থাকে। অতএব বিম-

রূপ প্রতিপন্ন হইতেছে যে সূর্য্য চন্দ্র অগ্নি বায়ু প্রভৃতি মহান্ পদার্থ সকল যে বিশ্বনিয়ন্তা বিশ্ব রাজের অনুশাসনে স্বীয় স্বীয় নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেছে, ভূমণ্ডলস্থ প্রশস্ত সাগরও সেই পুরুষের অখণ্ডনীয় নিয়মের অধীন থাকিয়া সংসারের কল্যাণ সাধনে রত রহিয়াছে, তাবা কি সে সমুদ্র স্বীয় নির্দ্দিষ্ট সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া সংসারের কোন অকল্যাণ উৎপন্ন করিতে পারে?

পৃথিবীর উপরের দেশস্থ শুষ্ক ভূমির ভাগ যেমন নানা প্রকার খাত নিখাত ও গিরি গহ্বর প্রভৃতি দ্বারা বন্ধুর ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে, সাগর জলস্থ জল মগ্ন ভূমি সকলও সেই প্রকার উন্নত ও অবনত স্থান দ্বারা অসমান হইয়া রহিয়াছে। পৃথিবীর স্থল ভাগে যেমন পর্ব্বত ও গিরিকন্দর এবং খাত ও উপত্যকা প্রভৃতি নানা বিধ উচ্চ নীচ স্থান দেখিতে পাওয়া যায়। সমুদ্র গর্ভ মধ্যেও অবিকল সেই রূপ বিবিধ প্রকার উন্নত ও অবনত স্থান বিদ্যমান আছে। এতদ্ভিন্ন স্থল ভাগে যেমন নানা জাতীয় উদ্ভিদ পদার্থ উৎপন্ন হইয়া থাকে, সাগর মধ্যেও সেই রূপ নানা জাতীয় বৃক্ষ তৃণ ও লতা গুল্মাদি উৎপন্ন হয় এবং তাহারা অসংখ্য প্রকার

জীবের জীবিকা ও অন্যান্য কার্য্য নির্ব্বাহ করে। সমুদ্র মধ্যে এত প্রকার বৃহৎ ও ক্ষুদ্র জীব জন্ম গ্রহণ করে, যে তাহার সংখ্যা করা দুষ্কর। যে সমুদ্র মধ্যে অতিকায় তিমি মৎস্য জন্ম গ্রহণ করিয়া সুখেতে জীবন যাপন করিতেছে, সেই সাগর গর্ব্ভেই অতি ক্ষুদ্র প্রবাল কীট উৎপন্ন হইয়া জীবিত রহিয়াছে এবং উহারা প্রত্যেকেই স্বীয় স্বীয় শক্তি অনুসারে জগদীশ্বরের আজ্ঞা বহন পূর্ব্বক জগতের কার্য্য করিতে নিযুক্ত রহিয়াছে। সাগরস্থ অতি ক্ষুদ্র প্রবাল কীট পুঞ্জ একত্রিত হইয়া যে মহান্ কার্য্য সম্পাদন করে, সহস্র সহস্র মহাবল মাতঙ্গদল একত্রিত হইয়াও কোটি কল্পে সে ব্যাপার সাধন করিতে সক্ষম হয় না। যে সমস্ত প্রশস্ত প্রশস্ত রমণীয় উপদ্বীপে বহু সংখ্যক প্রাণী বাস করিয়া সুখেতে প্রাণ ধারণ করিতেছে এবং যে সকল শস্যশালী দ্বীপ পুঞ্জ হইতে আমরা নানা জাতীয় সুখাদ্য দ্রব্য প্রাপ্ত হইয়া অশেষ বিধ আনন্দ ভোগ করিতেছি, বিশ্বপতি বিশেশ্বরের মহিমা বলে যৎসামান্য প্রবাল কীট দ্বারা তাহার অনেক দ্বীপ উৎপন্ন হইয়াছে। সমুদ্র গর্ব্ভস্থ যে সমস্ত পর্ব্বত-সম স্তূপাকার মৃত্তিকা রাশি ক্রমেতে উন্নত হইয়া জল ভেদ পূর্ব্বক

গাত্রোত্থান করে, তাহারাই আমাদিগের নিকট দ্বীপ ও উপদ্বীপ বলিয়া পরিগণিত হয়, সুতরাং দ্বীপোপরিস্থ সম স্থলকে এক প্রকার সাগর গর্ভস্থ পর্ব্বতের শিখর দেশ বলিলেও বলা যাইতে পারে।

সমুদ্র জলের ক্ষার গুণও এক পরমাদ্ভুত ব্যাপার! ইহা সকলেই অবগত আছেন, যে সমুদ্র সলিল অতিশয় লবণাক্ত; কিন্তু কি রূপে যে সমুদ্র জল এ প্রকার লবণ মিশ্রিত হইল তাহা এ পর্য্যন্ত কেহই নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই? কেহ কেহ অনুমান করেন যে নদীর স্রোত দ্বারা খনিজ লবণ ধৌত হইয়া সমুদ্রে পতিত হওয়াতেই উহার জল এ প্রকার লবণাক্ত হয় এবং কোন কোন ব্যক্তি এ প্রকারও অনুমান করিয়া থাকেন, যে সাগর গর্ভস্থ শৈলজ লবণ দ্রবীভূত হওয়াতেও উহার জল লবণাক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহার কোন অনুমানই সপ্রমাণ নহে। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সাগর জল লবণাক্ত হইলে কালেতে তাহার ক্ষারত্ব গুণের হ্রাস বৃদ্ধি প্রকাশ পাইত। শত বৎসর পূর্ব্বে সিন্ধু সলিল যে রূপ লবণাক্ত ছিল, এক্ষণেও সেই রূপ রহিয়াছে, অতএব কি প্রকারে যে সিন্ধু সলিল লবণাক্ত হইয়াছে সে বিষয় এক্ষণে এক প্র-

কার মনুষ্য বুদ্ধির অগোচর বলিয়াই অবধারিত রহি-য়াছে। কেবল এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে, যে উহা সৃষ্টির কল্যাণ সাধনার্থে ঈশ্বর স্রষ্টার নিকট হইতে এরূপ স্বভাব সিদ্ধ কার্য্য ফল প্রাপ্ত হইয়াছে। সমুদ্র জলে এ প্রকার লবণ মিশ্রিত থাকাতে যে সংসারের কত কল্যাণ উদ্ভব হইতেছে, তাহা আ-মরা ইতি পূর্ব্বে জল সম্বন্ধীয় প্রস্তাবে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ বর্ণন করিয়াছি এবং তাহা এক্ষণে বিজ্ঞগ-ণগুলি মধ্যে প্রায় অনেকেই অবগত আছেন। এ-ক্ষণে কেবল ইহা মাত্র বক্তব্য যে সাগর জলে লবণ মিশ্রিত না থাকিলে সে জল জীব জন্তুর কোন উ-পকারী না হইয়া বরং অসংখ্য প্রকার অপকারে-রই কারণ হইত।

সমুদ্র রচনা বিষয়ে জগদীশ্বর এক স্থলে সৌ-ন্দর্য্য ও গাম্ভীর্য্য উভয় ভাব সম্পাদন করিয়া যে কি পর্য্যন্ত আপনার মহিমা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বর্ণনের অতীত। যে ব্যক্তি সুদূর প্রসারিত সমুদ্র জলের নীলোজ্জ্বল বর্ণের শোভা সন্দর্শন করিয়াছে, সেই জানে যে বিশ্বস্রষ্টা পরমেশ্বর সাগ-রকে কত দূর পর্য্যন্ত সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন। সুনির্ম্মল আকাশ জল দ্বারা উত্তোলন করিয়া

দেখিলে তাহার কোন প্রকার বর্ণই প্রকাশ পায় না, অথচ সেই বর্ণহীন নির্ম্মল সলিল সমষ্টি দ্বারা সাগরের এতাদৃশ মনোহর শোভা উৎপন্ন হওয়া যে কত দূর আশ্চর্য্যের বিষয় তাহা কি বলিব! শারদীয় সুবিমল নভোমণ্ডলের সৌন্দর্য্যের সহিত, সুপ্রশস্ত সমুদ্রে শোভার কিছু মাত্র ভিন্নতা নাই, কিন্তু ইহার মধ্যে বিশেষ আশ্চর্য্য এই যে জগদীশ্বর আকাশ মণ্ডলকে যে প্রকার নক্ষত্র রূপ উজ্জ্বল হীরকখণ্ড দ্বারা বিভূষিত করিয়াছেন, বারিপথোপজীবী সমুদ্র যাত্রিদিগের নেত্র সুখ সাধনার্থে সমুদ্র জলেও সেই রূপ এক প্রকার জ্যোতিষ্মান্ উজ্জ্বল পদার্থ বিকীর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। যাঁহারা সচরাচর সমুদ্র পথে যাতায়াত করিয়া থাকেন, তাঁহারা সকলেই দেখিতে পান, যে রজনী যোগে সাগর জলে নক্ষত্র মালার ন্যায় এক প্রকার উজ্জ্বল পদার্থ ইতস্ততঃ প্রদীপ্ত হইয়া থাকে। তত্ত্বানুসন্ধায়ী পণ্ডিত গণ অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন, যে খদ্যোতের ন্যায় এক প্রকার জলীয় কীট হইতে ঐরূপ প্রকার আলোকের উৎপত্তি হয়। নাবিক গণ ঐ সমস্ত কীটকে সিন্ধু খদ্যোত বলিয়া উল্লেখ করে। ঐ কীট সমূহ [illegible] যখন সাগর মধ্যে এ প্র-

কার আলোকের উৎপত্তি হয়, যে তদ্দ্বারা তমসাচ্ছন্ন রজনী ক[illegible] বহু দূর পর্য্যন্ত নিরীক্ষণ করিতে পারা যায়। উক্ত কীটোৎপন্ন আলোকের সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিলে এ প্রকার বোধ হয়, যে তারাগণের সহিত আকাশ মণ্ডল যেন ভূতলে আসিয়া পতিত হইয়াছে। বাস্তবিক সামান্য জলীয় কীট হইতে এ প্রকার অদ্ভুত আলোকময় উজ্জ্বল শোভা উৎপন্ন হওয়া যে কি পর্য্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় তাহা মনেতে ধারণ করা যায় না, ইহা কেবল জগদীশ্বরেরই মহিমার নিদর্শন।

সমুদ্র না থাকিলে যেমন জীবনের জীবন স্বরূপ বৃষ্টির সৃষ্টি হইত না এবং বৃষ্টির অভাবে যেমন বহু প্রকার শস্যাদিও অনায়াসে উৎপন্ন হইতে পারিত না, সমুদ্রের অভাব হইলে যেমন পৃথিবীর মধ্যে নদ নদীরও অভাব হইত এবং সুতরাং নানা স্থানে বহু সংখ্যক প্রাণীও জলাভাবে প্রাণত্যাগ করিত, সেই রূপ সাগরাভাবে পৃথিবীর আরও সহস্র প্রকার উন্নতির পথে বাধা [illegible] হইত। বাণিজ্য দ্বারা যে পৃথিবীর অনেক উন্নতি সিদ্ধ হইতেছে এবং বাণিজ্য ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া বহুসংখ্যক মনুষ্য যে অন্নাচ্ছাদন প্রাপ্ত

হইতেছে ও সংসার মধ্যে বাণিজ্য কার্য্য প্রচলিত থাকাতে যে মনুষ্যের বহু কষ্ট নিবারণ ও বহু প্রকার সুখ বর্দ্ধন হইতেছে, একথা উল্লেখ করাই বাহুল্য. অপিচ বারি পথে পোত পরিচালন দ্বারা এক দেশের উৎপন্ন বস্তু দেশান্তরে উপস্থিত করিয়া যেমন উৎকৃষ্ট রূপে বাণিজ্য কার্য্য নির্ব্বাহ করা যায়, স্থল পথে শকটাদি দ্বারা যে কোন রূপে সে প্রকার করিবার সাধ্য হয় না, ইহাও সকলেই অবগত আছেন. কিন্তু জগদীশ্বর পৃথিবীতে সমুদ্র ও নদ নদীর সৃষ্টি না করিলে কি প্রকার করিয়াই বা পোত পরিচালন করা যাইত, এবং কি উপায় দ্বারাই বা সুন্দর রূপে বাণিজ্য কার্য্য নির্ব্বাহ হইত ? বোধ হয় অতি দূর দেশে বাণিজ্য করা মনুষ্যের এক প্রকার অসাধ্য হইয়া উঠিত এবং দূর ব্যবহিত এক স্থানের সহিত অন্য স্থানের কোন প্রকার সম্বন্ধ থাকাও কঠিন হইত। সুতরাং মনুষ্যেরা কোন প্রকারেই আর এক্ষণকার ন্যায় এক স্থানে বাস করিয়া সকল স্থানের রীতি নীতি অবগত হইয়া অন্যের নিকটে প্রকাশ করিতে পারিত না এবং অনেকে সে অতি দূর দেশে গমন করিয়াও সৃষ্টির বিচিত্র শোভা সন্দর্শন করিতে সমর্থ হইত না, স্থল পথে

যান বাহনাদি দ্বারা অতি দূর দেশ গমন করা যে কি পর্য্যন্ত দুঃসাধ্য ব্যাপার তাহা প্রায় অনেকেই অবগত আছেন। অতএব যিনি আমাদিগের অশেষ মঙ্গল উদ্দেশ করিয়া মর্ত্ত্য লোকে বহুরত্নাকর সমুদ্রের সৃষ্টি করিয়াছেন, আমরা মনের সহিত সেই মঙ্গল দাতা বিশ্ব বিধাতাকে বার বার নমস্কার করি।

পৃথিবীর মধ্যে সাগরের সৃষ্টি হওয়াতে যেমন বাণিজ্যাদি নানা বিষয়ের সুবিধা হইয়াছে, সেই রূপ উহা দ্বারা মনুষ্যের বহু প্রকার ব্যাধি নিবারণ ও স্বাস্থ্য সাধন হইতেছে। বৃক্ষ, লতা, ও তৃণ, গুল্ম এবং মনুষ্যাদি জীব জন্তু দ্বারা পৃথিবীস্থ বায়ু সতত্তই বিকার প্রাপ্ত হয়, কিন্তু সমুদ্র সেই বায়ুর বিকৃতাবস্থার প্রতীকার সাধন করিয়া থাকে। সমুদ্র, বায়ু হইতে তাহার কোন কোন ন্যূনাংশ শোষণ করিয়া লইয়া স্বীয় গর্ভে সঞ্চিত করিয়া রাখে এবং যখন পশু পক্ষী ও মনুষ্যাদি জীব জন্তুর নিশ্বাস ক্রিয়া দ্বারা বায়ু হইতে তাহার অক্সিজন বাষ্পের ভাগ অধিক ক্ষয় হইয়া যায়, তখন সমুদ্র স্বীয় গর্ভ হইতে অক্সিজন উৎক্ষেপ করিয়া তাহার সেই ভাগ পূরণ করে, সুতরাং কোন রূপে বায়ু আর বিকৃত হইতে পায় না। পৃথিবীর মধ্যে সমুদ্র বিদ্যমান

থাকাতে বায়ুর প্রকৃতি সততই সমভাবে অবস্থিত থাকে, কোন কারণবশত বায়ু যখন এরূপ উষ্ণ হয়, যে তাহা সেবন করিলে জীব জন্তুর পীড়া জন্মিতে পারে, সমুদ্র জল তখন তাহার সমতা সাধন করিতে আরম্ভ করে এবং বায়ু সমধিক উষ্ণ হইলেও সমুদ্রোত্থিত শীতল বায়ু দ্বারা সেই উষ্ণতা নিবারিত হয়। সমুদ্র, বায়ু শোধনের এক প্রবল কারণ, সমুদ্র না থাকিলে পৃথিবীর বায়ু প্রাণী বর্গের পক্ষে বিষম অনিষ্ট দায়ক হইয়া উঠিত। মনুষ্য অনেকানেক উৎকট রোগে পীড়িত হইলে সমুদ্র বায়ু সেবন দ্বারা অনায়াসে আরোগ্য লাভ করে। কোন কোন রোগের পক্ষে সমুদ্র বায়ু মহৌষধ স্বরূপ। যাঁহারা দীর্ঘ কাল রোগ ভোগ করিয়া সমুদ্র গমন পূর্ব্বক অচিরে আরোগ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা বিশেষ অবগত আছেন, যে সাগর আমাদিগের কত কল্যাণের কারণ। জগদীশ্বরের আজ্ঞানুসারে সমুদ্র রোগির রোগ নিবারণ ও ভোগির ভোগ সাধন করিতে নিযুক্ত রহিয়াছে এবং তদ্দ্বারা কেবল সেই বিশ্বস্রষ্টা জগদীশ্বরের অনন্ত জ্ঞান ও মঙ্গলাভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছে।

বায়ু।

সৃষ্টি মধ্যে যত প্রকার জীব জন্তু আছে, সকলেরি প্রাণ ধারণের জন্য যথোচিত বায়ু সেবন করা নিতান্ত প্রয়োজন, এ প্রযুক্ত বিচিত্র শক্তিমান্ পরমেশ্বর বায়ুর এরূপ অব্যাহত গতি করিয়া দিয়াছেন, যে তাহা অনায়াসে সর্ব্বত্র সঞ্চরণ করিতে পারে। যে সকল দুর্গম্য ও সূক্ষ্ম স্থানে আমরা কোন মতেই বায়ুর গতি সম্ভব মনে করিতে পারি না, আমাদিগের দর্শনেন্দ্রিয়ের অতীত অতি সূক্ষ্ম রন্ধ্রের মধ্য দিয়া বায়ু সেই সকল স্থানে সঞ্চরণ করত কত কত জীবকে জীবিতাবস্থায় রক্ষা করে। পক্ষীজাতি কেবল নাসিকা রন্ধ্র দ্বারা নিঃশ্বাস ক্রিয়া সমাধা করে না, তাহারা পার্শ্বস্থ প্রত্যেক রন্ধ্র সমূহদ্বারাও নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া থাকে, এবং তাহাদিগের এই ঈশ্বর দত্ত শক্তি থাকাতেই তাহারা বিনাক্লেশে অতি সত্বর বেগে বায়ু সাগরে সঞ্চরণ করিতে সমর্থ হয়। তন্তুকীট* যে অবস্থায় কোষ মধ্যে কালযাপন করে, তৎ কালে সেও সেই অদৃশ্য কোষ রন্ধ্রের মধ্য দিয়া আপনার নিশ্বাস যোগ্য বায়ু প্রাপ্ত হয়। পদার্থ বিদ্যাবিৎ পণ্ডি-

---

* গুটি পোকা।

তেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, যে কোন জলের সহিত বাহিরের বাতাসের সংযোগ রহিত করিয়া দিলে, সে জলে আর মৎস্যাদি কোন জীব জীবিত থাকিতে পারে না, অতএব মৎস্যও যে জলের মধ্যে থাকিয়া জগদীশ্বরের করুণা প্রসাদাৎ বায়ু সেবন করত জীবিতাবস্থায় অবস্থান করে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

আমরা কাষ্ঠাদি দাহ্য বস্তু দগ্ধ করিয়া যে অগ্নি উৎপাদন করি, বায়ু না থাকিলে তাহাও প্রাপ্ত হওয়া কঠিন হইত। বায়ুর অভাবে কখনই অগ্নির সত্তা থাকে না। প্রজ্বলিত দীপ যদি এপ্রকার কোন পাত্র দ্বারা আবৃত করিতে পারা যায়, যে কোন মতে আর তাহার মধ্যে বায়ু প্রবেশ করিতে না পারে, তবে তাহা ক্রমে ক্রমে নির্ব্বাণ হইয়া যায়। অতএব পৃথিবীতে বায়ুর অভাব হইলে কেবল যে আমাদের নিঃশ্বাসাভাবে প্রাণবিয়োগ হইত, এমত নহে, তজ্জন্য পৃথিবীতে অগ্নিরও অভাব হইত এবং সুতরাং অগ্নির অভাবেও আমরা কোন ক্রমে জীবন যাপন করিতে পারিতাম না।

অপরাপর জড় বস্তুর যে প্রকার ভারত্ব গুণ আছে, বায়ুরও সেই প্রকার আছে, অথচ আমরা

নিরন্তর প্রচুর বায়ু রাশি মস্তকোপরি ধারণ করিয়া কখনই তাহার ভারে পীড়িত নহি। ২২ হস্ত জলের নিম্নে কোন পদার্থ অবস্থিত থাকিলে তাহার উপর যত ভার পতিত হয়, এ পৃথিবীর প্রত্যেক পদার্থই অনবরত সেই পরিমাণে বায়ুর ভার বহন করিতেছে ; কিন্তু কি আশ্চর্য্য জগদীশ্বরের কৌশল! তাহাতে মনুষ্য পশু পক্ষী জীব জন্তু প্রভৃতি কোন প্রাণীরই অপকার হইতেছে না ; মৎস্য যেমন অবলীলা ক্রমে সুগভীর সাগর গর্ভ মধ্যে সঞ্চরণ করে, আমরাও সেইরূপ অক্লেশে বায়ু সাগরের অধস্তলে সন্তরণ করিয়া ভ্রমণ করিতেছি। মৎস্য যেমন চতুর্দিকস্থ জল রাশির মধ্যে অবস্থিত থাকাতে কস্মিন্ কালে জলভারে পীড়িত হয় না, সেইরূপ আমাদিগেরও চতুঃপার্শ্বে বায়ু রাশি বিদ্যমান থাকাতে কিঞ্চিন্মাত্রও তাহার ভার বোধ হয় না। এপৃথিবীর উপর প্রতিক্ষণ যে পরিমাণে বায়ুর ভার পতিত হইতেছে, তদ্দ্বারা সংসারের কোন অপকার না হইয়া বরং বিশেষ উপকারই দর্শিতেছে। তদ্দ্বারা আমাদিগের শরীরস্থ শোণিত দেহাভ্যন্তরে অবস্থিত থাকিয়া যথানিয়মে সঞ্চালিত হইতেছে। যদি আমাদিগের শরীরোপরি অনব-

রত বায়ুরভার পতিত না হয়, তবে আমাদিগের শরীরস্থ রক্তশিরা সকল বিদীর্ণ হইয়া দেহ হইতে সকল শোণিত বহির্গত হইতে আরম্ভ হয়। বিশেষতঃ উপরিস্থিত বায়ুভারে যদি নিম্ন স্তরের বায়ু একপ ঘনীভূত না হইত; তবে কখনই আমরা সেই বায়ু দ্বারা নিশ্বাস কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিতাম না, এবং তাহা এক্ষণকার মত আমাদিগের কোন কার্য্যই সাধন করিতে সমর্থ হইত না।

পৃথিবীর সমীপবর্ত্তী বায়ু একপ ভারী হওয়াতে নদ হ্রদ সমুদ্র সরোবর হইতে জলীয় বাষ্প রাশি ঊর্দ্ধে নীত হইয়া মেঘের সৃষ্টি হয় এবং তদুপলক্ষেই লবণাক্ত সিন্ধু সলিল সংস্কৃত হইয়া পুনর্ব্বার বৃষ্টিরূপে ধরাতলে পতিত হয়। যদি কেহ অতি দূরস্থ সমুদ্র হইতে জল আনয়ন পূর্ব্বক আমাদিগের পরিশুষ্ক মরুভূমিতে সেচন করিয়া শস্য উৎপাদন করিয়া দেয়, তবে তাহাকে আমাদিগের কত দূর পর্য্যন্ত হিতৈষী বন্ধু বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু কৃপাসিন্ধু দীনবন্ধু এক বায়ুর সৃষ্টি করিয়া আমাদিগের নিয়তই সেই উপকার সাধন করিতেছেন। তিনি বায়ুকে এমনি বিচিত্র গতিশক্তি প্রদান করিয়াছেন,

করিয়া উত্তর দেশে উপস্থিত করিতেছে এবং পূর্ব্ব-সাগরের জল লইয়া পশ্চিম দেশে গমন করিতেছে

দয়াময় পরমেশ্বর আমাদিগের কেবল ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধন জন্য বায়ুকে গন্ধ বহন করিবারই শক্তি প্রদান করিয়াছেন এমত নহে, তিনি বায়ুতে এ প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র করিয়া রাখিয়াছেন, যে তদ্দ্বারা গ্রীষ্ম কালে বায়ু সন্নিকৃষ্ট জলাশয়ের জলীয় পরমাণু সমস্ত বহন করিয়া আমাদিগের স্পর্শেন্দ্রিয়েরও সুখোৎপন্ন করে এবং অনেক সময় অনেককে দারুণ পিপাসার কঠোর হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া থাকে। নিদাঘ কালে যখন আমরা প্রচণ্ড প্রভাকরের প্রখর উত্তাপে উত্তপ্ত হইয়া ত্রাহি ত্রাহি শব্দ করিতে থাকি, তখন অদৃশ্য বায়ুর পরমাণু দ্বারা পরমেশ্বর জল সেচন করিয়া আমাদিগের সেই সন্তপ্ত শরীর শীতল করেন।

বায়ুর স্পন্দনক্রিয়া দ্বারা নানা প্রকার সুমধুর ধ্বনি উৎপন্ন হইয়া আমাদিগের শ্রবণেন্দ্রিয়েরও তৃপ্তি হইয়া থাকে। কি মনুষ্য কণ্ঠোচ্চারিত সুশ্রাব্য মধুর সঙ্গীত, কি রবাব বেণু বীণা নিনাদিত স্বর মাধুরী, কি বিপিন বিহারী সুরব বিহঙ্গ কুলের সম্মোহন ধ্বনি, যে কোন শব্দ আমাদিগের কর্ণ

কুহরে প্রবিষ্ট হইয়া মনোমধ্যে সুখের সঞ্চার করে. এই বায়ু যে সকলেরি মূলাধার। কোন রূপে কোন আঘাত প্রাপ্ত হইলে বায়ু অমনি তৎক্ষণাৎ জল তরঙ্গের ন্যায় গমন করে এবং তদ্দ্বারা প্রত্যেক বায়ু পরমাণু পরস্পর প্রতিহত হইয়া ক্রমে আ-মাদিগের শ্রুতি পথে আসিয়া উপনীত হওয়াতেই আমাদিগের শব্দের অনুভব হয়। বায়ুর গতি রোধ হইলে, যে সঙ্গীতাদি কোন প্রকার শব্দেরই উৎপত্তি হইতে পারে না, তাহা সর্ব্বদাই সকলের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। বীণাদি বাদ্য কালে তাহার তারের উপর হস্তার্পণ করিলে তদ্দ্বারা প্রতিহত বায়ু পরমাণুর গতি রোধ হওয়াতে তৎক্ষণাৎ শব্দ-বন্ধ হয়, এইরূপ কোন শব্দায়মান ধাতু পাত্র স্পর্শ করিলেও অমনি তাহার শব্দ লুপ্ত হয়। অতএব বায়ু হেতুই যে আমরা সর্ব্ব প্রকার শ্রবণ সুখ লাভ করি, তাহার আর সন্দেহ নাই।

বায়ুতে প্রায় এক ভাগ অক্সিজন ও তিন ভাগ নৈত্রজন নামক বাষ্প আছে, এবং পৃথিবীর কল্যা-ণের জন্য বায়ুতে উক্ত দুই প্রকার পদার্থের ঐরূপ পরিমাণ থাকাই নিতান্ত প্রয়োজন, এই নিমিত্ত

করিয়াছেন, যে কস্মিন্ কালেও উক্ত পরিমাণের অন্যথা হইবার সম্ভাবনা নাই। তৃণ শস্যাদির উৎপত্তি দ্বারা ও মনুষ্য পশ্বাদির নিঃশ্বাসক্রিয়া দ্বারা বায়ু হইতে প্রতি দিন তাহার যে পরিমাণে অক্সিজনের ভাগ ব্যয় হইয়া যায়, দিবাভাগে বৃক্ষাদি হইতে অনবরত অক্সিজন বহির্গত হইয়া পুনর্ব্বার তাহার সেই পরিমিত অক্সিজনের ভাগ পূর্ণ করে এবং প্রতি দিন তাহার যে পরিমাণে নৈত্রজনের ভাগ ক্ষয় হয় তাহাও মনুষ্যাদি জীবজন্তুর প্রশ্বাস দ্বারা যে নৈত্রজন বহির্গত হয় তদ্দ্বারাই পূরিত হইতে থাকে। জগদীশ্বরের এই রূপ অনির্ব্বচনীয় ও আশ্চর্য্য নিয়মানুসারে বায়ু চির দিনই সমভাবে অবস্থিত রহিয়াছে এবং জীব জন্তু সকলেই সেই বায়ু সেবন করিয়া সুখেতে জীবন ধারণ করিতেছে।

উদ্ভিদ।

উদ্ভিজ্জ, যাবতীয় জীব জন্তুর জীবন স্বরূপ এবং [illegible]। এপৃথিবী তৃণ শূন্য ম- [illegible] উদ্ভিদ পদার্থ হীন হইলে যে কোন প্রকার জীব জন্তু আর এখানে জীবিত থাকিতে পারিতনা, ইহা কোন যুক্তি ও তর্ক দ্বারা প্রমাণ করিবার আবশ্যক করে না, এবিষয় সহজেই সকলের বোধগম্য হইতে পারে এবং জগদীশ্বর যদি পৃথিবীতলকে নানা জাতীয় উদ্ভিদ পদার্থ দ্বারা বিভূষিত না করিতেন, তাহা হইলেও যে ভূমণ্ডলের কিছু মাত্র সৌন্দর্য্য থাকিত না, তৃণ শূন্য বালু ভূমির সহিত সুকোমল হরিত বর্ণ শস্য ক্ষেত্রের অথবা উৎফুল্ল কুসুম লতিকা পরিপূরিত মনোহর পুষ্পোদ্যানের তুলনা করিয়া দেখিলেই সে বিষয় সকলের হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। পৃথিবীর মধ্যে এমত দেশ নাই, যে তথায় কোন একপ্রকার উদ্ভিদ পদার্থ বিদ্যমান নাই এবং এপ্রকার কোন উদ্ভিজ্জও নাই যে তদ্দ্বারা কোন একরূপ জীবের বিশেষ উপকার দর্শিতে না পারে। যে কোন উদ্ভিদ পদার্থকে আমরা অত্যন্ত অপকারী ও বিষ তুল্য মনে করিয়া নিতান্ত অগ্রাহ্য করিয়া থাকি, তাহাও

অন্য জীবের পক্ষে বন্ধু স্বরূপ হইয়া অসা-
ধারণ উপকার উৎপাদন করে। কোন কোন
বৃক্ষের সুরস ও সুমিষ্ট ফল ভোজন করিয়া বহু-
প্রকার প্রাণী প্রাণ ধারণ করিতেছে এবং কোন
কোন বৃক্ষ লতাদির সুগন্ধ পুষ্প সৌরভ আঘ্রাণ
করিয়া আমরা মহানন্দে পুলকিত হইতেছি কোন
বৃক্ষের সুশীতল ছায়াতলে উপবেশন করিয়া তপন
পীড়িত পথ শ্রান্ত পথিক গণ স্বীয় স্বীয় অঙ্গ সন্তাপ
দূর করিতেছে এবং কোন বৃক্ষের শাখা পল্লবাদির
মনোহর ভাব ও অবিরল পত্র শ্রেণীর শ্যামল কা-
ন্তি সন্দর্শন করিয়া লোকে অনুপম নেত্র সুখ লাভ
করিতেছে। যে সমস্ত [illegible] উদ্ভিজ্জাতের
ফল পুষ্প পত্রাদি দ্বারা আমাদিগের কোন সুখ
উদয় না হয়, এবং যে সকল অগ্রাহ্য অগণ্য তৃণ
গুল্মাদিকে আমরা নিত্য নিত্য পদতলে নিপীড়ন
করিয়া গতায়াত করি, তাহারাও উৎকট উৎকট
রোগের ঔষধ হইয়া সময় বিশেষে আমাদিগের
এত কল্যাণ সাধন করে যে এক এক সময় তাহাদি-
গকে প্রাণদাতা পরম হিতৈষী বলিয়া বোধ হয়।
জগদীশ্বরের মহিমা প্রভাবে অনেক উদ্ভিজ্জ যেন
চৈতন্যবান্ উৎকৃষ্ট জীবের ন্যায় বিবেচনা করিয়া

উদ্ভিদ।

ঈশ্বর পূর্ব্বক সৃষ্টির কল্যাণ সাধন করিতে বহু সৃষ্টি
করিয়া, ঋতুবিশেষে বৃক্ষ লতাদি যেন পর্য্যায়ক্রমে
আমাদিগের সুখ সাধন করিবার ভার গ্রহণ করি-
তেছে। কেহ বসন্ত কালে পুষ্পিত হইয়া স্বীয় ম-
নোহর শোভা ও উৎকৃষ্ট সৌরভ দ্বারা আমাদি-
গকে আশ্চর্য্য সুখ বিতরণ করিতেছে, কেহ গ্রীষ্ম
কালে সুপক্ক সুমিষ্ট ফল প্রদান করিয়া বহু প্রকার
জীব জন্তুকে সুখী করিতেছে। এমন কাল নাই,
যে সে কালে আমরা কোন প্রকার উদ্ভিদ পদার্থ
হইতে সুখ প্রাপ্ত না হই। ইহার মধ্যে বিশেষ
আশ্চর্য্য এই যে এক ঋতুতে যে বৃক্ষের পুষ্প শোভা
[illegible] ও [illegible] সুগন্ধ আঘ্রাণ গ্রহণ করিয়া আমরা
সুখ লাভ করিতেছি, অন্য ঋতুতে পুনর্ব্বার সেই
বৃক্ষোৎপন্ন সুস্বাদু ফল ভোজন করিয়া তুষ্ট হই-
তেছি, এক ঋতুতে যে তরুর ফল ভক্ষণ করিয়া সুখী
হইতেছি, ঋতুবিশেষে সেই তরুর সুস্নিগ্ধ ছায়ায়
[illegible] [illegible] শরীরকে শীতল করিতেছি। জগৎ
[illegible] এইরূপ [illegible] [illegible]ইচ্ছানুসারে নানা
জাতীয় উদ্ভিদ দ্বারা আমরা ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে ভিন্ন
ভিন্ন সুখ আস্বাদ লাভ করিয়া সংবৎসর কাল সুখেতে
যাপন করিতেছি।

ইহা সামান্যত সকলেই দেখিতেছেন যে বীজ অঙ্কুরিত হইতেছে, ক্রমে সেই অঙ্কুর দলিত ও পুষ্পিত হইয়া ফলশালী হইতেছে এবং কালেতে বর্দ্ধিত হইয়া প্রকাণ্ড বৃক্ষরূপে পরিণত হইতেছে। বীজ ও বৃক্ষের এই সমস্ত ব্যাপার সর্ব্বদা সন্দর্শন করিয়া আপাতত অনেকের মনে আশ্চর্য্য রসের সঞ্চার হয় না বটে, কিন্তু যিনি উহার অন্তর্ভূত নিগূঢ় তত্ত্ব সকল বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখেন, তাঁহাকে বিস্ময়ার্ণবে নিশ্চয় মগ্ন হইতে হয়। বিষম বিস্ময়কর শত শত ঐন্দ্রজালিক কুহক ক্রীড়া অপেক্ষা উদ্ভিদ সম্বন্ধীয় উল্লিখিত ব্যাপার সকল অধিক আশ্চর্য্য জনক।

কেবল বীজেতেই যে জগদীশ্বর কত প্রকার আশ্চর্য্য কৌশল সম্পাদন করিয়াছেন এবং কি অচিন্ত্য উপায় দ্বারা তাহাকে রক্ষা করিতেছেন, তাহা বর্ণন করিবার শক্য নাই। কোন ফলের শুষ্ক বীজ দেখিলে তাহার মধ্যে সঞ্জীবনী শক্তি বর্ত্তমান থাকে, আপাতত কোন মতেই সঙ্গত বোধ হয় না, কিন্তু সেই বীজের সহিত সরস মৃত্তিকার সংযোগ হইবামাত্র যেন মৃত দেহে জীবন সঞ্চারের ন্যায় সেই শুষ্ক কঠোর বীজ সজীব হইয়া উঠে। তখন

আর সে বীজ স্থির থাকেনা, বোধ হয় যেন অঙ্কুরিত হইবার উপায় চেষ্টা করে এবং তৎকালে সেই বীজ গর্ব্ভস্থ অঙ্কিত রস আপনা হইতে এমন তেজ ধারণ করে, যে সেই তেজে বীজের গাত্রাবরণ ত্বক্ বিদীর্ণ হইয়া যায় এবং উহার অধোভাগ হইতে অতিসূক্ষ্ম শিফা ও ঊর্দ্ধভাগ হইতে অঙ্কুর নির্গত হয়। উদ্ভিদতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে কোন কোন শস্যের বীজ অতি দীর্ঘ কালের পুরাতন হইলেও যদি তাহা উপযুক্ত ক্ষেত্রে বপন করা যায়, তবে সেই বীজ অন্তর্গত সঞ্জীবনী শক্তি স্বীয় ক্রম প্রকাশ করিতে আরম্ভ করে। বীজ অঙ্কুরিত হওয়া এবং সেই অঙ্কুর বর্দ্ধিত হইয়া পরিণামে প্রকাণ্ড বৃক্ষ হওয়া অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার। একটি বীজ অঙ্কুরিত হইবার জন্য যে সমস্ত মহৎ মহৎ পদার্থের একত্র সংঘটন হওয়া আবশ্যক করে, তাহা স্মরণ করিলে অবাক্ হইতে হয়। জল বায়ু তেজ মৃত্তিকা ও আলোক প্রভৃতি কতিপয় পদার্থের সাহায্য ব্যতিরেকে কোনরূপেই বীজ অঙ্কুরিত হইতে পারেনা। জল শূন্য মরুভূমিতে যেমন কোন প্রকার শস্য উৎপন্ন হয় না, বায়ু বর্জ্জিত স্থানেও সেই প্রকার কোনরূপ উ-

ভিদ পদার্থ জন্মিতে পারে না। বীজ অঙ্কুরিত হইবার জন্য আলোক এবং উত্তাপেরও যে নিতান্ত প্রয়োজন হয়, তাহারও প্রচুর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। যে বীজ অঙ্কুরিত হইবার জন্য যে পরিমিত উত্তাপের আবশ্যক হয়, তাহার ন্যূন উত্তাপ বিশিষ্ট স্থলে কখনই সে বীজ অঙ্কুরিত হইতে পারে না এবং আলোক শূন্য অন্ধীভূত কূপ কিম্বা খনি মধ্যে যে সমস্ত উদ্ভিজ্জ উৎপন্ন হয়, তাহারা কস্মিন্ কালেও স্বজাতীয় সুন্দর বর্ণ প্রাপ্ত হয় না। অতএব বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে, যে ত্রিকালজ্ঞ জগদীশ্বর একদা সংসারের সমস্ত ভাবী প্রয়োজন অবগত হইয়া তদুপযোগী সকল পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন।

প্রত্যেক বীজেরই ঊর্দ্ধ অধঃ ও মধ্য এই তিন নির্দ্দিষ্ট ভাগ আছে, উহার মধ্যে ঊর্দ্ধ ভাগ হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, অধোভাগ হইতে সূক্ষ্ম শিখা নির্গত হইয়া মৃত্তিকা প্রবেশ করে এবং মধ্য দেশে এক প্রকার রস সঞ্চিত থাকে, যে পর্য্যন্ত বৃক্ষাঙ্কুর স্বীয় শিফা দ্বারা মৃত্তিকা হইতে রস আকর্ষণ করিতে সক্ষম না হয়, সে পর্য্যন্ত ঐ বীজ আপনার গর্ভস্থ রস দ্বারা অঙ্কুরকে পোষণ করে। এই অদ্ভুত প্র-

ণালী ক্রমে বীজ অঙ্কুরিত হইয়া নানা জাতীয় বৃক্ষের উৎপত্তি হয়, কিন্তু বিশেষ আশ্চর্য্য এই যে কখন এই প্রণালীর কোন ব্যতিক্রম উপস্থিত হ-ইলে ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে অচেতন উদ্ভিদ পদার্থ ও সচেতন জীবের ন্যায় কার্য্য করিয়া তাহার প্রতিবিধান করিতে প্রবৃত্ত হয়। ক্ষেত্রেতে বীজ ব-পন করিবার সময় সকল বীজ সমভাবে পতিত হয় না, কোন বীজ প্রকৃত রূপে ঊর্দ্ধাধ হইয়া পতিত হয় এবং কোন বীজ বিপরীত ভাবেও ধরাশায়ী হইয়া থাকে কিন্তু যে সমস্ত বীজের অঙ্কুরের ভাগ অধোদিকে ও শিকার ভাগ ঊর্দ্ধদিকে হইয়া যায়, সেই সমস্ত বীজ অঙ্কুরিত হইবার অদ্ভুত ব্যাপার সন্দর্শন করিলে হতচেতন হইতে হয়। উক্ত হইতে শিকা সমস্ত নির্গত হইয়া বক্রগতি দ্বারা ক্রমে অ-ধো দিকে মৃত্তিকাভিমুখে গমন করে এবং অধো হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হইয়া ঐরূপ বক্র ভাবে ঊ-র্দ্ধাভিমুখ হয়। উহারা কেহই কখন স্ব স্ব স্থান বি-স্মৃত হয় না। কেবল বীজ অঙ্কুরিত হইবার সম-য়েতেই যে অচেতন উদ্ভিদ সকলের এই প্রকার সচেতনের ন্যায় কার্য্য প্রকাশ পায় এমত নহে, অপরাপর অনেক সময়েতেও উহারা চেতনাবান্

জীবের তুল্য কার্য্য করিয়া থাকে। মৃত্তিকার মধ্যে বৃক্ষ-মূল চালিত হইবার সময় যদি তাহার সম্মুখে প্রস্তরাদি কোন নীরস কঠিন পদার্থ প্রাপ্ত হয়, তবে সে মূল আর সে দিকে গমন না করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী সরস মৃত্তিকাভিমুখে গতি করিতে আরম্ভ করে। বীজ অঙ্কুরিত হইবার সময় যদি শিফা ও অঙ্কুর আপনা হইতে স্ব স্ব দিকে গমন করিতে না পারিত তাহা হইলে কত শত সারবতী উর্ব্বরা ভূমি নিরর্থক হইয়া পতিত থাকিত। কত সহস্র কৃষকের অসক্ষত পরিশ্রম ব্যর্থ হইত এবং কত কোটি২ কীট জীব অন্নাভাবে প্রাণ ত্যাগ করিত।

বীজ অঙ্কুরিত হওয়া যেরূপ অদ্ভুত ব্যাপার, সেই অঙ্কুর হইতে প্রকাণ্ড বৃক্ষ উৎপন্ন হওয়াও তদ্রূপ আশ্চর্য্যের বিষয়। বীজ অঙ্কুরিত হইলেই তাহার শিফা সকল মৃত্তিকা প্রবেশ করিয়া রস আকর্ষণ করিতে থাকে, কিন্তু তৎকালে ঐ ক্ষুদ্র অঙ্কুরের এ প্রকার শক্তি হয় না যে উহা ঐ সমস্ত রস জীর্ণ করিতে পারে, এই নিমিত্ত যাবৎ অঙ্কুর সমধিক বর্দ্ধিষ্ণু না হয়, তাবৎ তাহার নিম্ন দেশে শিম্বাকার দুইটি পত্র সংলগ্ন থাকে, ঐ পত্র দ্বারা শিফাকৃষ্ট সমস্ত রস জীর্ণ হয়, কিন্তু অঙ্কুর কিঞ্চিৎ

বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া রস জীর্ণ করিবার উপযুক্ত হইল
পর উক্ত দ্বিদলের প্রয়োজন থাকে না বলিয়া
তৎকালে তাহা আপনা হইতেই শুষ্ক ও পতিত
হইয়া যায়। অনন্তর সেই অঙ্কুর দিন দিন যত উ
ন্নত ও বর্দ্ধিত হইতে আরম্ভ করে, ততই তাহার
রস শোষণ করিবার শক্তি অধিক হয় এবং পরি-
ণামে সে যোজন বিস্তৃত মহা বিটপী হইলেও মূলা-
গ্রভাগ দ্বারা মৃত্তিকা হইতে রস প্রবেশ করিয়া ঐ
বৃক্ষের সমস্ত শাখা পল্লব ও পত্র পুষ্পাদিগকে
পোষণ ও বর্দ্ধন করে। কি শক্তি দ্বারা যে শাল তাল
দেবদারু প্রভৃতি মহোচ্চ পাদপ সকল মূল দ্বারা
মৃত্তিকা হইতে রস আকর্ষণ করিয়া আপনাদিগের
অগ্রভাগ পর্য্যন্ত সঞ্চালন করিতে সক্ষম হয়, তাহা
কাহার সাধ্য যে স্থির রূপে নির্দ্দেশ করে, সেই
এক অনন্ত শক্তিমান্ ঈশ্বরের শক্তি ভিন্ন ইহার
প্রতি আর অন্য কোন কারণই উপলক্ষিত হয় না।

পশু পক্ষী প্রভৃতি জীব জন্তু যে প্রকার বায়ু
দ্বারা নিশ্বাস কার্য্য সমাধা করিয়া জীবিত থাকে,
উদ্ভিদ জাতিও সেই রূপ বায়ু দ্বারা আপনাদিগের
শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিয়া জীবন ধারণ
করে। পশু পক্ষী প্রভৃতি জীব জন্তুর নিশ্বাস কার্য্য

নির্ব্বাহ, যথা জগদীশ্বর যেমন তাহাদিগকে নাসি-কা প্রদান করিয়াছেন, উদ্ভিদ জাতিকেও পরমেশ্বর সেই রূপ বায়ু গ্রহণ করিবার উপায় প্রদান করি-য়াছেন। সুশোভন শ্যামল পত্র দ্বারা যে কেবল বৃক্ষ লতাদির শোভা মাত্র বৃদ্ধি হয় এমত নহে, ঐ সমস্ত পত্র দ্বারা উদ্ভিজ্জ বর্গ প্রয়োজনোপযোগী বায়ু গ্রহণ করিতেও সমর্থ হয়। কোন প্রকার উদ্ভিদ হইতে শুদ্ধ অম্লজান এককালে রহিত করিয়া দিলে পশ্বাদির নাসা ও মুখ দ্বারা ত্যাগ করে। এ স্থলে সতত সুন্দররূপে বায়ু সঞ্চালিত হয়, সেই স্থলেই বৃক্ষাদি উত্তম রূপে বর্দ্ধিত ও সতেজ হইতে পারে। উদ্ভিদের শাখা পল্লব শিরা পত্র প্রভৃতি কোন পদার্থকেই জগদীশ্বর বৃথা সৃষ্টি করেন নাই, উহারা প্রত্যেকেই এক একটি নির্দিষ্ট প্রয়োজন সাধন করিয়া থাকে।

সামান্য তৃণ শস্যাদি হইতে রস রক্ত ও মাংসাদি উৎপন্ন হইয়া পশু পক্ষী প্রভৃতি জীব জন্তুদিগের শরীর ধারণ ও পুষ্টি বর্দ্ধন হওয়া যেমন অদ্ভুত ব্যাপার, জল বায়ু প্রভৃতি কেবল কতিপয় জড় পদার্থ দ্বারা উদ্ভিদ জাতির প্রাণ ধারণ ও পুষ্টি সাধন হওয়াও সেই রূপ আশ্চর্য্যের

বিশেষ। উদ্ভিদ বর্গ কেবল এক মৃত্তিকা হইতে রস পান ও শূন্য হইতে বায়ু ভক্ষণ করিয়া জীবিত থাকে।

এক ক্ষেত্র হইতে কটু, তিক্ত, কষায়, অম্ল, মধুর প্রভৃতি নানা রসেরই শস্য উৎপন্ন হইতেছে। এক ক্ষেত্র মধ্যে ইক্ষুও যে মৃত্তিকার রস পান করিতেছে এবং যে বায়ু সেবন করিতেছে, আম্রাতকও সেই রস ও সেই বায়ু দ্বারা প্রতিপালিত ও বর্দ্ধিত হইতেছে। কিন্তু ইহা কি অদ্ভুত ব্যাপার যে উহাদিগের মধ্যে প্রত্যেকেই স্ব স্ব জাতীয় পৃথক্ রস প্রাপ্ত হইতেছে। ইক্ষুদণ্ড প্রবিষ্ট রস মধুর হইয়া নির্গত হইতেছে, এবং আম্রাতক শরীর গত রস অম্লাস্বাদ উৎপাদন করিতেছে। এক ক্ষেত্র মধ্যে যে কি প্রকার কৌশলে বিষলতা ও সুধাসম সুস্বাদু বৃক্ষের উৎপত্তি হয়, তাহা কোন রূপেই জ্ঞান গোচর করিবার শক্তি নাই। উদ্ভিদ পদার্থের মধ্যে এ প্রকার অনেক লতা ও বৃক্ষাদি দৃষ্ট হইয়াছে যে তাহাদিগের মধ্যে পরস্পরের স্কন্ধ পত্র ও পুষ্পাদির আকারের কিছু মাত্র বৈলক্ষণ্য নাই, অথচ রস ও গুণ বিষয়ের আশ্চর্য্য ইতর বিশেষ দৃষ্ট হয়। এক বৃক্ষে বিষের গুণ ও অন্য বৃক্ষে অমৃতের

গুণ প্রকাশ পায়। এক বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিলে তাহার সুমিষ্ট সুস্বাদু রস দ্বারা শরীর শীতল হইয়া উঠে, অন্য বৃক্ষের ফল ভোজন করিলে তাহার দুর্গন্ধ ও বিস্বাদু রস দ্বারা উদরস্থ অন্নাদিও উদ্গীর্ণ হইয়া যায়। একাকার এরূপ দুই লতা আছে যে তাহাদিগের মধ্যে একটির মূল ভক্ষণ করিলে অমনি তৎক্ষণাৎ প্রাণ ত্যাগ করিতে হয় এবং অপর লতার মূল ভক্ষণ করিলে কোন ব্যাঘাতই ঘটে না। উদ্ভিদ সম্বন্ধীয় এই সমস্ত নিগূঢ় তত্ত্ব কে স্থির করিবে? এবং কোন্ ব্যক্তিই বা ঈশ্বরের মহিমার পার পাইবে?

উদ্ভিদের বংশ বিস্তার হওয়াও অল্প আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কোন কোন বৃক্ষের বীজ পশু ও পক্ষী দ্বারা নানা স্থানে নীত হয় এবং কোন বৃক্ষের বীজ নদ নদীর স্রোতে ভাসিয়াও নানা দেশে উপনীত হইয়া থাকে। এ প্রকার অনেক বৃক্ষ আছে, যে তাহার বীজ পরিপক্ক হইলে আপনা হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া ক্রোশান্তরে পতিত হয়। কোন বী-জের শিরোদেশের উপরে পক্ষীর পক্ষের ন্যায় দুইটি অবয়ব থাকে, ঐ বীজ তদ্দ্বারা বায়ু সহকারে বহু দূর গমন করিয়া পতিত হয়। এই রূপ নানা প্রকার উপায়

দ্বারা নানা জাতীয় বৃক্ষের বীজ দেশ দেশান্তর ব্যাপ্ত হইয়া স্বীয় স্বীয় বংশের বৃদ্ধি করে এবং অসংখ্য জীবের উপজীব্য হইয়া সংসারের মঙ্গল সাধন করিতে নিযুক্ত থাকে। যদি কেবল মনুষ্যকে পরিশ্রম করিয়াই সকল দেশে সকল প্রকার উদ্ভিদের উৎপত্তি করিতে হইত, তাহা হইলে অসংখ্য প্রকার জীব জন্তু অন্নাভাবে প্রাণত্যাগ করিত এবং তাহা হইলে মনুষ্যও কখন এক্ষণকার মত অনায়াসে অপর্য্যাপ্ত ফলমূলাদি প্রাপ্ত হইতে পারিত না। জগদীশ্বরের আশ্চর্য্য কৌশলের কথা কত বর্ণন করিব, কোটি শতাব্দেও তাহা শেষ হইবার নহে।

সেই কৌশলকারী পরম পুরুষ উদ্ভিজ্জ বিশেষে কৌশল বিশেষ প্রকাশ করিয়া আপনার মহিমা আরও বিস্তার করিয়াছেন। যে সকল লতা দৃঢ়তর বৃক্ষাদির ন্যায় নিরবলম্ব হইয়া স্বয়ং স্থিতি করিতে না পারে, সে সকল লতার শরীরে এক আশ্চর্য্য কৌশল দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সমস্ত লতার মধ্যে মধ্যে এক একটি গ্রন্থি থাকে এবং ঐ গ্রন্থি হইতে দুইটি অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, তন্মধ্যে একটি বর্দ্ধিত হইয়া তারের ন্যায় লতাবলম্বিত আকারে

বেষ্টন করিতে থাকে এবং অপর অঙ্কুর ক্রমে ক্রমে দলিত ও পুষ্পিত হইয়া ফল উৎপন্ন করে। চিন্তা করিয়া দেখিলে ইহা কি আশ্চর্য্য কৌশল মনে হয়! যদি উক্ত লতার গ্রন্থি হইতে ঐ প্রকার দুইটি অ-ঙ্কুর উৎপন্ন না হইত তাহা হইলে কি প্রকারে উক্ত লতা নিরবলম্বনে স্থিতি করিত এবং কি প্রকারেই বা উহা হইতে আমরা ফল ও পুষ্প প্রাপ্ত হইতাম; ইহা দ্বারা কি জগৎকর্ত্তার প্রত্যক্ষ জ্ঞান প্রতীয়মান হইতেছে না! কি কখন কোন বৃক্ষে এ প্রকার ভাব দৃষ্ট হয় না। [illegible] বা বৃক্ষের এক স্থান হই-তে এ প্রকার শাখা নির্গত হয় না! ইহা কেবল পরমেশ্বরেরই অনির্ব্বচনীয় শক্তির নিদর্শন!

গো মনুষ্য প্রভৃতি অনেক প্রাণীতেই ধান্য, যব, গোধূম প্রভৃতি নানা জাতীয় তৃণ ও তৃণোৎ-পন্ন শস্য ভোজন করিয়া প্রাণ ধারণ করে, এই নিমিত্ত ঐ সকল তৃণেতে এক অসাধারণ কৌশল দৃষ্ট হয়, যেরূপ প্রকরণ করিলে অন্যান্য উদ্ভিজ্জ নষ্ট হইয়া যায়, সেই প্রকরণ দ্বারা ঐ সকল তৃণ [illegible] সতেজ হইয়া উঠে। যে প্রান্তরের তৃণ মেষ মহিষ ও গো প্রভৃতি পশু দ্বারা প্রতি নিয়ত ভুক্ত হয়, সেই প্রান্তরেই অধিক তৃণ জন্মে ইহাতে বি-

ভক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে, যে পশ্বাদির ভক্ষণ দ্বারা তৃ-ণের হ্রাস না হইয়া আরও বরং বৃদ্ধি হয়। বিশে-ষতঃ মেষ মহিষাদির ভোজ্য দূর্ব্বা প্রভৃতি কতি-পয় তৃণকে দীর্ঘ কাল স্থায়ী করিবার জন্য জগদী-শ্বর উহাদিগকে অত্যন্ত দৃঢ় ও বহু গ্রন্থিযুক্ত করিয়াছেন। পশ্বাদিতে ঐ সকল তৃণের পত্র যত ভক্ষণ করে ততই মৃত্তিকার মধ্যে আরও উহাদিগের মূল বিস্তৃত হইতে থাকে এবং উহাদিগকে যত পদতলে নিপীড়িত করা যায়, ততই উহারা ঘন ও নিবিড় হইয়া জন্মিতে থাকে। প্রচণ্ড গ্রীষ্ম কালের প্রখর সূর্য্য উত্তাপে পর্ব্বত ও প্রান্তরজাত সমুদায় তৃণ শুষ্ক হওয়াতে তাহাদিগের আর চিহ্ন মাত্র থাকে না, কিন্তু তথাপি তাহাদিগের মূল নষ্ট হয় না, জীবিতাবস্থায় মৃত্তিকার অভ্যন্তরে অবস্থিতি করে এবং বর্ষার বৃষ্টি ধারা প্রাপ্ত হইবামাত্র পুন-র্ব্বার নূতন তেজ ধারণ করিয়া সেই সমস্ত মূল অ-ঙ্কুরিত হইতে আরম্ভ হয়।

ইয়ুরোপ খণ্ডে রোণ নদীর মধ্যে এক প্রকার আশ্চর্য্য লতা জন্মিয়া থাকে। ঐ লতা সম্বন্ধীয় দুইটি অদ্ভুত ব্যাপার মনে করিলে অবাক্ হইতে হয়। ঐ লতার মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ দুই প্রকার

জাতি ভেদ আছে, ঐ উভয় জাতীয় লতার মূল নদীর গর্ব্ভে নিবিষ্ট থাকে। কিন্তু উহার মধ্যে স্ত্রী জাতীয় লতা হইতে পদ্মনালের ন্যায় এক প্রকার মঞ্জরী উত্থিত হয় এবং তদগ্রভাগে পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া জলের উপর ভাসিতে থাকে। জগদীশ্বর ঐ স্ত্রী জাতীয় লতা মঞ্জরীতে এরূপ এক অসাধারণ শক্তি অর্পণ করিয়াছেন, যে উহা ঐ নদী জলের হ্রাস বৃদ্ধি অনুসারে স্বীয় শরীরকে উন্নত ও হ্রস্ব করিতে পারে। নদীর জল যত বৃদ্ধি হয়, ততই ঐ লতা মঞ্জরী দীর্ঘ হইয়া তদুপরি ভাসিতে থাকে এবং জল যত হ্রাস হয়, উক্ত লতা মঞ্জরীও তাহার সঙ্গে সঙ্গে তত হ্রস্ব হইতে আরম্ভ করে। অনেক সময় প্রতিদিনেই ঐ মঞ্জরীর হ্রাস বৃদ্ধি দৃষ্ট হইয়াছে। উক্ত লতিকা সম্বন্ধীয় দ্বিতীয় অদ্ভুত ব্যাপার এই যে উহার পুরুষ জাতীয় লতার পুষ্প নদীর জল মধ্যে প্রস্ফুটিত হয়, অথচ সেই পুষ্প উপযুক্ত অবস্থায় পরিণত হইলে পর স্বস্থান হইতে পরিচ্ছিন্ন হইয়া জলের উপর ভাসিতে আরম্ভ করে এবং যে স্থলে স্ত্রীজাতীয় লতা পুষ্পকে প্রাপ্ত হয়, সেই স্থানে গমন পূর্ব্বক তাহার সহিত একত্রিত হইয়া থাকে। ইহা সামান্য আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, যে

চেতন রহিত বুদ্ধিহীন জলের লতা হইয়া এরূপ অদ্ভুত প্রকারে আত্ম রক্ষা ও বীজ উৎপাদন করিয়া জগদীশ্বরের অভিপ্রায় সিদ্ধ করে। অচেতন বস্তুতে এ প্রকার চৈতন্যের কার্য্য সন্দর্শন করিয়া কাহার মনে না সেই চেতন স্বরূপ ঈশ্বরের মহিমা উদয় হইয়া উঠে?

আনেক লতা নামক এক প্রকার লতা আছে উহার মূল কখনই মৃত্তিকা প্রবেশ করে না, উহার মূলকে মৃত্তিকা প্রবিষ্ট করাইবার জন্য অনেকে অনেক প্রকার চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছেন, কিন্তু কেহই কৃত কার্য্য হইতে পারেন নাই। জগদীশ্বর ঐ লতা উৎপন্ন হইবার কি এক আশ্চর্য্য উপায় সংস্থাপন করিয়া রাখিয়াছেন। কোন বৃক্ষের সঙ্গে উহাকে ঘর্ষণ করিলেই উহা তৎক্ষণাৎ তাহাতে সংলগ্ন হইয়া যায় এবং সেই বৃক্ষ হইতে রস আকর্ষণ করিয়া জীবিত থাকে। মৃত্তিকার মধ্যে হইতে এক প্রকার উদ্ভিজ্জের পুষ্প উত্থিত হয় এবং ঐ পুষ্প কোন প্রকার পত্র বা দল দ্বারা আবৃত থাকে না। উক্ত পুষ্প গো মনুষ্যাদির পদাঘাত অথবা অপর নানা কারণ দ্বারা সর্ব্বদা নষ্ট হইবার সম্ভাবনা, অতএব অন্যান্য জাতীয় উদ্ভিজ্জের বীজ

যেমন পুষ্প গর্ভে উৎপন্ন হয়, উক্ত উদ্ভিদের বীজও যদি সেই রূপ পুষ্প মধ্যে জন্মিত; তাহা হইলে উক্ত জাতীয় পুষ্প সংসার হইতে লুপ্ত হইয়া যাইত। কিন্তু জগদীশ্বর উহার বীজ রক্ষা পাইবার এক আশ্চর্য্য উপায় করিয়া দিয়াছেন। উহার বীজ [illegible] অভ্যন্তরে বৃক্ষের মূল মধ্যে উৎপন্ন হয়, [illegible] কোন কারণে পুষ্প নষ্ট হইলেও উহার নষ্ট হয় না। বীজ রক্ষার এ প্রকার কৌশল আর কোন উদ্ভিদেতেই দৃষ্ট হয় না। [illegible] বীজ [illegible] হইলেই তাহা বৃক্ষ হইতে [illegible] মৃত্তিকায় পতিত হয়। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, যে বৃক্ষ উৎপন্ন হইবার যে ঋতু নির্দিষ্ট আছে, সে ঋতু ভিন্ন কখনই তাহার বীজ অঙ্কুরিত হয় না। কোন কোন বৃক্ষাদির বীজ প্রায় সম্বৎসর কাল মৃত্তিকার মধ্যে নিদ্রাগ্রস্ত হতচেতনের ন্যায় [illegible] থাকে, পরে আপনার উপযুক্ত কাল [illegible] যেন সচেতন হইয়া অঙ্কুরিত হইবার উদ্যোগ [illegible] করে। যে সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুষ্প [illegible] এবং অবধি সম্বৎসরের মধ্যেই পুষ্পিত ও ফলিত হইয়া নষ্ট হয়, তাহারা যেন কোন নাটকের নটের ন্যায় স্ব স্ব পর্য্যায়ানুসারে সংসার স্বরূপ রঙ্গ ভূমিতে আসিয়া

উদয় হইয়া থাকে। গাঁদা চন্দ্রমল্লিকা প্রভৃতি শীত ঋতুর পুষ্প বৃক্ষ সকল শীতের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে উৎপন্ন হইয়া সমস্ত শীত ঋতু সংসারের শোভা সম্পাদন করিয়া পরে অন্তর্হিত হয় এবং অবশিষ্ট সকল ঋতুতে আমাদিগের নিকট অদৃষ্ট থাকিয়া পুনর্ব্বার শীতারম্ভে উদয় হয়, এই রূপ গ্রীষ্ম ঋতুর কোন কোন উদ্ভিজ্জ গ্রীষ্ম কাল মাত্র ভোগ করিয়া প্রস্থান করে, পুনর্ব্বার গ্রীষ্মের আগমন সন্দর্শনে আমাদিগের নিকট আবির্ভূত হয়।

উদ্ভিদ সম্বন্ধে করুণাময় পরমেশ্বর আর যে একটি অদ্ভুত কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন, এস্থলে তাহা উল্লেখ না করিয়া কোন ক্রমেই নিরস্ত হওয়া যায় না। অনেকানেক ফলের মধ্যে যে পদার্থ দ্বারা বীজের পুষ্টি সাধন ও শরীর বর্দ্ধন হইয়া থাকে পরিণামে সেই পদার্থ সুমধুর রসময় উপাদেয় খাদ্য হইয়া বহুল প্রাণীর জীবিকা নির্ব্বাহ করে। পরীক্ষা দ্বারা স্থির হইয়াছে, যে নারিকেলে প্রথমতঃ জলের সঞ্চার না হইলে কখনই তন্মধ্যে শস্যের উৎপত্তি হইত না এবং শস্য না হইলেও কখন উক্ত ফলের উৎপাদিকা শক্তি থাকিত না। অতএব বিলক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে, যে সংসারের বহু প্রয়োজন সিদ্ধ

করিবার উদ্দেশে জগদীশ্বর এক একটি পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছেন। তাল খর্জ্জুর আম্র পনশ বদরী প্রভৃতি নানা জাতীয় সুখাদ্য ফলের যে যে অংশ আমরা সুখেতে ভোজন করিয়া তৃপ্তি লাভ করি, তাহা প্রথমতঃ ফল মধ্যে উৎপন্ন হইয়া বীজকে পোষণ করিতে থাকে, অনন্তর যখন বীজ পোষণের কা[illegible]শেষ হইয়া যায়, তখন সেই সমস্ত ভাগ সূর্য্য [illegible] ও অন্যান্য কারণ দ্বারা প্রকারান্তরে পরিণত হইয়া জীব জন্তুর ভোজন যোগ্য হইয়া উঠে।

ষ্ট্ই দগ্ধ হইতেছে না। জগদীশ্বর! তুমি যদি করুণা করিয়া জ্যোতিঃ পদার্থকে এ প্রকার সূক্ষ্মতম অণুবিশিষ্ট ও সমধিক বিস্তৃত না করিতে, তাহা হইলে কি আমরা নিমেষ মাত্রও সুস্থ শরীরে সময় করিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমরা সূর্য্য কিরণে কোন্ কালে চূর্ণ ও ভস্মীভূত হইয়া যাইতাম। যে সমস্ত ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর ভৌতিক পদার্থ দ্বারা আমাদিগের অশেষ প্রকার অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা, তোমার মঙ্গলময় ব্যবস্থানুসারে তদ্দ্বারাও আমাদিগের অশেষবিধ উপকার দর্শিতেছে।

জ্যোতির পরমাণু পরস্পর পরস্পরকে বিক্ষেপ করে, কখনই কেহ কাহারও সহিত সংযুক্ত হয় না, সুতরাং আলোকের কিছুমাত্র গুরুত্ব অনুভূত হয় না। জ্যোতির গুরুত্ব থাকিলে পৃথিবীর সকল পদার্থই উহার ভারে প্রপীড়িত হইত।

ইহা সকলেরি বিদিত আছে, যে জ্যোতিই আমাদিগের দর্শন কার্য্যের প্রধান কারণ। পৃথিবীতে আলোক থাকাতেই আমরা সৃষ্ট পদার্থ সকল দেখিতে পাই। পরমেশ্বর জ্যোতির সহিত দর্শনেন্দ্রিয়ের অতি আশ্চর্য্য সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন, তিনি যদি জগতে জ্যোতির সৃষ্টি না করি-

তেন, তাহা হইলে আমাদিগের দর্শনেন্দ্রিয় বিফল হইত এবং দর্শনেন্দ্রিয় সৃষ্ট না হইলেও জ্যোতির সৃষ্টি নিরর্থক হইত। যে দর্শন ক্রিয়া আমাদিগের জ্ঞানলাভের ও সুখভোগের প্রধান হেতু, পৃথিবীতে আলোকের অভাব হইলে সে দর্শনক্রিয়ার-ও অভাব হইত। পৃথিবী আলোক শূন্য তমসাচ্ছন্ন হইলে যে আমাদিগকে কিপর্য্যন্ত দুঃখভোগ করিতে হইত, তাহা নয়ন বিহীন অন্ধ ব্যক্তিই বিশেষ অবগত আছে। আমরা বিশ্বরাজ্যে বিচিত্রবর্ণের পদার্থ সন্দর্শন করিয়া নেত্ররঞ্জন করিতেছি। আমরা কখন সুপক্ক শস্যক্ষেত্রের মনোহর পীত বর্ণ সন্দর্শন করিয়া সুখী হইতেছি, কখন নবীন জলধরের প্রগাঢ় শ্যামল বর্ণ অবলোকন করিয়া চিত্তের বিনোদ জন্মাইতেছি, কোন সময় বিস্তীর্ণ সাগরের নীলোজ্জ্বল সলিল শোভা অবলোকন করিয়া তৃপ্ত হইতেছি, কখন বা বিপিনবিহারী বিচিত্র প্রকার বিহঙ্গদলের আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া আনন্দলাভ করিতেছি। আমরা কখন সরোবর শায়ী সুরম্য ইন্দীবরের নীল আভা অবলোকন করিয়া পুলকিত হইতেছি এবং কখন কোকনদের লোহিত কান্তি নেত্রগোচর করিয়া বি-

শোন তৃপ্তি লাভ করিতেছি, কিন্তু কেবল এক জ্যোতিঃ পদার্থ প্রভাবে এই সমুদায় সুচারু বর্ণের উৎপত্তি হইতেছে এবং আমরা নানা সময় নানা প্রকার নেত্রসুখ লাভ করিতেছি। পৃথিবীতে আলোক না থাকিলে যেমন আমরা কোন পদার্থই দেখিতে পাইতাম না, সেই রূপ আলোক অভাবে কোন প্রকার বর্ণেরই উৎপত্তি হইত না। সূর্য্য হইতে যে কিরণ পতিত হয়, তাহা সামান্যতঃ এক বর্ণের দেখায়, কিন্তু বস্তুতঃ এক বর্ণের নহে, তাহাতে সাতটি বিভিন্ন প্রকার বর্ণ বিদ্যমান আছে, পদার্থ বিদ্যাবিৎ পণ্ডিতেরা এক প্রকার ত্রিকোণ ও ত্রিভুজ বিশিষ্ট স্থূলকাচ দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, যে সূর্য্য কিরণে যে সকল প্রকার বর্ণ আছে, তাহা ঐ কাচে পৃথক হইয়া পতিত হয়। আলোক দৃষ্ট পদার্থ স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে ঐ সূর্য্য কিরণস্থিত এক এক প্রকার বর্ণ হইতে এক এক প্রকার বর্ণ প্রাপ্ত হয়। সৃষ্টি মধ্যে কীট পতঙ্গ পশু পক্ষী প্রভৃতি যত প্রকার পদার্থ আছে, সকলেই আপন আপন স্বভাবানুসারে আলোক হইতে এক এক প্রকার বর্ণ পাইয়া থাকে, অতএব বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে, যে জগদীশ্বর জগতে এক জ্যো-

ভিন্ন সৃষ্টি করিয়া আমাদিগকে বিচিত্র প্রকার বর্ণ সন্দর্শন সুখে সুখী করিয়াছেন। কোন পণ্ডিত ব্যক্ত করিয়াছেন, যদি একবার স্থিরচিত্তে আলোকের রচনা নৈপুণ্য ভাবিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। কাহার সাধ্য যে এক মাত্র জ্যোতিঃ পদার্থ হইতে ভূমণ্ডলস্থ যাবতীয় বর্ণের উৎপত্তি করিতে পারে! বিশেষতঃ সাতটি পৃথক পৃথক বর্ণের যোগে আলোকের উৎপত্তি হইয়াছে, কিন্তু উহার সংযোগ ও মিশ্রণের তাৎপর্য্য অনুসারে আমরা সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্মান্ পদার্থ হইতে চির দিনই নির্ম্মল পরিষ্কৃত আলোক প্রাপ্ত হইতেছি।

আলোক হেতু বিবিধ প্রকার ফল শস্যাদি আস্বাদবন্ত হয় এবং নানা জাতীয় পত্র পুষ্পাদির সৌগন্ধি জন্মে। সম্পূর্ণ জ্যোতির্ব্বিহীন স্থানে বীজ অঙ্কুরিত হওয়াই কঠিন, যদিও কোন কৌশলে বীজকে অঙ্কুরিত করিতে পারা যায়; তথাপি তদুৎপন্ন বৃক্ষ কি লতা স্বজাতীয় বর্ণ প্রাপ্ত না হইয়া বিকৃত ও বিবর্ণ হয় এবং কোন পুষ্পে কি ফলে উপযুক্ত রূপ আলোক না লাগিলে তাহারা যথা সম্ভব সৌরভ ও স্বাদ বিশিষ্ট হয় না। আধুনিক

পদার্থ বিদ্যা দ্বারা প্রকাশ পাইয়াছে, যে,কোন প্রকার উদ্ভিদের উৎপত্তি ও তাহা ফল পুষ্প বিশিষ্ট হইবার জন্য যেমন কিয়ৎ পরিমাণ উত্তাপের আবশ্যক হয়, সেই রূপ সম্ভবমত আলোকেরও প্রয়োজন হইয়া থাকে। আলোকভিন্ন কেবল উত্তাপ দ্বারা প্রায় কোন প্রকার উদ্ভিদই প্রকৃত রূপে কুসুমিত ও ফলশালী হয় না। আলোক যেমন জগদীশ্বরের উদ্ভিদ রাজ্যের নানা প্রকার কল্যাণ সাধন করিতেছে, সেইরূপ আলোক হইতে বহু প্রকার জীব বহুবিধ উপকার প্রাপ্ত হইতেছে, আলোকাভাবে জীব শরীরও ক্রমে বিবর্ণ ও বিকৃত হইয়া যায়, আলোক মনুষ্যজাতির মনোহর শ্রীকেও উজ্জ্বল করে। মনুষ্য যদি দীর্ঘকাল আলোক শূন্য অন্ধকারময় স্থানে বাস করে; তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে তাহার শ্রীর অনেক হ্রাস হয়।

আমরা উত্তাপ বিশিষ্ট সূর্য্য কিরণ হইতে যে উপকার প্রাপ্ত হইতেছি, তাহা সংক্ষেপে কীর্ত্তন না করিয়া কোন মতে ক্ষান্ত হইতে পারা যায় না। ইহা সর্ব্বতোভাবে স্থির হইয়াছে, যে ব্রহ্মাণ্ডে উত্তাপ না থাকিলে ব্রহ্মাণ্ডস্থ স্থল জল যাবতীয় পদার্থ পাষাণ পিণ্ডবৎ একত্র সংহত ও কঠিন হ-

ইয়া থাকিত। ভূমণ্ডলের মৃত্তিকা-রাশি পাষাণ সদৃশ কঠিন হইত এবং প্রশস্ত প্রশস্ত সমুদ্র সকলও তুষার দ্বীপবৎ পতিত থাকিত। কি ভূলোক কি দ্যুলোক ব্রহ্মাণ্ডের যত দূর পর্য্যন্ত অবগত হইতে পারাগিয়াছে, তাহার সর্ব্বত্রই সকল পদার্থের আকর্ষণ শক্তি দৃষ্ট হইয়াছে, প্রত্যেক পদার্থই আপনার নিকটতর ও আপনার অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর পদার্থকে আকর্ষণ করিতে পারে, সুতরাং বিশ্বক্ষেত্রের সর্ব্বত্র কেবল এক আকর্ষণ শক্তির প্রভাব থাকিলে তদন্তর্গত বস্তু সকল এক স্থানে আকৃষ্ট হইয়া পাষাণ পিণ্ডবৎ হইয়া থাকিত, সন্দেহ নাই। ব্রহ্মাণ্ডের বর্ত্তমান অবস্থার জন্য ঐ আকর্ষণী শক্তির কোন প্রতিবিধানী কর্ত্তা থাকা নিতান্ত আবশ্যক, আমরা উত্তাপে ঐ আকর্ষণের প্রতি-বিধায়িনী শক্তি দেখিতে পাই, উত্তাপ কোন পদার্থকে সংহত ও কাহার সহিত সংযুক্ত হইতে দেয় না, উহা সকল কঠিন পদার্থের পরমাণু সকল পৃথক করিয়া তরলাবস্থায় পরিণত করে এবং তরল পদার্থকে বাষ্প করিয়া থাকে। জগদীশ্বর উত্তাপের সৃষ্টি করাতে আমরা সংসার মধ্যে সলিলাদি তরল পদার্থ প্রাপ্ত হইয়া জীবন ধারণ

করিতেছি এবং বাষ্প দ্বারা নানা প্রকার মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিতেছি। উত্তাপ দ্বারা আমরা যা-বতীয় সুপক্রিয়া ও রসায়ন ব্যাপার সম্পন্ন করিয়া আপনাদিগের সুখ সাধন ও সংসারের শ্রী সম্বর্দ্ধন করিতেছি এবং উত্তাপ দ্বারা বিবিধ প্রকার ফল শস্যাদি সুপক্ক হইতেছে। অতএব উত্তাপ বিশিষ্ট সূর্য্য কিরণাদি দ্বারা আমরা যে সকল রাশি রাশি উপকার প্রাপ্ত হইতেছি, তাহা বর্ণন করিয়া শেষ করা অসাধ্য। যিনি কৃপা করিয়া ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে এই অশেষ মঙ্গলকর জ্যোতির সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই জ্যোতির জ্যোতি পরম জ্যোতিকে কৃতজ্ঞ চিত্তে প্রণিপাত করি।

জীবিকা বিধান।

প্রাণী-বিদ্যা-পরায়ণ পণ্ডিতেরা পরীক্ষা দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, যে কি জল, কি বায়ু, কি পর্ব্বত, কি বন, কি পুষ্প, কি লতা সর্ব্বস্থানই প্রাণী পুঞ্জে পরিপুরিত রহিয়াছে। এক বিন্দু মাত্র জলে লক্ষ লক্ষ কীটাণু ক্রীড়া করিতেছে, এক অঙ্গুলি পরিমিত স্থানের মধ্যে রাশি রাশি জীব বিচরণ করিতেছে, এবং এক বিন্দু মধুর মধ্যে অগণ্য অগণ্য কীটাণু দৃষ্ট হইয়াছে, অতি ক্ষুদ্র পুষ্পরেণু মধ্যেও জীবপুঞ্জ বাস করিতেছে এবং বৃক্ষ শাখা ও বৃক্ষ পত্র হইতেও অসংখ্য জীব প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। কত প্রস্তর খণ্ড দ্বিধা করিবার সময়ে তন্মধ্য হইতে অসংখ্য কীট নির্গত হইয়াছে, কত বৃক্ষস্কন্ধ ছেদন করিবার কালে তাহার মধ্যেও ক্ষুদ্র কীট দৃষ্ট হইয়াছে এবং কত কূপখনি খনন কালেও গভীর ভূগর্ভ মধ্যে কোটি কোটি কীটাণু প্রকাশ পাইয়াছে। যে স্থানে জীব নাই এ মর্ত্ত্যলোকে এমত স্থানই অপ্রসিদ্ধ। কিন্তু ঈশ্বরের কি আশ্চর্য্য কৌশল! সেই সমস্ত জীবই স্ব স্ব স্থানে অবস্থান করিয়া উপযুক্ত মত স্বীয় স্বীয় জীবিকা লাভ করিতেছে এবং সুখেতে জীবন যাপন করিতেছে।

মৎস্য কচ্ছপ কুম্ভীর প্রভৃতি জলচর সমস্ত চির জীবন জলেতে অধিবাস করিয়া আপন প্রয়োজনোপযোগী আহার প্রাপ্ত হইতেছে। সুবিস্তীর্ণ সাগর মধ্যে প্রকাণ্ড তিমি মৎস্যও তাহার যথোপযুক্ত খাদ্য প্রাপ্ত হইয়া প্রাণ ধারণ করিতেছে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয়ের সামান্য জলচর সমস্তও আপনাদিগের আহার লাভ করিয়া জীবিত রহিয়াছে। জলের মধ্যে যে কত প্রকার প্রাণী আছে, তাহার সংখ্যা করা অসাধ্য, কিন্তু সে সকলেরই জীবন ক্রিয়া সেই জলেতে নির্ব্বাহিত হইতেছে। জলচরের মধ্যেও তৃণাহারী এবং মাংসাহারী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতি আছে, কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে তাহাদিগের মধ্যে যে জাতি যে স্থলে থাকিলে আপনাদিগের অপর্য্যাপ্ত আহার পাইতে পারে, দয়ার সাগর পরমেশ্বর তাহাকে সেই স্থলে বাস করিবারই সম্পূর্ণ উপযুক্ত প্রকৃতি প্রদান করিয়াছেন। যে সমস্ত জলজীব শৈবালক প্রভৃতি অম্বুলতা ভক্ষণ করিয়া প্রাণ ধারণ করে, তাহারা হ্রদ, পুষ্করিণী, বিল প্রভৃতি বদ্ধ জলাশয় ভিন্ন, কদাপি স্রোতস্বতী নদী মধ্যে বাস করে না এবং কুম্ভীর প্রভৃতি মাংসভুক্ জল জন্তু সকলও কদাপি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয়ে

থাকিতে পারে না। মৎস্যাদি অনেক জলজন্তু, সন্তান কি ডিম্ব প্রসব করিয়া তাহার সহিত এক কালে নিঃসম্বন্ধ হয়, কিন্তু বিশ্বপতির বিশ্ব সঞ্চারিণী দয়া সেই জল মধ্যে উপস্থিত হইয়া সেই সমস্ত পরিত্যক্ত ও নিরাশ্রিত ক্ষুদ্র প্রাণীদিগের জীবিকা প্রদান পূর্ব্বক প্রাণ রক্ষা করে। জগদীশ্বরের বিশ্ব-রাজ্য মধ্যে যেমন জলচর সমস্ত জলেতে থাকিয়া স্বীয় স্বীয় প্রয়োজনোপযোগী জীবিকা প্রাপ্ত হইয়া জীবন ধারণ করিতেছে, সেইরূপ অসংখ্য প্রকার ভূচর জীব স্থলেতে অধিবাস করিয়া তাঁহার দ্বারা প্রত্যহ প্রতিপালিত হইতেছে। নিবিড় অরণ্য মধ্যে সিংহ ব্যাঘ্র ভল্লুকাদি মাংসভুক্‌ সবল পশু সকলও প্রতিনিয়ত তাঁহার হস্ত হইতে আহার প্রাপ্ত হইতেছে, এবং গো মহিষ মৃগ প্রভৃতি তৃণা-হারী পশুদিগের প্রাণ ধারণের জন্যও তাঁহার অ-নুমত্যনুসারে রত্নগর্ভা পৃথিবী নিত্য নিত্য নবতৃণ প্রসব করিতেছে। তাঁহার প্রসাদে হস্তী অশ্ব উষ্ট্র, প্রভৃতি বৃহদাকার পশু সকলও আপনাদিগের উ-দর পূরণ করিয়া জীবিত রহিয়াছে, এবং তাঁহার প্রসাদাৎ পিপীলিকা প্রভৃতি ক্ষুদ্র প্রাণী সমস্তও আহার প্রাপ্ত হইয়া প্রাণ ধারণ করিতেছে। তিনি

একটি জীবকেও বিস্মৃত নহেন, সকলকেই সম দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া জীবিকা বিতরণ করিতেছেন। এক অরণ্য, এক পর্ব্বত ও এক প্রান্তর মধ্যে অসংখ্য প্রকার প্রাণী বাস করিয়া সকলেই তাহার মধ্য হইতে স্ব স্ব প্রয়োজনোপযোগী ভক্ষ্য ভোজ্য প্রাপ্ত হইতেছে, কেহ তৃণ আহার করিতেছে, কেহ পর্ণ ভোজন করিতেছে, কেহ বা ফল দ্বারা উদর পূর্ত্তি করিতেছে, এবং কেহ শুষ্ক মৃত্তিকাবলম্বন করিয়াও জীবিত রহিয়াছে। কি আশ্চর্য্য ! পশুরা জ্ঞানহীন হইয়াও আপনাদিগের পরিত্যাজ্য আহার ত্যাগ পূর্ব্বক ভোজ্য দ্রব্য ভোজন করিয়া সুখেতে কাল হরণ করিতেছে। যে সমস্ত পশু কস্মিন্ কালে এক স্থানে স্থিতি করে না এবং যে সকল পক্ষি নিরন্তর নানা স্থানে ভ্রমণ করে, ঈশ্বরের আজ্ঞা প্রতিপালনার্থ তাহারা কারারুদ্ধ বন্দির ন্যায় এক স্থানে স্থায়ী হইয়া আপন আপন শাবক ও সন্তান প্রতিপালন করে। পক্ষি শাবক, যাবৎ না স্বয়ং আহার করিতে পারগ হয়, তাবৎ তাহার জনক জননী প্রাণ পণে তাহাকে উপযুক্ত আহার প্রদান করিতে নিযুক্ত থাকে। শৃগালাদি পশুগণ নিরন্তর বিবর বদ্ধ থাকিয়া, আপন সন্তান

গণকে স্তন্য পান করায়। দোহনকালে গাবী, বৎসের জন্য স্বীয় স্তনে দুগ্ধ সঞ্চয় করিয়া রাখে, হস্তী, করভের জন্য মুখ মধ্যে আপন ভোজ্য বিভাগ করিয়া রক্ষা করে, উইচুঙ্গাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট যে স্থানে স্ব স্ব জাতির উপযুক্ত জীবিকা দেখে, সেই স্থানেই ডিম্ব পরিত্যাগ করে এবং সেই ডিম্ব হইতে যে সমস্ত কীটাদি উৎপন্ন হয়, তাহারা সেই স্থানেই আপন আহার প্রাপ্ত হইয়া বর্দ্ধিষ্ণু হইতে থাকে। স্থলচর ও জলচর মধ্যে কোন কোন জীবকে পরমেশ্বর এ প্রকার আশ্চর্য্য শক্তি প্রদান করিয়াছেন যে তাহারা প্রয়োজন মতে স্থল জল উভয়েতেই সঞ্চরণ করিতে পারে। সিন্ধু ঘোটক প্রভৃতি কোন কোন জীব অধিক কাল জলবাসী হইয়াও প্রয়োজন মত স্থলেতে গমন পূর্ব্বক আহার লাভ করে এবং জলমার্জার প্রভৃতি কয়েকটি জন্তু দীর্ঘকাল স্থলেতে বাস করিয়াও ইচ্ছানুসারে জলমগ্ন হইয়া মৎস্যাদি ধারণ করিতে পারে। পানিকৌড়ি প্রভৃতি অনেক প্রকার আমিষাশী খেচর পক্ষিকেও জগদীশ্বর নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া জলেতে মগ্ন থাকিবার শক্তি প্রদান করিয়াছেন। সংসার মধ্যে সকল ঋতুতে সকল জীবের সমান উপজীব্য উপস্থিত

থাকে না, একারণ যে কালে যে জীবের সমধিক আহার প্রস্তুত হয়, সেই সমস্ত জীব সেই কালেই অধিক উৎপন্ন হইয়া থাকে। গ্রীষ্ম কালে এপ্রকার অনেক জীব জন্মায়, যাহারা বর্ষার প্রারম্ভে এক কালে অদৃশ্য হয়, এবং বর্ষাকালে এরূপ অনেক প্রাণী উৎপন্ন হয়, যাহারদিগকে আর শীত কালে দেখিতে পাওয়া যায় না, এবং শীত ঋতু ও বশন্ত ঋতুতেও এইরূপ অনেক প্রকার বিশেষ বিশেষ প্রাণী প্রত্যক্ষ করা যায়। কিন্তু সর্ব্বত্র সকল কালে এ পৃথিবী প্রাণী পুঞ্জে পরিপূর্ণ থাকে বলিয়া দয়ার নিধান জগদীশ্বর কোন কালে তাঁহার অক্ষয় ভাণ্ডার ধরণীকে শূন্যা করেন না। এ পৃথিবীতে এমন স্থান নাই যে, সে খানে কোন এক প্রকার জীবের উপজীব্য বিদ্যমান নাই এবং এমন কালও নাই যে কালে কোন প্রকার জীবের জীবিকা উৎপন্ন না হয়। তাঁহার জীব প্রতিপালন বিষয়ক আশ্চর্য্য কৌশলের কথা চিন্তা করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। এক পাত্র অন্ন লইয়া অসংখ্য লোককে ভোজন করাইলেও যদি তাহার কখন শেষ না হয়, তবে সে আশ্চর্য্য ব্যাপার দৃষ্টে কে না মুগ্ধ হইবেক! কিন্তু জগদীশ্বরের কৌশল তদপেক্ষা অধিক

আশ্চর্য্য, তিনি জীব প্রতিপালন জন্য পৃথিবীতে প্রথমতঃ যে অন্নের সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই অন্ন ক্রমাগত সকল জীবের জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া বর্ষে বর্ষে উদ্ধৃত্ত হইয়া আসিতেছে, কোন কালেই তাহার শেষ নাই, দিন দিন জীব সংখ্যা যত বৃদ্ধি হইতেছে, অন্নের পরিমাণও সেইরূপ অধিক হইতেছে। অতএব তাঁহার মহিমা কে বুঝিবে? তিনি উষ্ণ দেশে অপর্য্যাপ্ত শীতল ফল শস্যের সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন এবং শীত প্রধান দেশে এরূপ ফল মূলের সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহা ব্যবহার করিলে শরীরের সমুচিত উষ্ণতা রক্ষা করিতে পারা যায়।

বিশেষত অন্ন প্রদান বিষয়ে তিনি মনুষ্যের পক্ষে যে রূপ করুণা প্রকাশ করিয়াছেন, সেরূপ আর কোন জীব জন্তুতেই দৃষ্ট হয় না। অপরাপর জীবের ন্যায় মনুষ্যকে সকল সময় উদরান্ন আসাদনের জন্য ব্যস্ত থাকিতে হয় না। জগদীশ্বর, ক্ষেত্র ও বীজের যে প্রকার পরস্পর সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন, এবং মনুষ্যকে যে প্রকার বুদ্ধি সাধ্য প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে একজন মনুষ্য অতি অল্পকাল পরিশ্রম করিলে এত প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয়, যে তাহা বহু লোকে সম্বৎসর কাল

ভোজন করিয়া অনায়াসে কাল যাপন করিতে পারে। ঈশ্বরের এই করুণাই মনুষ্য জাতির অশেষ সৌভাগ্যের মূল। এই করুণা হেতু মনুষ্য অবশিষ্ট কাল জ্ঞান ধর্ম্মের আলোচনায় ক্ষেপণ করিতে সমর্থ হইতেছে, এবং শিল্পাদি নানা বিদ্যার অনুষ্ঠান করিয়া সংসারের নানা প্রকার শ্রীবৃদ্ধি করিতেছে, এই হেতু বাল বৃদ্ধ অন্ধ খঞ্জ প্রভৃতি উপায় বিহীন অনেক লোকে অন্ন প্রাপ্ত হইয়া জীবন ধারণ করিতেছে। যদি পশু পক্ষির ন্যায় মনুষ্যকে সর্ব্বদা উদর পোষণের জন্য ব্যস্ত থাকিতে হইত, তবে কোথায় বা অপূর্ব্ব মঠ মন্দির অট্টালিকা ময় শোভন নগরের শোভা, কোথায় বা জ্ঞান ধর্ম্মের প্রচার, কোথায় বা সুরসিকা সঙ্গীত বিদ্যার মধুরালাপ থাকিত? সুখ গুণ এসকলই বঞ্চিত হইত। অতএব তাঁহার পালন শক্তির বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে মনুষ্যকেই তাঁহার নিকট অধিক কৃতজ্ঞ হইতে হয়। যখন তিনি আমাদিগের প্রতি সদয় হইয়া জীবিকা লাভের এমত সুলভ উপায় বিধান করিয়াছেন, তখন সর্ব্বদা কেবল অন্নের নিমিত্ত চিন্তিত হইয়া তাঁহাকে ভুলিয়া থাকা কখনই আমাদিগের কর্ত্তব্য নহে।

জীব বিশেষে কৌশল বিশেষ।

গো, মৃগ এবং মেষ প্রভৃতি যে সকল চতুষ্পাদ জন্তুর মুখমধ্যে অশ্বাদির ন্যায় দুই পংক্তি দন্ত নাই, উহারা স্বীয় স্বীয় ভোজ্য দ্রব্য এক কালে সুন্দররূপে চর্ব্বণ করিয়া উদরস্থ করিতে পারে না, এজন্য পরমেশ্বর উহাদিগকে রোমন্থ করিবার এক অদ্ভুত শক্তি অর্পণ করিয়া চর্ব্বণ ক্লেশের প্রতীকার করিয়া দিয়াছেন। উক্ত পশুদিগের রোমন্থ ক্রিয়া এক আশ্চর্য্য ব্যাপার, উহাদিগের ঐ শক্তি না থাকিলে কোন রূপেই উহারা জীবন ধারণ করিতে পারিত না। গো কি মেষ প্রভৃতি রোমন্থকারী পশুরা যৎকালে তৃণাদি ভক্ষণ করে, তৎকালে সেই সমস্ত তৃণ পর্ণ প্রায় স্বাভাবিক অবস্থাতেই উহাদিগের উদরস্থ হয়, অনন্তর উহাদিগের পাকস্থলী প্রবিষ্ট হইয়া কিঞ্চিৎ আর্দ্র ও কোমল হইলে, পরে উক্ত পশুরা সেই সমস্ত রসার্দ্র ও কোমল তৃণাদি উদ্গার করিয়া পুনর্ব্বার মুখমধ্যে আনয়ন পূর্ব্বক চর্ব্বিত চর্ব্বণ করিতে থাকে, এবং তাহা উত্তমরূপ চূর্ণ ও পিষ্ট হইলে পরে অল্পে অল্পে উদরস্থ করে। এই রূপ অদ্ভুত প্রণালীক্রমে রোমন্থকারী পশুদিগের ভোজ্য দ্রব্য সকল যথোপযুক্ত রূপে

জীর্ণ হইয়া রস রক্ত রূপে পরিণত হয় এবং উহা- দিগকে জীবিতাবস্থায় রক্ষা করে। মেষ প্রভৃতি কতিপয় পশুর রোমন্থ করিবার শক্তি না থাকিলে যে কখনই উহাদিগের জীবন রক্ষা পাইত না, তাহা পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে। মেষ জাতির পাকস্থলীর এপ্রকার শক্তি নাই, যে তদ্দ্বারা কোন ক্রমেই অপিষ্ট তৃণ পর্ণাদি জীর্ণ হইতে পারে। কতুক জলেতে সিক্ত হইলে তৃণাদির যে প্রকার অবস্থা হয়, মেষাদির উদরস্থ পাকরস দ্বারাও প্র- থমতঃ উহাদিগের ভুক্ত তৃণাদির সেই প্রকার ভাব হইয়া থাকে, পরে যখন উহারা রোমন্থ ক্রিয়া দ্বারা সেই সমস্ত তৃণাদিকে চর্ব্বিত চর্ব্বণ করিয়া পুনর্ব্বার উদরস্থ করে, তখন উহাদিগের পাক শক্তির ক্রম দ্বারা সেই সমস্ত তৃণাদি এমনি সূক্ষ্মরূপে জীর্ণ হয় যে তাহাদিগের শিরা প্রভৃতি অত্যন্ত কঠি- নাংশপর্য্যন্তও এক কালে দ্রবীভূত হইয়া যায়। *

চর্ব্বণ-ক্রিয়া সম্বন্ধে পরমেশ্বর পক্ষী জাতির মধ্যে আরও আশ্চর্য্য কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন। পক্ষী জাতি এক কালে দন্তবিহীন, কিন্তু পারাবত ও হংস প্রভৃতি যে সকল পক্ষী কঙ্কর ও শস্য বীজ প্রভৃতি কঠিন দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া জীবন ধা-

রণ করে, উহাদিগের চর্ব্বণ ক্রিয়া সমাধার নিমিত্ত পরমেশ্বর দন্তের পরিবর্ত্তে উহাদিগকে আর এক আশ্চর্য্য উপায় প্রদান করিয়াছেন। উহাদিগের উদর মধ্যে ঘর্ষণ যন্ত্রের ন্যায় বন্ধুর মাংসপেশীময় এক প্রকার যন্ত্র আছে, উক্ত যন্ত্রের ঘর্ষণ দ্বারা উহাদিগের উদরস্থ সমুদায় কঠিন দ্রব্য পেষণ হইতে থাকে, এবং পরে সেই সমস্ত পিষ্ট পদার্থ উহারা অনায়াসে জীর্ণ করিতে সমর্থ হয়। পরীক্ষাদ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে, যে কঙ্কর কি শস্যবীজ, কোন রূপে চূর্ণ ও পিষ্ট না হইলে কখনই তাহা পূর্ব্বোক্ত পক্ষীদিগের জঠরানলে জীর্ণ হইতে পারে না, অতএব পরমেশ্বর পারাবত প্রভৃতি পক্ষীদিগের উদর মধ্যে উক্ত প্রকার কৌশল সম্পাদন করিয়া যে কি পর্য্যন্ত আপনার মহিমা বিস্তার করিয়াছেন, তাহা বচনাতীত। ঐ সমস্ত পক্ষীদিগের শরীরে জগদীশ্বর যদি এ প্রকার কৌশল প্রয়োগ না করিতেন, তাহা হইলে স্তূপাকার শস্যোপরি অবস্থিতি করিয়াও উহারা আহারাভাবে প্রাণ ত্যাগ করিত। শ্যেন প্রভৃতি যে সমস্ত পক্ষী অপরাপর প্রাণীবধ করিয়া তাহার মাংসাদি ভক্ষণ করে, তাহাদিগের নখ ও চঞ্চু এমন ভাব করিয়া দিয়াছেন যে তা-

হাতে আর উহাদিগকে কোন ক্লেশ ভোগ- করিতে হয় না। উহাদিগের নখ চঞ্চু অতি সবল ও তীক্ষ্ণ এবং অস্ত্রবিশেষ। উহারা তদ্দ্বারাই আ- পনাদিগের ভোজ্য দ্রব্য কোমল ও পেষণ করিয়া ভক্ষণ করে।

সর্প প্রভৃতি কতিপয় উরগ প্রাণীর গমন ব্যা- পার মনে হইলে একবারে বিমোহিত হইতে হয়। অপরাপর জীব জন্তু হয় পদ দ্বারা ভ্রমণ করে, ন- তুবা পক্ষ দ্বারা উড্ডীয়মান হয়, কিন্তু উহাদিগের সে প্রকার কোন সহায় নাই অথচ উহারা অতি সত্বর বেগে অবলীলাক্রমে সর্ব্বত্র গমন করিতে পারে। উহাদিগের শরীর এরূপ সুকৌশল বিশিষ্ট মাংসপেশীদ্বারা নির্ম্মিত যে উহারা তদ্দ্বারা ইচ্ছা- নুসারে আপনাদিগের শরীর সঙ্কুচিত ও বিস্তৃত করিতে পারে এবং ঐরূপে উহারা অনবরত শরীর সঙ্কোচ ও বিকোচ করিয়া ইচ্ছামত সর্ব্বত্রই গমন করিতে সমর্থ হয়।

শুক প্রভৃতি যে সকল পক্ষী ফলাদি কঠিন দ্রব্য ভঞ্জন ও বিদারণ করিয়া ভক্ষণ করে, জগদীশ্বর তাহাদিগের চঞ্চু বড়িশবৎ বক্রাকার করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন, কিন্তু অনন্ত কৌশল কর্ত্তা জগদীশ্বর

যদি উহাদিগের চঞ্চুতে আর একটি বিশেষ কৌশল প্রকাশ না করিতেন, তবে উহাদিগের জীবন ধারণ করাই কঠিন হইত। অন্যান্য পক্ষীর ওষ্ঠ ভাগ যেমন মস্তকের অস্থির সহিত একত্র সংযুক্ত জগদীশ্বর যদি শুক পক্ষীর ওষ্ঠ দেশকে সেই প্রকার করিয়া নির্ম্মাণ করিতেন, তাহা হইলে উহারা আর কোন ক্রমে মুখ ব্যাদান করিয়া ভোজ্য দ্রব্য গলাধঃকরণ করিতে শক্ত হইত না। উহাদিগের ওষ্ঠ ভাগ এত বক্র ও অধর দেশ এত চাপা যে তাহাতে কোন ক্রমে মুখ বিস্তার করা সাধ্য হইতে পারে না, কিন্তু জগদীশ্বর তার এক অসাধারণ কৌশলদ্বারা উক্ত দোষের প্রতীকার করিয়া রাখিয়াছেন। জগদীশ্বর শুকপক্ষীর উপর ওষ্ঠভাগ এমন এক প্রকার সূক্ষ্ম তন্তুদ্বারা মস্তকের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন যে তাহাতে উহারা অক্লেশে ইচ্ছামত আপন ওষ্ঠাধর উভয়কেই প্রসারণ ও সঞ্চালন করিতে সমর্থ হয়।

কৃকলাস জন্তু তাহার নেত্র ইতস্ততঃ সঞ্চালন করিতে পারে না বলিয়া পরমেশ্বর তাহার অঙ্গে এপ্রকার করিয়া চক্ষু সংযোগ করিয়া দিয়াছেন, যে উহার চক্ষুর অর্দ্ধাংশ উহার মস্তকের উপরে

সমুন্নত হইয়া অবস্থিত আছে, কিন্তু শরীরের মধ্যে যে অঙ্গ অধিক সমুন্নত হইয়া অবস্থিত থাকে, সেই অঙ্গেই অধিক আঘাত লাগিবার সম্ভাবনা, এই জন্য দয়ার নিধান পরমেশ্বর কৃকলাসের শরীরে এক অসাধারণ কৌশল সম্পাদন করিয়া তাহার চক্ষুকে রক্ষা করিতেছেন। সচরাচর জীব জন্তুর চক্ষু যেমন ঊর্দ্ধাধ দুই পত্রদ্বারা আচ্ছাদিত থাকে, কৃকলাসের চক্ষু সেরূপ নহে উহার চক্ষু এক খানি চর্ম্মাবরণে আচ্ছাদিত এবং সেই আচ্ছাদনের মধ্য ভাগে একটি ছিদ্র আছে সেই ছিদ্র দ্বারা উক্ত জন্তু সর্ব্বত্র নিরীক্ষণ করিয়া আপনার জীবন ক্রিয়া সমাধা করে।

এক প্রকার শম্বুকের গতিক্রিয়া সমাধা করিবার জন্য পরমেশ্বর যে অসাধারণ জ্ঞান নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা মনে হইলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। উক্ত জন্তুর পক্ষ পদ প্রভৃতি এপ্রকার কোন সহায় নাই যে তদবলম্বনে উহা আপনার গমন কার্য্য সম্পন্ন করিতে সমর্থ হয়, উহার শরীর হইতে লালাবৎ এক প্রকার রস নির্গত হয়, উক্ত শম্বুক সেই রস বৃক্ষশাখা, বৃক্ষ পত্র ও তৃণ পুষ্পাদিতে সংলগ্ন করিয়া একস্থান হইতে স্থানান্তর

গমন করে। উক্ত জন্তুর দেহ হইতে যদি ঐ প্রকার রস নির্গত না হইত, তবে উহা আর কোন প্রকারে একস্থান হইতে স্থানান্তর প্রাপ্ত হইতে পারিত না এবং সুতরাং আহারাভাবে উহার জীবন নষ্ট হইত। অতএব জগদীশ্বর যে কেবল উহার প্রাণ রক্ষা ও সুখ সাধনের নিমিত্ত উহার শরীরে এপ্রকার বিশেষ কৌশল সম্পাদন করিয়াছেন, তাহার আর সন্দেহ নাই।

পরমেশ্বর মনুষ্য জাতিকে যে প্রকার আকৃতি ও প্রকৃতি প্রদান করিয়া অবনীমণ্ডলে সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং বাহ্য বিষয়ের সহিত উহাদের যে প্রকার সম্বন্ধ নিবদ্ধ রহিয়াছে, ইহাতে যদি মনুষ্য জাতি অপরাপর জীব জন্তুর ন্যায় বুদ্ধিবিহীন হইত, তাহা হইলে উহাদিগের কোন ক্রমে এ পৃথিবীতে জীবন ধারণ করা সম্ভব হইত না। অন্যান্য জীবজন্তুর ন্যায় মনুষ্য জাতির পক্ষ লোমাদি শীত নিবারক কোন প্রকার গাত্রাচ্ছাদন নাই এবং শত্রু নিবারণোপযোগী নখ শৃঙ্গ প্রভৃতি কোনরূপ সহায়ও নাই। অপরাপর জীব জন্তু যে প্রকার স্বভাব-জাত ফল মূল ও তৃণ শস্যাদি আহার করিয়া জীবন ধারণ করিতে পারে, এবং তরুমূল,

গিরি গহ্বর ও বন কি বিবর প্রভৃতি স্থানে অধিবা
করিয়া জীবন ক্ষেপণ করিতে পারে, মনুষ্য জাতি
সে প্রকারও করিতে পারে না, সুতরাং পরম
করুণাকর বিশ্বপিতা উহাদিগকে উপায়ান্তর প্রদান
না করিলে, উহাদিগকে শীতভারে কম্পিত হইতে
হইত, প্রখর সূর্য্য উত্তাপে দগ্ধ হইয়া হত-জীবন
হইতে হইত, লক্ষ লক্ষ হিংস্র জন্তুর করাল গ্রাসে
মুহুর্মুহু পতিত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিতে হইত,
এবং প্রয়োজনীয় অন্ন পান প্রাপ্ত না হইয়া কখ
খন বা ক্ষুৎ পিপাসায় জীবন ত্যাগ করিতে হইত।
পৃথিবী মণ্ডলে যে মনুষ্য জাতির কত প্রকার
ক্লেশের কারণ বিদ্যমান আছে, এবং তাহার যে
কত অসংখ্য শত্রু পদে পদে বিচরণ করিতেছে;
তাহা কাহার সাধ্য যে বর্ণন করিয়া শেষ করে, কিন্তু
জগদীশ্বর উহাদিগকে এক বুদ্ধি প্রদান করিয়া সে
সমস্ত দুঃখেরই প্রতীকার করিয়াছেন। বুদ্ধি প্র-
ভাবে মনুষ্য সুচারু বস্ত্র বয়ন করিয়া উৎকৃষ্টরূপে
আপনার গাত্রাচ্ছাদন প্রস্তুত করিয়া হিমঋতু
উৎকট শীত জনিত বিষম যন্ত্রণা নিবারণ ও নিদাঘ
কালের প্রচণ্ড সূর্য্য কিরণের অসহ্য ক্লেশ হইতে
নিস্তার পাইতেছে এবং বর্ষার বাত বৃষ্টি হইতে

আপনাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইতেছে। বুদ্ধি প্রভাবে মনুষ্য বিস্তীর্ণ সাগর মধ্যে ভাসমান হইয়াও ক্ষুধার সময় আপনার ভোজ্য দ্রব্য প্রাপ্ত হইতেছে, এবং জল শূন্য মরু ভূমির মধ্যস্থলে নিপতিত হইয়াও তৃষ্ণা কালে সুশীতল জল পান করিয়া আপনার জীবন রক্ষা করিতে সমর্থ হইতেছে। বুদ্ধি দ্বারা মনুষ্য মহাবল সিংহকে লৌহ শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া তাহার সহিত ক্রীড়া করিতেছে, এবং অতিকায় মাতঙ্গকে আপনার অধীন করিয়া তাহার পৃষ্ঠদেশে আরোহণ করিতেছে। বুদ্ধি দ্বারা মনুষ্য সম্বৎসরের পথ হইতে সদ্য সম্বাদ প্রাপ্ত হইতেছে এবং একমাসের পথ এক দিবসের মধ্যে ভ্রমণ করিতেছে। বুদ্ধি দ্বারা মনুষ্য সুগভীর ভূগর্ব্ভ মধ্যে অবতরণ করিয়া তত্রস্থ নানা রত্ন উদ্ধার করিতেছে এবং বুদ্ধি প্রভাবে ব্যোমযান প্রস্তুত করিয়া পক্ষির ন্যায় শূন্য পথে উড্ডীয়মান হইয়া তথাকার সকল শোভা সন্দর্শন করিতে সক্ষম হইতেছে। এক বুদ্ধি প্রভাবে মনুষ্য যে কত সম্ভাবিত বিপদ নিরাকরণ করিয়া সর্ব্বদা আত্ম রক্ষা করিতেছে এবং কত শত অদ্ভুত ব্যাপার সম্পন্ন করিয়া অনুপম সুখের অধিকারী হইতেছে,

[illegible] জীব বিশেষে কৌশল বিশেষ।

তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য। কেবল এক বুদ্ধি প্রভা-

বেই মনুষ্য জাতি বিশ্বরচয়িতা আদি কারণের

জ্ঞান লাভে সমর্থ হইয়াছে। অতএব জগদীশ্বরের

কৌশল ও মহিমার বিষয় স্মরণ হইলে মনুষ্যকেই

অধিক কৃতজ্ঞ হইতে হয়।

কীট।

হস্তী, অশ্ব, উষ্ট্র প্রভৃতি বৃহৎ পশুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ রচনা বিষয়ে জগদীশ্বর যে কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন, সে কৌশল যেমন অনায়াসে আমার-দিগের হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে এবং সে কৌশল সন্দর্শন করিয়া আমরা যেরূপ আশ্চর্য্য সাগরে নিমগ্ন হই, মশক মক্ষিকা পিপীলিকা প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গাদির আকৃতি প্রকৃতির সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কৌশল কখনই সে প্রকার আমাদিগের বোধ গম্য হয় না। কিন্তু ফলতঃ কীট পতঙ্গাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব সম্বন্ধীয় অদ্ভুত কৌশল সকল বিশেষ পর্য্যা-লোচনা করিয়া দেখিলে মনুষ্য মাত্রকেই বিমোহিত হইতে হয়। যে সমস্ত অণুকায় কীট সহজে আমা-দিগের চক্ষুরও গোচর হয় না, যাহাদিগকে হয়তো আমরা কোন জীব বলিয়াই মনে করি না এবং যে সমস্ত কীটাণুদিগের মধ্যে শত শত কীটকে আ-মরা প্রতিনিয়ত পদতলে নিপীড়ন করিয়া প-ঞ্চত্ব প্রাপ্ত করি, তাহার একটি কীট মধ্যেও বিশ্ব কৌ-শলকারী বিশ্বেশ্বরের হস্ত রচিত কৌশল কলাপের অভাব নাই। তিনি এক একটি কীট পতঙ্গে যে অ-নুপম কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন, বিশ্বসংসার

মধ্যে তাহার তুলনা দিবার আর স্থান দৃষ্ট হয় না। কোন কোন পতঙ্গ শরীরের অদ্ভুত কৌশল মনে হইলে সম্মুখস্থ বৃহৎ মাতঙ্গ দেহকেও ভুলিতে হয়।

কোন কোন প্রকার মক্ষিকার পুচ্ছাগ্রভাগে বেধনিকা অস্ত্রের ন্যায় অতি তীক্ষ্ণ এক প্রকার ক্ষুদ্র অস্ত্র সংলগ্ন আছে। সূচী সদৃশ ঐ তীক্ষ্ণাগ্র অস্ত্র সামান্যত উক্ত মক্ষিকাদিগের অঙ্গ মধ্যে সন্নিবিষ্ট থাকে, কিন্তু প্রয়োজন মতে উহারা সেই অস্ত্র ইচ্ছানুসারে বহির্গত করিয়া আপনাদিগের কার্য্য সাধন করিতে পারে। ঐ মক্ষিকাদিগের পুচ্ছ সংলগ্ন উক্ত অস্ত্র সন্দর্শন করিলে আপাতত কাহারও মনে বিশেষ আশ্চর্য্য বলিয়া অনুভূত হওয়া সম্ভব নহে, কিন্তু প্রাণী বিদ্যাপরায়ণ পণ্ডিতেরা বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন, যে উক্ত মক্ষিকাদিগের বিশেষ প্রয়োজন সাধনার্থে পরম কৌশল কারী পরমেশ্বর উহাদিগের পুচ্ছদেশে ঐ প্রকার অস্ত্র প্রদান করিয়াছেন, ঐ অস্ত্র এমন তীক্ষ্ণ ও এমন দৃঢ় যে উহাদ্বারা ঐ মক্ষিকারা বৃক্ষ পত্র, বৃক্ষ শাখা, বৃক্ষ স্কন্ধ, শুষ্ক দারু [illegible] চর্ম্ম পর্য্যন্ত বিদ্ধ করিতে পারে এবং কখন কখন

প্রয়োজন মতে উহারা ঐ অস্ত্র দ্বারা প্রস্তরাদি কঠিন পদার্থ পর্য্যন্ত বিদ্ধ করিয়া থাকে। ঐ অস্ত্র দ্বারা উহারা পূর্ব্বোক্ত প্রকার কোন পদার্থ বিদ্ধ করিয়া সেই ছিদ্র মধ্যে আপনা দিগের ডিম্ব প্রসব করে। উক্ত অস্ত্র মধ্যে আরও এই এক বিশেষ কৌশল দেখিতে পাওয়া যায়, যে অসি যেমন কোষ মধ্যে নিহিত থাকে, মক্ষিকার পুচ্ছ সংলগ্ন উক্ত অস্ত্রকেও জগদীশ্বর সেইরূপ এক প্রকার কোষাভ্যন্তরে রক্ষা করিয়াছেন। যে চর্ম্মময় কোষ মধ্যে ঐ অস্ত্র নিহিত থাকে, সেই কোষ মধ্য দিয়া মক্ষিকারা আপনাদিগের গর্ব্ভস্থ ডিম্ব নির্গত করিয়া উক্ত অস্ত্রকৃত সূক্ষ্ম ছিদ্র মধ্যে রক্ষা করিতে পারে। উক্ত মক্ষিকাদিগের শরীরে এ প্রকার অস্ত্র না থাকিলে উহাদিগের সন্তান রক্ষা হওয়া কঠিন হইত।

হস্তীর শিরোদেশে যেমন বিলম্বিত শুণ্ড সংলগ্ন আছে, কোন কোন কীট শরীরেও সেই প্রকার শুণ্ডাকার লম্বমান একটি অবয়ব দেখিতে পওয়া যায়। ঐ শুণ্ড মধ্যে জগদীশ্বর যে সমস্ত অদ্ভুত কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন এবং উহাদ্বারা অ-

তাহা সবিশেষ আলোচনা করিয়া দেখিলে বিস্ময়সং-র্ণবে নিমগ্ন হইতে হয়। যে সকল কীট শরীরে উক্ত প্রকার শুণ্ড সংলগ্ন আছে, তাহারা উহার দ্বারা এমন সকল বহুৎ মহৎ প্রয়োজন সিদ্ধ করে এবং তাহাদিগের পক্ষে উক্ত শুণ্ড এত আবশ্যক, যে উহা না থাকিলে তাহারা কোন রূপেই জীবন ধারণ করিতে পারিত না. কিন্তু ঐ সমস্ত ক্ষুদ্র কীটের শরীরস্থ অতি সূক্ষ্ম শুণ্ড এত দুর্ব্বল, যে তাহা স-তত্তই নানা কারণে আহত বা ভগ্ন হইয়া যাইতে পারে, এই নিমিত্ত পরম দয়াবান পরমেশ্বর কীট বিশেষে ঐ শুণ্ড রক্ষার আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য উপায় বিধান করিয়া দিয়াছেন। মধু মক্ষিকারা পুষ্প গর্ব্ভে যে শুণ্ড সন্নিবেশ করিয়া মধুপান করে, উ-হাদিগের সেই শুণ্ড দুই অংশে বিভক্ত। শুণ্ডের মধ্য ভাগে একটি গ্রন্থি আছে, মস্তক অবধি ঐ গ্রন্থি পর্য্যন্ত এক ভাগ এবং গ্রন্থি অবধি শুণ্ডের শেষ পর্য্যন্ত আর এক ভাগ। উহাদিগের ইচ্ছা হ-ইলে উহারা শুণ্ড সংকোচ করিয়া তাহার অগ্রভাগ উপরি ভাগের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া রাখিতে পারে এবং সহজে কোন কারণ দ্বারা তথোহে আর আঘাত লাগিবার সম্ভাবনা থাকে না। এ-

প্রজাপতি দিগের শুণ্ডও অতি আশ্চর্য্য কৌশলে রক্ষা পায়, উহারাও প্রয়োজন মতে স্বীয় স্বীয় শুণ্ডকে সংকোচ ও বিকোচ করিতে পারে, উহাদিগের ঐ শুণ্ড সর্ব্বদা ঘড়ির তারের ন্যায় কুণ্ডলাকৃত হইয়া থাকে, কিন্তু প্রয়োজন মতে সরল করিয়া তদ্দ্বারা উহারা মধুপানাদি ক্রিয়া সমাধা করিতে পারে। অন্যান্য জীব জন্তুর মুখ দ্বারা যে কার্য্য সম্পন্ন হয়, মধুকর জাতি শুণ্ড দ্বারা সেই কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকে, উহারা যে শুণ্ড দ্বারা পুষ্প গর্ভ হইতে মধু আকর্ষণ করে, সেই শুণ্ড দ্বারাই মধুপান করিতে পারে। মধুকরদিগের মধুপান ক্রিয়ার তুল্য অদ্ভুত ব্যাপার আর দেখিতে পাওয়া যায় না। উহাদিগের এক শুণ্ডে জগদীশ্বর যদি ঐ রূপ দ্বিবিধ প্রকার শক্তি প্রদান না করিতেন, তাহা হইলে আর উহাদিগের ক্লেশের পরিশেষ থাকিত না। মধুকর জাতি যে পুষ্প মধু পান করিয়া জীবন ধারণ করে, তাহা গভীর পুষ্প গর্ভ মধ্যে অতি সঙ্কীর্ণ স্থানে অবস্থিত থাকে, মধুকর সেই স্থানে স্বীয় সূক্ষ্ম শুণ্ড সন্নিবেশ করিয়া অল্পে অল্পে মধু শোষণ পূর্ব্বক তাহা উদরস্থ করিতে পারে।

পুষ্পের মধ্যে যে স্থানে মধু থাকে, মধুকর দিগের শুণ্ড ভিন্ন অন্য কোন পদার্থ দ্বারা আর সে স্থান হইতে মধু আহরণ করা সাধ্য হয় না। অতএব বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে, যে অসীম জ্ঞানাকর জগদীশ্বর যথাযোগ্য রূপে সমস্ত কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী, প্রভৃতি জীব জন্তুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া সকলকেই সুখী করিয়াছেন, তাঁহার কৌশল প্রভাবে হস্তী আপনার স্থূল গ্রীবা, বিলম্বিত শুণ্ড ও সবল শরীর লইয়া যেমন স্বচ্ছন্দ পূর্ব্বক আপনার সমস্ত প্রয়োজন সিদ্ধ করিয়া সুখেতে জীবন যাপন করিতেছে, অতি ক্ষুদ্র কীটাণু সকলও স্ব স্ব আকৃতি প্রকৃতি লইয়া সেই রূপ সুখেতে জীবিত রহিয়াছে। কোন কোন কীটের অবস্থান্তর প্রাপ্ত হওয়াও অল্প আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। লোম যুক্ত এবং সামান্য কীটকে যিনি মনোহর চিত্র বিচিত্রময় প্রজাপতি রূপে পরিণত হইতে দেখিয়াছেন, তিনিই জানেন, যে কীটের অবস্থান্তরিত হওয়া কি পর্য্যন্ত অদ্ভুত ব্যাপার। যে কীট পরিণামে সুদৃশ্য প্রজাপতি রূপ ধারণ করে, প্রথমে তাহার যে প্রকার অবয়ব থাকে, তদ্দৃষ্টে কাহারও এমত বোধ হয় না, যে ইহা

কোন কালেই সুদৃশ্য প্রজাপতি রূপে প-
রিণত হইতে পারিবে, উক্ত কীটের শরীর হ-
ইতে কেবল পক্ষ মাত্র উত্থিত হওয়াতেই যে উ-
হার রূপের পরিবর্ত্তন হয় এমত নহে, প্রথমে উ-
হার দন্ত ও হনু যুক্ত মুখ থাকে, পরে তাহার পরি-
বর্ত্তে এক শুণ্ড উৎপন্ন হয় এবং প্রথমে উক্ত কী-
টের যে স্থলে ১৪ টি স্থূল পদ সন্দর্শন করা যায়,
পরিণামে সেই স্থলে ছয়টি সূক্ষ্ম জঙ্ঘা মাত্র বাহির
হয়। কি প্রণালী ক্রমে যে উক্ত প্রকার সামান্য
কীট হইতে অপূর্ব্ব প্রজাপতির উৎপত্তি হয়
তাহা স্থির রূপে নির্দ্দেশ করা নিতান্ত দুঃসাধ্য
ব্যাপার? কোন কোন প্রাণী তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা
অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন, যে, যে সকল কীট
কাল ক্রমে পক্ষ ও শুণ্ডাদি যুক্ত উৎকৃষ্ট পতঙ্গ
রূপ ধারণ করে, প্রথমে তাহাদিগের দেহ মধ্যে
ঐ সমস্ত পক্ষাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সমুদায় চিহ্ন গূঢ়
রূপে অবস্থিত থাকে, পরিণামে সেই সমস্ত অঙ্গ
বর্দ্ধিত হইয়া প্রকাশ পাইলে পর উক্ত কীট দিগের
একটি অপূর্ব্বরূপ প্রকাশ পায়।

ঊর্ণনাভ ও তন্তু কীটের আকৃতি প্রকৃতির বি-
ষয় আলোচনা করিয়া দেখিলেও চমৎকৃত হইতে

হয়। যে যন্ত্র দ্বারা তার প্রস্তুত হয়, উহাদিগের উদর তাহার অবিকল অনুরূপ। তন্তু কীটের উদর মধ্যে অদ্ভুত কৌশল বিশিষ্ট দুইটি চর্ম্ম ময় কোষ আছে, ঐ কোষ দ্বয় উক্ত কীটের উদরস্থ অন্ত্র বেষ্টন করিয়া অবস্থিত থাকে, কেহ কেহ ঐ চর্ম্ম-ময় কোষ পরিমাণ করিয়া দেখিয়াছেন, যে উহা দৈর্ঘ্যে প্রায় ১০ ইঞ্চির ন্যূন নহে। ঐ কোষ মধ্যে এক প্রকার লালাবৎ আর্দ্র পদার্থ সঞ্চিত থাকে, সেই লালা দ্বারাই অপূর্ব্ব রেশম উৎপন্ন হয়। যে কোষ দ্বয়ের মধ্যে উক্ত লালা থাকে, সেই কোষের বহু ছিদ্রময় দুইটী দ্বার আছে, ঐ সূক্ষ্ম ছিদ্রময় দ্বার হইতে সেই লালা নির্গত হওয়াতেই প্রথমত অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কেশের মত সূত্র উৎপন্ন হয়, পরে সেই সকল সূক্ষ্ম সূত্র একত্রিত হইয়া উৎকৃষ্ট রেশম হইয়া উঠে। তন্তু কীট মুখ হইতে সেই লালাময় তন্তু বাহির করিয়া প্রথমে তাহার একাগ্রভাগ কোন একটি পদার্থে সংলগ্ন করিয়া ক্রমাগত স্বীয় শরীরকে ঘূর্ণিত করে এবং ক্রমে তদ্দ্বারা গুটিকার উৎপত্তি হয়।

স্বর্ণ রৌপ্যাদি ধাতু হইতে তার প্রস্তুত হওনাপেক্ষা লালাবৎ এক প্রকার আর্দ্র পদার্থ হই-

হইতে উৎকৃষ্ট রেসম উৎপন্ন হওয়া যে কত আশ্চর্য্যের বিষয় তহা লিখিয়া শেষ করা যায় না! ইহার তুল্য অদ্ভুত শিল্প কার্য্য আর কি আছে? কেবল পরমেশ্বরের মহিমা প্রভাবেই এতাদৃশ অসম্ভব ব্যাপার সম্পন্ন হইয়া থাকে, নতুবা এমন অচিন্তনীয় অদ্ভুত বিষয় আপাততঃ সম্ভব বলিয়াও মনে করা সাধ্য হয় না। কোন ধাতু হইতে তার প্রস্তুত করিতে হইলে কেবল সে ধাতুর আকারের বৈলক্ষণ্য হয় তাহার স্বরূপের কিছু মাত্র অন্যথা হয় না কিন্তু তন্তু কীটের উদরস্থ লালা যখন রেসমেতে পরিণত হয় তখন উক্ত লালার স্বরূপেরও অন্যথা হইয়া যায়। তখন তাহার আর্দ্রতা প্রভৃতি গুণের পরিবর্ত্তে দৃঢ়তা ও স্থিতি স্থাপকতাদি গুণের উৎপত্তি হয়।

মধুমক্ষিকারা যে প্রকার আশ্চর্য্য নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া মধুক্রম নির্ম্মাণ করে এবং যে প্রকার অদ্ভুত কৌশল দ্বারা তন্মধ্যে মধু রক্ষা করে তাহা মনে হইলেও বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। ইহা প্রায় অনেকেই অবগত আছেন, যে ভবিষ্যতে উপভোগ করিবার উদ্দেশে মধুমক্ষিকারা বুদ্ধিমান ও মিতব্যয়ী মনুষ্যের ন্যায় যত্ন পূর্ব্বক মধু সঞ্চয় করিয়া

রাখে, কিন্তু জগদীশ্বর যদি উহাদিগকে মধুক্রম নির্ম্মাণ করিবার অদ্ভুত শক্তি অর্পণ না করিতেন, তাহা হইলে উহাদিগের পুর্ব্বোক্ত পরিশ্রম দৃষ্টি কোন কার্য্যেরই হইত না। মধুমক্ষিকারা যেমন মধুক্রম নির্ম্মাণ করিয়া তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র মধ্যে পুষ্প মধু বিভাগ করিয়া রাখে, সেই রূপ অল্প অল্প অংশে বিভক্ত না করিয়া একত্র অধিক মধুরক্ষা করিলে তাহা অতি শীঘ্রই বিকৃত হইয়া যাইত। অতএব বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে, যে জগদীশ্বর উহাদিগের বিশেষ প্রয়োজন সাধন উদ্দেশে উহাদিগকে এক একটি অদ্ভুত শক্তি প্রদান করিয়াছেন। মধুমক্ষিকারা যে পুষ্পে মধুপান করিতে গমন করে, সেই পুষ্প হইতেই তাহার রেণু লইয়া মধুক্রম নির্ম্মাণ করে। ধূলিবৎ পুষ্পরেণু হইতে রসার্দ্র অর্দ্ধচ্ছিদ্র উৎপন্ন হওয়া যে কতদূর আশ্চর্য্য ব্যাপার! পাঠক গণ একবার তাহা বিবেচনা করিয়া দেখুন।

খদ্যোতের পুচ্ছ দেশে আলোকের সৃষ্টি করিয়া জগদীশ্বর এক কালে কৌশল ও করুণার শেষ করিয়াছেন। প্রাণী তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, যে খদ্যোতের পুচ্ছদেশে ফসফোরাস

নামক এক প্রকার পদার্থ বিদ্যমান থাকাতে উহা দিগের শরীর হইতে দীপবৎ আলোক নির্গত হয়। কীট শরীরে উক্ত প্রকার আশ্চর্য্য উদ্দীপক পদার্থ সংস্থাপন করা যে কত দূর আশ্চর্য্যের বিষয় তাহা কি বলিব! খদ্যোতের শরীরে উক্ত প্রকার আলোক প্রদান করিয়া জগদীশ্বর যে কেবল উহাদিগের শরীরের শোভা বৃদ্ধি করিয়াছেন এমত নহে তদ্দ্বারা আরও অধিকতর আশ্চর্য্য কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। তত্ত্বানুসন্ধায়ী পণ্ডিত গণ দেখিয়াছেন, যে খ-দ্যোতিকা তাহার পুচ্ছ দেশস্থ আলোক দ্বারা স্বজাতীয় পুরুষ কীট দিগকে আহ্বান করে। যে কীটপুচ্ছে ঐ আলোক থাকে তাহারা স্ত্রী জা-তি, তাহাদিগের পুচ্ছ হইতে যৎ কালে ঐ আলো-ক প্রকাশ পায়, তখন তাহাদিগের পুরুষেরা সেই আলোক সন্দর্শন করিয়া তাহাদিগের সহিত একত্র মিলিত হয়। জগদীশ্বর যদি খদ্যোতের শরীরে উক্ত প্রকার আলোকের সৃষ্টি না করিতেন, তাহা হইলে কখনই উহাদিগের স্ত্রী পুরুষে একত্র মিলিত হইবার সম্ভাবনা থাকিত না। অতএব পরম কৌশল কারী পরম পুরুষ

কীট।

সামান্য কীট শরীরেও অচিন্তনীয় কৌশল সম্পন্ন করিয়া আপনার অপার মহিমা বিস্তার করিয়াছেন।

কুসুমাবলী।

অন্নদামঙ্গল।

গণেশ বন্দনা।

গণেশায় নমঃ নমঃ আদিব্রহ্ম নিরুপম
পরমপুরুষ পরাৎপর।
খর্ব্ব স্থূল কলেবর গজমুখ লম্বোদর
মহাযোগী পরমস্থন্দর॥
বিঘ্ননাশ কর বিঘ্নরাজ।
পূজা হোম যোগ যাগে তোমার অর্চ্চনা আগে
তব নামে সিদ্ধ সর্ব্ব কাজ॥
স্বরগ পাতাল ভূমি বিশ্বের জনক তুমি
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের মূল।
শিবের তনয় হয়ে দুর্গারে জননী কয়ে
ক্রীড়া কর হয়ে অনুকুল॥

হেলে শুণ্ড বাড়াইয়া সংসার সমুদ্র পিয়া
খেলাছলে করহ প্রলয়।
ফুৎকারে করিয়া বৃষ্টি পুন কর বিশ্ব সৃষ্টি
ভাল খেলা খেল দয়াময়॥
বিধি বিষ্ণু শিব শিবা ত্রিভুবন রাত্রি দিবা
সৃষ্টি পুন করহ সংহার।
বেদে বলে তুমি ব্রহ্ম তুমি জপ কোন ব্রহ্ম
তুমি সে জানহ মর্ম্ম তার॥
যে তুমি সে তুমি প্রভু জানিতে নারিনু কভু
বিধি হরি হর নাহি জানে।
তব নাম লয় যেই আপদ এড়ায় সেই
তুমি দাতা চতুর্ব্বর্গ দানে॥

শিববন্দনা।

শঙ্করায় নমঃ নমঃ গিরিসুতাপ্রিয়তম
বৃষভবাহন যোগধারী।
চন্দ্র সূর্য্য হুতাশন সুশোভিত ত্রিনয়ন
ত্রিগুণ ত্রিশূলী ত্রিপুরারি॥
হর হর মোর দুঃখ হর।

হর রোগ হর তাপ হর শোক হর পাপ
হিমকরশেখর শঙ্কর ॥
গলে দোলে মুণ্ডমাল পরিধান বাঘছাল
হাতে মুণ্ড চিতাভস্ম গায়।
ডাকিনী যোগিনীগণ প্রেত ভূত অগণন
সঙ্গে রঙ্গে নাচিয়া বেড়ায় ॥
অতিদীর্ঘ জটাজূট কণ্ঠে শোভে কালকূট
চন্দ্রকলা ললাটে শোভিত।
ফণী বালা ফণী হার ফণিময় অলঙ্কার
শিরে ফণী ফণী উপবীত ॥
যোগির অগম্য হয়ে সদা থাক যোগ লয়ে
কি জানি কাহার কর ধ্যান।
অনাদি অনন্ত মায়া দেহ যারে পদছায়া
সেই পায় চতুর্ব্বর্গ দান ॥
মায়ামুক্ত তুমি শিব মায়াযুক্ত তুমি জীব
কে বুঝিতে পারে তব মায়া।
অজ্ঞান তাহার যায় অনায়াসে জ্ঞান পায়
যারে তুমি দেহ পদছায়া ॥

ভাস্করায় নমঃ   হর মোর তমঃ
দয়া কর দিবাকর।
চারি বেদে কয়   ব্রহ্ম তেজোময়
তুমি দেব পরাৎপর॥
দিনকর চাহ দীনে।
তোমার মহিমা   বেদে নাহি সীমা
অপরাধ ক্ষম ক্ষীণে॥
বিশ্বের কারণ   বিশ্বের লোচন
বিশ্বের জীবন তুমি।
সর্ব্বদেবময়   সর্ব্ববেদাশ্রয়
আকাশ পাতাল ভূমি॥
এক চক্র রথে   আকাশের পথে
উদয় গিরি হইতে।
যাহ অস্ত গিরি   এক দিনে ফিরি
কে পারে শক্তি কহিতে॥
অতিশয় কর   পোড়ে মহীধর
সিন্ধুর জল শুকায়।
পদ্মিনী কেমনে   হাসে হৃষ্টমনে
তোমার তত্ত্ব কে পায়॥

দ্বাদশ মূরতি গ্রহগণপতি
সংজ্ঞা ছায়া নারী ধন্যা।
শনি যম মনু তব অঙ্গজনু
যমুনা তোমার কন্যা॥
বিশ্বের রক্ষিতা বিশ্বের সবিতা
তাই সে সবিতা নাম।
তুমি বিশ্বসার মোরে কর পার
করি এ কোটি প্রণাম॥
কোকনদোপর থাক নিরন্তর
অশেষগুণসাগর।
বরাভয়কর ত্রিনয়ন ধর
মাথায় মাণিকবর॥

বিষ্ণুবন্দনা।

কেশবায় নমঃ নমঃ পুরাণ পুরুষোত্তম
চতুর্ভুজ গরুড়বাহন।
বরণ জলদঘটা হৃদয়ে কৌস্তুভছটা
বনমালা নানা আভরণ॥

শঙ্খ চক্র গদাম্বুজ সুশোভিত চারি ভুজ
মনোহর মুকুট মাথায়।
কিবা মনোহর পদ নিরুপম কোকনদ
রতন নূপুর বাজে তায়॥
পরিধান পীতাম্বর অধর বান্ধুলীবর
মুখ সুধাকরে সুধা হাস।
সঙ্গে লক্ষ্মী সরস্বতী নাভি পদ্মে প্রজাপতি
রূপে ত্রিভুবন পরকাশ॥
ইন্দ্র আদি দেব সব চারি দিকে করে স্তব
সনকাদি যত ঋষিগণ।
নারদ বীণার তানে মোহিত যে গুণ গানে
পঞ্চমুখে গান পঞ্চানন॥
কদম্বের কুঞ্জবনে বিহর সানন্দ মনে
শীতল সুগন্ধ মন্দ বায়।
ছয় ঋতু সহচর বসন্ত কুসুমশর
নিরবধি সেবে রাঙ্গা পায়॥
ভৃঙ্গের ঝঙ্কার রব কুহরে কোকিল সব
পূর্ণচন্দ্র শরদযামিনী।
বীণা বাঁশী আদি যন্ত্রে গান করে কামতন্ত্রে
ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী॥

সরস্বতী বন্দনা

উর দেবি সরস্বতি স্তবে কর অনুমতি
বাগীশ্বরি বাক্যবিনোদিনি।
শ্বেত বর্ণ শ্বেত বাস শ্বেত বীণা শ্বেত হাস
শ্বেতসরসিজ নিবাসিনি॥
বেদ বিদ্যা তন্ত্র মন্ত্র বেণু বীণা আদি যন্ত্র
নৃত্য গীত বাদ্যের ঈশ্বরী।
গন্ধর্ব্ব অপ্সরগণ সেবা করে অনুক্ষণ
যোগী ঋষি কিন্নর কিন্নরী॥
ছত্রিশ রাগিণী মেলে ছয় রাগ সদা খেলে
অনুরাগ যে সব রাগিণী।
সপ্ত স্বর তিন গ্রাম মূর্চ্ছনা একুশ নাম
শ্রুতি কলা সতত সঙ্গিনী॥
তান মান বাদ্য তাল নৃত্য গীত ক্রিয়া কাল
তোমা হৈতে সকল নির্ণয়।
যে আছে ভুবন তিনে তোমার করুণা বিনে
কাহার শকতি কথা কয়॥
তুমি নাহি চাহ যারে সবে মূঢ় বলে তারে
ধিক ধিক তাহার জীবন।

তোমার করুণা যারে সবে ধন্য বলে তারে
গুণিগণে তাহার গণন ॥

অন্নপূর্ণা বর্ণনা।

অন্নপূর্ণা মহামায়া সংসার যাঁহার মায়া
পরাৎপরা পরমা প্রকৃতি।
অনির্ব্বাচ্য নিরুপমা আপনি আপন সমা
সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়আকৃতি ॥
অচক্ষু সর্ব্বত্র চান অকর্ণ শুনিতে পান
অপদ সর্ব্বত্র গতাগতি।
কর বিনা বিশ্ব গড়ি মুখ বিনা বেদ পড়ি
সবে দেন কুমতি সুমতি ॥
বিনা চন্দ্রানলরবি প্রকাশি আপন ছবি
অন্ধকার প্রকাশ করিলা।
প্লাবিত কারণ জলে বসি স্থল বিনা স্থলে
বিনা গর্ভে প্রসব হইলা ॥

সম্ভাজন শুন জামাতার গুণ
বয়সে বাপের বড়।
কোন গুণ নাই যেথা সেথা ঠাই
সিদ্ধিতে নিপুণ দড়॥
মান অপমান সুস্থান কুস্থান
অজ্ঞান জ্ঞান সমান।
নাহি জানে ধর্ম্ম নাহি মানে কর্ম্ম
চন্দনে ভস্মজ্ঞেয়ান॥
যবনে ব্রাহ্মণে কুকুরে আপনে
শ্মশানে স্বরগে সম।
গরল খাইল তবু না মরিল
ভাঙ্গড়েরে নাহি যম॥
সুখে দুখ জানে দুখে সুখ মানে
পরলোকে নাহি ভয়।
কি জাতি কে জানে কারে নাহি মানে
সদা কদাচারময়॥
কহিতে ব্রাহ্মণ কি আছে লক্ষণ
বেদাচার বহিষ্কৃত।

ক্ষাত্রেয় কথন না হয় ঘটন
জটা ভস্ম আদি ধৃত ॥
যদি বৈশ্য হয় চাসি কেন নয়
নাহি কোন ব্যবসায়।
শূদ্র বলে কেবা দ্বিজ দেয় সেবা
নাগের পৈতা গলায় ॥
গৃহী বলা দায় ভিক্ষা মাগি খায়
না করে অতিথিসেবা।
সতী ঝি আমার গৃহিণী তাহার
সন্ন্যাসী বলিবে কেবা ॥
বনস্থ বলিতে নাহি লয় চিতে
কৈলাস নামেতে ঘর।
ডাকিনীবিহারী নহে ব্রহ্মচারী
এ কি মহাপাপ হর ॥
সতী ঝি আমার বিদ্যুত আকার
বাতুলের হৈল জায়া।
আমি অভাজন পরম ভাজন
ঘটক নারদ ভায়া ॥
আহা মরি সতি কি দেখি দুর্গতি
অন্ন বিনা হৈলা কালী।

তোমার কপাল পর বাঘছাল
আমার রহিল গালী ॥
শিবনিন্দা শুনি রোষে যত মুনি
দধীচি অগস্ত্য আদি।
দক্ষে গালি দিয়া চলিলা উঠিয়া
শ্রবণে কর আচ্ছাদি ॥
তবু পাপ দক্ষ নিন্দি কত লক্ষ
সতী সম্বোধিয়া কহে।
তার মৃত্যু নাই তোর না হিঠাই
আমার মরণ নহে ॥
মোর কন্যা হয়ে প্রেত সঙ্গে রয়ে
ছি ছি এ কি দশা তোর।
আমি মহারাজ তোর এই সাজ
মাথা খেতে এলি মোর ॥
বিধবা যখন হইবি তখন
অন্ন বস্ত্র তোরে দিব।
সে পাপ থাকিতে নারিব রাখিতে
তার মুখ না দেখিব ॥
শিবনিন্দা শুনি মহাদুখ গুনি
কহিতে লাগিলা সতী।

শিবনিন্দা কর কি শকতি ধর
কেন বাপা হেন মতি ॥
যারে কালে ধরে সেই নিন্দে হরে
কি কহিব তুমি বাপ।
তব অঙ্গজনু তেজিব এ তনু
তবে যাবে মোর পাপ ॥
তিনি মৃত্যুঞ্জয় গালিতে কি হয়
মোর যেতে আছে ঠাঁই।
কর্ম্ম মত ফল যজ্ঞ যাবে তল
তোর রক্ষা আর নাই ॥
যে মুখে পামর নিন্দিলি শঙ্কর
সে মুখ হবে ছাগল।
এতেক কহিয়া শরীর ছাড়িয়া
উত্তরিলা হিমাচল ॥
হিমগিরিপতি ভাগ্যবান অতি
মেনকা তাহার জায়া।
পূর্ব্ব তপ বরে তাহার উদরে
জনমিলা মহামায়া ॥
সতী দেহ ত্যাগে নন্দী মহা রাগে
সত্বরে গেলা কৈলাস

শূন্য রথ লয়ে শোকাকুল হয়ে
নিবেদিলা কৃত্তিবাসে ॥
শুনিয়া শঙ্কর শোকেতে কাতর
বিস্তর কৈলা রোদন।
লয়ে নিজগণ করিলা গমন
করিতে দক্ষ দমন ॥

শিবের দক্ষালয়যাত্রা।

মহারুদ্ররূপে মহাদেব সাজে।
ভভম্ভম্ ভভম্ভম্ শিঙ্গা ঘোর বাজে ॥
লটাপট্ জটাজূট সংঘট্ট গঙ্গা।
ছলচ্ছল্ টলট্টল্ কলক্কল্ তরঙ্গা ॥
ফণাফণ্ ফণাফণ্ ফণীফণ্ন গাজে।
দিনেশ প্রতাপে নিশানাথ সাজে ॥
ধকধ্বক্ ধকধ্বক্ জ্বলে বহ্নি ভালে।
ববম্বম্ ববম্বম্ মহা শব্দ গালে ॥
দলম্মল্ দলম্মল্ গলে মুণ্ডমালা।
কটীকূটে দ্যোমরা হস্তিছালা ॥
ঝূলী করে লোল ঝূলে।

মহাঘোর আভা পিনাকে ত্রিশূলে ॥
ধিয়া তা ধিয়া তা ধিয়া ভূত নাচে।
উলঙ্গী উলঙ্গে পিশাচী পিশাচে ॥
সহস্রে সহস্রে চলে ভূত দানা।
হুহুঙ্কার হাঁকে উড়ে সর্পবাণা ॥
চলে ভৈরবা ভৈরবী নন্দি ভৃঙ্গী।
মহাকাল বেতাল তাল ত্রিশৃঙ্গী ॥
চলে ডাকিনী যোগিনী ঘোর বেশে।
চলে শাঁখিনী পেতিনী মুক্ত কেশে ॥
গিয়া দক্ষ যজ্ঞে সবে যজ্ঞ নাশে।
কথা না সরে দক্ষরাজে তরাসে ॥
অদূরে মহারুদ্র ডাকে গভীরে।
অরে রে অরে দক্ষ দে রে সতীরে ॥

দক্ষযজ্ঞনাশ।

ভূতনাথ ভূতসাথ দক্ষ যজ্ঞ নাশিছে।
যক্ষ রক্ষ লক্ষ লক্ষ অট্ট অট্ট হাসিছে।
প্রেতভাগ সানুরাগ ঝম্প ঝম্প ঝাঁপিছে।
ঘোর রোল গণ্ডগোল চৌদ্দ লোক

সেনা সুত মন্ত্রপূত দক্ষ দেয় আহুতি।
জন্মি তায় সৈন্য ধায় অশ্ব চালি মাহুতি॥
বৈরিপক্ষ যক্ষ রক্ষ রুদ্রবর্গ ডাকিয়া।
যাও যাও ছুঁদিখাও দক্ষ দেই হাঁকিয়া॥
সে সভায় আত্মগায় রুদ্র দেন নির্বৃতি।
দক্ষরাজ পায় লাজ আর নাহি নিষ্কৃতি॥
রুদ্র দূত ধায় ভূত নন্দি ভৃঙ্গি সঙ্গিয়া।
ঘোরবেশ মুক্তকেশ যুদ্ধরঙ্গরঙ্গিয়া॥
ভার্গবের সৌষ্ঠবের দাড়ি গোঁফ ছিণ্ডিল।
পূষণের ভূষণের দন্তপাতি পাড়িল॥
বিপ্র সর্ব্ব দেখি পর্ব্ব ভোজ্য বস্ত্র সারিছে
ভূতভাগ পায় লাগ নাথি কীল মারিছে॥
ছাড়ি মন্ত্র ফেলি তন্ত্র মুক্তকেশ ধায় রে
হায় হায় প্রাণ যায় পাপ দক্ষ দায় রে॥
যজ্ঞ গেহ ভাঙ্গি কেহ হব্য কব্য খাইছে।
উর্দ্ধহাথ বিশ্বনাথ নাম গীত গাইছে॥
মার মার ঘের ঘার হান হান হাঁকিছে।
হুপ হুপ দাপ দাপ আশ পাশ ঝাঁকিছে।
অট্ট অট্ট ঘট্ট ঘট্ট ঘোর হাস হাসিছে।
হাম থূম থাম ভীম শব্দ ভাষিছে॥

ঊর্দ্ধবাহু যেন রাহু চন্দ্র সূর্য্য পাড়িছে।
লম্ফ ঝম্প ভূমি কম্প নাগ কূর্ম্ম লাড়িছে॥
অগ্নি জ্বালি সর্পি ঢালি দক্ষ দেহ পুড়িছে।
ভস্মশেষ হৈল দেশ রেণু রেণু উড়িছে॥
হাস্যতুণ্ড যজ্ঞকুণ্ড পূরি পূরি মুতিছে।
পাদ যায় ঠায় ঠায় অশ্ব হস্তি পুতিছে॥
রাজ্য খণ্ড লণ্ড ভণ্ড বিস্ফুলিঙ্গ ছুটিছে।
হূল থূল কূল কূল ব্রহ্ম ডিম্ব ফুটিছে॥
মৌনতুণ্ড হেটমুণ্ড দক্ষ ভৃত্য জানিছে।
কেহ ধায় মুষ্টি ঘায় মুণ্ড ছিণ্ডি আনিছে॥

প্রসূতিস্তবে দক্ষজীবন।

এই রূপে যজ্ঞ সহ দক্ষ নাশ পায়।
প্রসূতি বাঁচিলা মাত্র সতীর কৃপায়॥
বিধি বিষ্ণু দুই জন নিজ স্থানে ছিলা।
দেখিয়া শিবের ক্রোধ অস্থির হইলা॥
অকালে প্রলয় জানি করেন শঙ্কর।
দক্ষবাসে শিব পাশে আইলা সত্বর॥

সতীশোকে পতিশোকে লজ্জা তেয়াগি
প্রসূতি শিবের কাছে আইলা কান্দিয়া
গলবস্ত্রা হয়ে এল শিবের সম্মুখ।
শাশুড়ী দেখিয়া শিব লাজে হেঁটমুখ॥
দূরে গেল রুদ্রভাব শিবভাব হয়।
প্রসূতি বিস্তর স্তুতি করে সবিনয়॥
বিশ্বের জনক তুমি বিশ্বমাতা সতী।
অসীম মহিমা জানে কাহার শকতি॥
আমি জানি আমার ভাগ্যের সীমা না
সতী মোর কন্যা তুমি আমার জামাই
বেদেতে মহিমা তব পরম নিগূঢ়।
সেই বেদ পড়ি মোর পতি হৈল মূঢ়॥
আপনি বিচার কর পরিহর রোষ।
দক্ষের এ দোষ কেন বেদের এ দোষ
যেমন তোমার নিন্দা করিল পাগল।
যে করিলে সেই নহে তার মত ফল॥
কি করিবে পরিণামে বুঝিতে না পারি
ভাগ পেতে হয় মোরে আমি তার না
সতীর জননী আমি শাশুড়ী তোমার
...প বিধবা দশা হইল আমার॥

ছাড়িয়া গেলেন সতী মরিলেন পতি।
তোমার না হয় দয়া কি হইবে গতি॥
তোমার শাশুড়ী বলি যম নাহি লয়।
আমারে কাহারে দিবা কহ দয়াময়॥
প্রসূতির বাক্যে শিব সলজ্জ হইলা।
রাজা সহ দক্ষরাজে বাঁচাইয়া দিলা॥
ধড়ে মুণ্ড নাহি দক্ষ দেখিতে না পায়।
উঠে পড়ে ফিরে ঘুরে কবন্ধের ন্যায়॥
দক্ষের দুর্গতি দেখি হাসে ভূতগণ।
প্রসূতি বলিছে প্রভু এ কি বিড়ম্বন॥
বিধাতা বিষ্ণুর সহ করিয়া মন্ত্রণা।
কহিলেন খণ্ডিবারে দক্ষের যন্ত্রণা॥
শ্বশুর তোমার দক্ষ সম্বন্ধ গৌরব।
ইহারে উচিত নহে এতেক রৌরব॥
অপরাধ ক্ষমিয়া যদ্যপি দিলা প্রাণ।
কৃপা করি মুণ্ড দেহ কর জ্ঞানবান॥
শুনিয়া নন্দিরে শিব কহিলা হাসিয়া।
কার মুণ্ড দিবা দক্ষে দেখহ ভাবিয়া॥
নন্দি বলে তব নিন্দা করিয়াছে
ছাগ মুণ্ড হইবে সতীর আছে

শুনিয়া সম্মতি দিলা শিব মহাশয়।
যেমন করিল কর্ম্ম উপযুক্ত হয়॥
শিববাক্যে নন্দি এক ছাগল কাটিয়া।
মুণ্ড আনি দক্ষস্কন্ধে দিলেক আঁটিয়া॥
মিলন হইল ভাল হর দিলা বর।
শঙ্করের স্তুতি দক্ষ করিল বিস্তর॥
তুমি ব্রহ্ম তুমি ব্রহ্মা তুমি হরি হর।
তুমি জল তুমি বায়ু তুমি চরাচর॥
তুমি আদি তুমি অন্ত তুমি মধ্য হও।
পঞ্চভূতময় পঞ্চভূতময় নও॥
নিরাকার নির্গুণ নিঃসীম নিরুপম।
না জানি করিনু নিন্দা অপরাধ ক্ষম॥
বন্দিবার ফলে হৈল পূর্ব্বের সকল।
নিন্দিবার চিহ্ন রৈল বদন ছাগল॥
বিধি বিষ্ণু আদি সবে দক্ষেরে লইয়া
যজ্ঞ পূর্ণ কৈল শিবে অগ্রভাগ দিয়া॥
যজ্ঞস্থানে সতীদেহ দেখিয়া শঙ্কর।
বিস্তর রোদন কৈলা কহিতে বিস্তর॥
শিরে লয়ে সতীদেহ করিলা গমন।
... গেয়ে স্থানে স্থানে করেন ভ্রমণ

বিধি সঙ্গে মন্ত্রণা করিলা গদাধর।
সতীদেহ থাকিতে না ছাড়িবেন হর॥
তথায় সতীর দেহ গিয়া চক্রপাণি।
কাটিলেন চক্রধারে করি খানি খানি॥

শিব বিবাহের মন্ত্রণা।

উদাসীন দেখি হরে বিধি গদাধর।
মন্ত্রণা করিলা লয়ে যতেক অমর॥
ত্রিদিবে প্রধান দেব দেবদেব শিব।
শিব হৈলা শক্তিহীন কেবা কি করিব॥
নানামত মন্ত্রণা করিয়া দেব সব।
মহামায়া উদ্দেশে বিস্তর কৈলা স্তব॥
হইল আকাশবাণী সকলে শুনিলা।
মহামায়া হিমালয় আলয়ে জন্মিলা॥
তাঁহার সহিত হবে শিবের বিবাহ।
তবে সে সর্ব্বের হবে সংসার নির্ব্বাহ॥
আকাশবাণীতে পেয়ে দেবীর উদ্দেশ।
নারদেরে ডাকিয়া কহিলা হৃষীকেশ॥

ঘটক হইয়া তুমি হিমালয়ে যাও।
উমা সহ মহেশের বিবাহ ঘটাও ॥
একেত নারদ আরো বিষ্ণুর আদেশ।
শিবের বিবাহ তাহে বাড়িল আবেশ ॥
জনকের জননীর দেখিব চরণ।
আর কবে হব হেন ভাগ্যের ভাজন ॥
সাজিয়া বীণার তার মিশাইয়া তান।
ভারতের অভিমত গৌরীগুণ গান ॥

নারদের গান

জয় দেবি জগম্ময়ি দীনদয়াময়ি
শৈলসুতে করুণানিকরে।
জয় চণ্ডবিনাশিনি মুণ্ডনিপাতিনি
দুর্গবিঘাতিনি মুখ্যতরে ॥
জয় কালি কপালিনি মস্তকমালিনি
খর্পরধারিণি শূলধরে।
চণ্ডি দিগম্বরি ঈশ্বরি শঙ্করি
কৌষিকি ভারতভীতিহরে ॥

শিববিবাহের সম্বন্ধ।

এ রূপে নারদ মুনি বীণা বাজাইয়া।
উত্তরিলা হিমালয়ে নাচিয়া গাইয়া॥
দেখেন বাহিরে গৌরী খেলিছেন রঙ্গে
চৌষট্টি যোগিনী কুমারীর বেশ সঙ্গে॥
মৃত্তিকার হর গৌরী পুত্তলি গড়িয়া।
সহচরীগণ মেলি দিতেছেন বিয়া॥
দেখি নারদের মনে হৈল চমৎকার।
এ কি কৈলা মহামায়া মায়া অবতার॥
দণ্ডবৎ হয়ে মুনি করিলা প্রণাম।
আজি বুঝিলাম সিদ্ধ হৈল হরিনাম॥
অভীষ্ট হউক সিদ্ধ বর দিয়া মনে।
নারদে কহিলা দেবী গর্ব্বিত ভৎর্সনে॥
শুন ব্রহ্ম ব্রাহ্মণ ঠাকুর মহাশয়।
আমারে প্রণাম কর উপযুক্ত নয়॥
অপায়ু করিবে বুঝি ভাবিয়াছ মনে।
দেখিয়া এমন কর্ম্ম করিলা কেমনে॥
মুনি বলে এ ভয় দেখাও তুমি কা
তোমার কৃপায় ভয় না করি তোম

আমারে বুঝিলা বৃদ্ধ বালিকা আপনি।
ভেবে দেখ তুমি মোর বাপের জননী ॥
নাতি জ্ঞানে বুড়া বলি হাসিছ আমারে।
পাকা দাড়ি বুড়া বর ঘটাব তোমারে ॥
আনিব এমন বর বায়ে নড়ে দাঁত।
ঘটক তাহার আমি জানিবা পশ্চাৎ ॥
বিবাহের নামে দেবী ছলে লজ্জা পেয়ে।
কহি গিয়া মায়ে বলি ঘরে গেলা ধেয়ে ॥
আল্যা করি কোলে বসি ছেদে ধরি গলে
ওমা ওমা বলি উমা কথা কন ছলে।
সখী মেলি খেলিনু বাহির বাড়ি গিয়া।
ধূলা ঘরে দিতেছিনু পুতুলের বিয়া ॥
কোথা হৈতে বুড়া এক ডোকরা বামণ।
প্রণাম করিল মোরে এ কি অলক্ষণ ॥
নিষেধ করিনু তারে প্রণাম করিতে।
কত কথা কহে বুড়া না পারি কহিতে ॥
দুটা লাউ বান্ধা কান্ধে কাঠ এক খান।
বাজাইয়া নাচিয়া নাচিয়া করে গান ॥
ভাবে বুঝি সে বামণ বড় কন্দলিয়া।
দেখিবে যদ্যপি চল বাপেরে লইয়া ॥

কি কাজ মুক্তায় হাড়ের মালায়
কন্যার মা হবে লোভা॥
কস্তুরী কেশরে চন্দনে কি করে
ঘন করি মাখ ছাই।
কি করে মণিতে যে শোভা ফণিতে
হেন বর কোথা পাই॥
ফুলমালা যত শোভা দিবে কত
যে শোভা মুণ্ডের মালে।
কাপড়ে কি শোভা জগমনলোভা
যে শোভা বাঘের ছালে॥
রথ হস্তী আর কি কাজ তোমার
যে বুড়া বলদ আছে।
তোমার যে গুণ কব কোটি গুণ
আমি মেনকার কাছে॥
অধিক করিয়া সিদ্ধি মিশাইয়া
ধুতুরা খাইতে হবে।
নাহ্নত বিবাহ না হবে নির্ব্বাহ
উপবাস তবে রবে॥
এ রূপ করিয়া বর সাজাইয়া
হর লয়ে মুনি যায়।

হেন কালে বর আসি কৈলা অধিষ্ঠান।
সম্ভ্রমে উঠিয়া সবে কৈলা অভ্যুত্থান॥
বর দেখি হিমালয় হৈলা হতবুদ্ধি।
ভূতগণে দেখিয়া উড়িল ভূতশুদ্ধি॥
কহিতে না পারে দক্ষযজ্ঞ ভাবি মনে।
ভুলিয়া বসিলা গিরি বরের আসনে॥
ভবানীর ভাবে ভব ঢুলিয়া ঢুলিয়া।
গিরির আসনে গিয়া বসিলা ভুলিয়া॥
*বিধি তাহে বিধি দিলা এ এক নিয়ম।
তদবধি বিবাহেতে হৈল ব্যতিক্রম॥
কুশহস্ত হিমালয় বিধির বিহিত।
হেন কালে জিজ্ঞাসা করিল পুরোহিত॥
কে পিতা কে পিতামহ কে প্রপিতামহ।
কিবা গোত্র কয় বা প্রবর বর কহ॥
হেঁট মুখে পঞ্চানন ভাবিতে লাগিলা।
বিষয় বুঝিয়া বিধি বিশেষ কহিলা॥
স্মরহর বর বরপিতা পুরহর।
পিতামহ সংহর প্রপিতামহ হর॥
শিব গোত্র শম্ভু সর্ব্ব শঙ্কর প্রবর।
শুনিয়া বিধিরে চাহি হাসিলেন হর॥

এ রূপে গিরিশে গিরি গৌরী দান দিল।
স্ত্রী আচার করিবারে মেনকা আইলা॥
কেশব কৌতুকী বড় কৌতুক দেখিতে।
নারদেরে কহিলা কন্দল লাগাইতে॥

কন্দল ও শিবনিন্দা।

কান্দে রাণী মেনকা চক্ষুর জলে ভাসে।
নখে নখ বাজায়ে নারদ মুনি হাসে॥
কন্দলে পরমানন্দ নারদের ঢেঁকী।
আঁকশলী পোয়া মোনা গড়ে মেকামেকি।
পাখা নাহি তবু ঢেঁকী উড়িয়া বেড়ায়।
কোণের বছড়ী লয়ে কন্দলে জড়ায়॥
সেই ঢেঁকী চড়ে মুনি কাঁধে বীণা যন্ত্র।
দাড়ী লড়ে ঘন পড়ে কন্দলের মন্ত্র॥
আয় রে কন্দল তোরে ডাকে সদাশিব।
মেয়ে গুলা মাথা কোড়ে তোরে রক্ত দিব॥
বেনা ঝোড়ে ঝুটি বাঁধি কি কর বসিয়া।
এয়ো স্থুয়া এক ঠাঁই দেখ রে আসিয়া॥
ঘুরুলে বাতাস লয়ে জলের ঘুরুলে।
সেহাকুল কাঁটা হাতে বাট এসো চলে॥

এক ঠাঁই এতো মেয়ে দেখা নাহি যায়
দোহাই চণ্ডীর তোরে আয় আয় আয়
নারদের মন্ত্র তন্ত্র না হয় নিষ্ফল।
পরস্পর এয়োগণে বাজিল কন্দল॥
এই রূপে কন্দলে লাগিল ঝুটাঝুটি।
ডাকাডাকি গালাগালি-মাথা কুটাকুটি॥
দাঁড়াইয়া পিঁড়ায় হাসেন পশুপতি।
হেটমুখে মৃদু মন্দ হাসেন পার্ব্বতী॥
হর হর বলিয়া ডাকিছে ভূত যত।
হরিষ বিষাদে হিমালয় জ্ঞানহত॥
ভূত ভয়ে এয়োগণ নীরব রহিছে।
ডুকরিয়া ফুকরিয়া মেনকা কহিছে॥
আহা মরি ও মা উমা সোণার পুতুল।
বুড়ারে কে বলে বর কেবল বাতুল॥
পায়ে পড়ে আমার উমার কেশ পাশ
বুড়ার বিকট জটা পরশে আকাশ॥
আমার উমার দন্ত মুকুতা গঞ্জন।
বায়ে লড়ে ভাঙ্গা বেড়া বুড়ার দশন॥
উমার বদন চাঁদে পরকাশে রাকা।
বুড়ার বিকট মুখে দাড়ী গোঁফ পাকা॥

কি শোভা উমার গায়ে সুগন্ধি চন্দন।
ছাই মাখে অঙ্গে বুড়া এ কি অলক্ষণ॥
উমার গলায় জাতী মালতীর মালা।
বুড়ার গলায় হাড়মালা এ কি জ্বালা॥
বিচিত্র বসন উমা পরে কত বন্ধে।
বাঘছাল পরে বুড়া আঁত উঠে গন্ধে॥
উমার রতন কাঞ্চী ভ্রমর গুঞ্জরে।
বুড়ার কোমর বন্ধ ফণী ফোঁস ধরে॥
নিছনি করিতে গেনু লয়ে তৈল কুড়।
সাপে খেয়ে ছিল প্রায় বাঁচালে গরুড়॥
আহা মরি বাছা উমা কি তপ করিলে।
সাপুড়ের ভূতুড়ের কপালে পড়িলে॥

শিবের মোহন বেশ।

শিবনিন্দা করিয়া মেনকা যত কহে।
দক্ষেরে হইল মনে উমারে না সহে॥
যে দুঃখে দক্ষের ঘরে তেজিলাম কায়।
এখানে মেনকা বুঝি ফেলে সেই দায়॥

হর লয়ে নরলীলা করিবারে চাই।
তাহে হয় শিবনিন্দা এ বড় বালাই॥
কি জানি শিবের মনে পাছে হয় ক্রোধ
কৃপা করি মেনকারে উমা দিলা বোধ॥
মেনকার হৈল জ্ঞান দেবীর দয়ায়।
মনোহর বর হরে দেখিবারে পায়॥
জটাজূট মুকুট দেখিলা ফণি মণি।
বাঘছাল দিব্য বস্ত্র দিব্য পৈতা ফণি॥
ছাই দিব্য চন্দন বদন কোটি চাঁদ।
মুগ্ধ হৈল সর্ব্বজন দেখিয়া সুছাঁদ॥
হরগুণ বরগুণ হৈল এক ঠাঁই।
মেনকা আনন্দে ঘরে লইলা জামাই॥
এই রূপে হরগৌরী বিবাহ হইল।
হিমালয় মেনকার আনন্দ বাড়িল॥
কুতূহলে হুলাহুলি দেয় এয়োগণ।
ঋষিগণ বেদগানে পূরিল ভুবন॥
কিন্নর করয়ে গান নাচয়ে অপ্সর।
অশেষ কৌতুক করে যত বিদ্যাধর॥
উমা লয়ে উমাপতি গেলেন কৈলাস।
বিধি বিষ্ণু আদি সবে গেলা নিজ বাস।

ভারতের অনুভবে ভাঙ্গে কি ভুলাবে ভবে
ভবানী ভাবেন ভব ভাবভরাকুল।
সিদ্ধি ঘুটি আনি নন্দী অন্তরে দাঁড়ায়।
বেতাল ভৈরবগণ নাচিয়া বেড়ায়॥
সম্মুখে থুইয়া সিদ্ধি মুদিয়া নয়ন।
বিজয়ার বীজমন্ত্র জপি পঞ্চানন॥
অঙ্গুলির অগ্রভাগে অগ্র ভাগ লয়ে।
ভবানীর নামে দিলা একভাব হয়ে॥
ছোঁয়াইয়া চক্ষে মন্ত্র পড়িয়া বিশেষ।
একই নিশ্বাসে পিয়া করিলা নিঃশেষ॥
হুঙ্কার ছাড়িয়া সবে মগন হইয়া।
আকুল হইলা বড় নকুল লাগিয়া॥
নকুল করিব কি রে কহেন নন্দিরে।
ভৃঙ্গী কহে মহাপ্রভু কি আছে মন্দিরে॥
[illegible] বলে আজি ঘরে মাতা উপস্থিত।
মেনকা মেলানী ভার দিয়াছে কিঞ্চিত॥
হাসিয়া কহেন হর ভালা মোর ভাই।
বড় কথা মনে কৈলি আন দেখি তাই॥
অসঙ্খ্য মেলানী ভার নকুলে উড়িল।
সহচর গণ সবে ভাবিতে লাগিল॥

শঙ্কর কহেন নন্দি সবারে ডাকাও।
সকলে সিদ্ধির শেষ পরসাদ পাও॥
সকলে বাঁটিয়া লও কিঞ্চিত কিঞ্চিত।
সাবধান কেহ যেন না হয় বঞ্চিত॥
আজ্ঞামত পূর্ণ করি সকলে পাইলা।
নকুলের শেষ নাহি ভাবিতে লাগিলা॥
ভবানীর কাছে গিয়া নন্দী দেয় লাজ।
আগো মাতা তোমার মায়ের দেখ কাজ॥
এমন মেলানীভার দিল আই বুড়ী।
জামাইর সিদ্ধির নকুলে গেল উড়ী॥
আমরা নকুল করি এমন কি আছে।
তুমি আজ্ঞা দিলে যাই মেনকার কাছে॥
হাসিয়া কহেন দেবী অরে বাছা সব।
তোমা সবাকার কেবা সহে উপদ্রব॥
আই বলি যাহ যদি মোর মার ঠাঁই।
যে বুঝি তাহার চালে খড় রবে নাই॥
তোমরা আমার মায়ে কি দোষ পাইলে।
ফুরাইবে নাহি দ্রব্য বৎসর খাইলে॥
কে বলে মেলানীভারে নাহি আয়োজন।
আন রে মেলানীভার দেখিব কেমন॥

মায়া কৈলা মহামায়া মায়ের কারণ।
পূরিল মেলানীভার পূর্ব্বের যেমন॥
দেখিয়া সানন্দ ভূত ভৈরব সকল।
খাইতে লাগিল সবে মহাকুতূহল॥
জয় জয় হর গৌরি বলিয়া বলিয়া।
নাচিয়া বেড়ায় সবে করতালি দিয়া॥

হরগৌরীর কথোপকথন।

আমারে ছাড়িও না। ভবানি!
সুশীলা হইয়া শিলায় জন্মিয়া
শিলাময়হিয়া হইও না।
এবার পাথারে ফেলিয়া আমারে
দোষ বারে বারে লইও না॥
শিশুগণ মিলা যেন খেলা দিলা
তেমন এখানে খেলিও না।
তব মায়াছান্দে বিশ্ব পড়ি কান্দে
ভারতে এ ফেরে ফেলিও না।
আনন্দ সাগরে হর মগন হইলা।
বিনয়ে দেবীর প্রতি কহিতে লাগিলা।
তুমি মূল প্রকৃতি সকল বিশ্বসার।

কৃপা করি আমারে করিলে অঙ্গীকার॥
দক্ষযজ্ঞে আমার নিন্দায় দেহ ছাড়ি।
এত দিন ছিলা গিয়া হেমন্তের বাড়ি॥
ভাগ্যে সে তোমার দেখা পানু আরবার।
সত্য করি কহ মোরে না ছাড়িবে আর॥
হাসিয়া কহেন দেবী তোমা ছাড়া নই।
শঙ্কর কহেন তবে এস এক হই॥
অঙ্গে অঙ্গে তোমার আমার অঙ্গে অঙ্গে।
হরগৌরী এক তনু হয়ে থাকি রঙ্গে॥
শুনিয়া কহেন দেবী সহাসবদনে।
সমভাবে দোঁহে এক হইবে কেমনে॥
পাঁচ মুখ তোমার আমার এক মুখ।
সমভাগে অর্দ্ধভাগে তুমি পাবে দুখ॥
দশ হাত তোমার আমার দুটি হাত।
সমভাগে অর্দ্ধভাগে হইবে উৎপাত॥
শঙ্কর কহেন শুন পূর্ব্ব সমাচার।
এক মুখ দুই হাত আছিল আমার॥
ঊর্দ্ধ মুখে আগমে তোমার গুণ গাই।
দুই ভুজ ঊর্দ্ধ করি তোমারে ধেয়াই॥
চারি বেদে তব গুণ গান করিবারে।

চারি মুখ দিলা তুমি অধিক আমারে ॥
চারি তাল ধরিতে অধিক আট হাত।
দিয়াছ আপনি পুর্ব্বে নিন্দহ পশ্চাত ॥
এত বলি একমুখ দ্বিভুজ হইলা।
সাক্ষি করি এক মুখ রুদ্রাক্ষে রাখিলা ॥
হাসিয়া কহেন দেবী হইলা সমান।
হরগৌরী এক হই ইথে নাহি আন ॥
দুই জনে সহাসবদনে রসরঙ্গে।
হরগৌরী এক হৈলা দুই অর্দ্ধ অঙ্গে ॥
এই রূপে হরগৌরী করেন বিহার।
গজানন ষড়ানন হইল কুমার ॥

হরগৌরী রূপ।

আধ বাঘছাল ভাল বিরাজে
আধ পটাম্বর সুন্দর সাজে
আধ মণিময় কিঙ্কিণী বাজে
আধ ফণিফণা ধরি রে।
আধই হৃদয়ে হাড়ের মালা
আধ মণিময় হার উজালা
আধ গলে শোভে গরল কালা
আধই সুধামাধুরী রে ॥

প্রেত ভূতগণ ধায় অগণন
আন্ধার কৈল ধুলায় ॥
ঝুপ ঝুপ ঝাপ দুপ দুপ দাপ
লম্পা ঝম্পা দিয়া চলে।
মহাধুম ধাম হাঁকে হুম হাম
জয় মহাদেব বলে ॥
সহজে সবার বিকট আকার
সহিতে না পারে আল।
থাবায় থাবায় মসাল নিবায়
আন্ধারে শোভিল ভাল ॥
করতালী দিয়া বেড়ায় নাচিয়া
হাসে হিহি হিহি হিহি।
দন্ত কড়মড়ি করে জড়াজড়ি
লক লক লক জীহি ॥
করে চড়াচড়ি ধায় রড়ারড়ি
কিলাকিলি গণ্ডগোল।
কে কারে আছাড়ে কে কারে পাছাড়ে
কে মানে কাহার বোল ॥
তরু উপাড়িয়া গিরি উখাড়িয়া
কৈল প্রলয়ের ঝড়।

বর যাত্র গণ লইয়া জীবন
পলাইল দিয়া রড় ॥
ইন্দ্রাদি পলায় অন্য কেবা তায়
দেখিয়া আনন্দ হরে।
আগে ভাগে হরি বিধি সঙ্গে করি
গেলা হেমন্তের ঘরে ॥
হিমগিরিরাজ করিয়া সমাজ
বসি পুরোহিত সাথ।
বলদে চড়িয়া শিঙ্গা বাজাইয়া
এলা বর ভূতনাথ ॥
যত কন্যা যাত্র দেখিয়া সুপাত্র
বলে এ কেমন বর।
বরযাত্র গণে দেখি ভয় মনে
না সরে কার উত্তর ॥

শিব বিবাহ।

সভামাঝে হিমালয় পূর্ব্ব মুখ হয়ে।
বসিয়াছে দান সজ্জা বাম দিকে লয়ে।
উত্তরাস্যে রাখিয়াছে বরের আসন।
পরস্পর শাস্ত্রকথা কহে ধীরগণ ॥

এক হাতে শোভে ফণি ভূষণ
এক হাতে শোভে মণিকঙ্কণ
আধ মুখে ভাঙ্গ ধুতূরা ভক্ষণ
আধই তাম্বূল পূরি রে।
ভাঙ্গে ঢুলু ঢুলু এক লোচন
কজ্জলে উজ্জ্বল এক নয়ন
আধ ভালে হরিতাল সুশোভন
আধই সিন্দূর পূরি রে॥
কপাল লোচন আধই আধে
মিলন হইল বড়ই সাধে
দুই ভাগ অগ্নি এক অবাধে
হইল প্রণয় করি রে॥
দোঁহার আধ আধ আধ শশী
শোভা দিল বড় মিলিয়া বসি
আধ জটাজূট গঙ্গা সরসী
আধই চারু কবরী রে॥
এক কাণে শোভে ফণি মণ্ডল
এক কাণে শোভে মণিকুণ্ডল
আধ অঙ্গে শোভে বিভূতি ধবল
আধই গন্ধ কস্তুরী রে।

কৈলাস বর্ণন।

কৈলাস ভূধর অতিমনোহর
কোটি শশি পরকাশ।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর যক্ষ বিদ্যাধর
অপ্সর গণের বাস॥
রজনী বাসর মাস সংবৎসর
দুই পক্ষ সাত বার।
তন্ত্র মন্ত্র বেদ কিছু নাহি ভেদ
সুখ দুঃখ একাকার॥
তরু নানাজাতি লতা নানাভাতি
ফলে ফুলে বিকসিত।
বিবিধ বিহঙ্গ বিবিধ ভুজঙ্গ
নানা পশু সুশোভিত॥
অতি উচ্চতরে শিখরে শিখরে
সিংহ সিংহনাদ করে।
কোকিল হুঙ্কারে ভ্রমর ঝঙ্কারে
মুনির মানস হরে॥
মৃগ পালে পাল শার্দ্দূল রাখাল
কেশরী হস্তিরাখাল।

ময়ূর ভুজঙ্গে ক্রীড়া করে রঙ্গে
ইন্দুরে পোষে বিড়াল ॥
সবে পিয়ে সুধা নাহি তৃষ্ণা ক্ষুধা
কেহ না হিংসয়ে কারে।
যে যার ভক্ষক সে তার রক্ষক
সার অসার সংসারে ॥
সম ধর্ম্মাধর্ম্ম সম কর্ম্মাকর্ম্ম
শত্রু মিত্র সমতুল।
জরা মৃত্যু নাই অপরূপ ঠাঁই
কেবল সুখের মূল ॥
চৌদিকে দুস্তর সুধার সাগর
কল্পতরু সারি সারি।
মণিবেদীপরে চিন্তামণি ঘরে
বসি গৌরী ত্রিপুরারি ॥

হরগৌরীর বিবাদ সূচনা।

বিধি মোরে লাগিল রে বাদে।
বিধি যার বিবাদী কি সাদ তার সাদে ॥
এ বড় বিষম ধন্দ
যত করি ছন্দ বন্দ

ভাল ভাবি হয় মন্দ
পড়িনু প্রমাদে।
ধর্ম্মে জানি সুখ হয়
তবু মন নাহি লয়
অধর্ম্মে বিবিধ ভয়
তবু তাই স্বাদে॥
মিছা দারা সুত লয়ে
মিছা সুখে সুখী হয়ে
যে রহে আপনা কয়ে
সে মজে বিষাদে॥
সত্য ইচ্ছা ঈশ্বরের
আর সব মিছা ফের
ভারত পেয়েছে টের
গুরুর প্রসাদে॥
শঙ্কর কহেন শুন শুনহ শঙ্করি।
ক্ষুধায় কাঁপয়ে অঙ্গ বলহ কি করি॥
নিত্য২ ভিক্ষা মাগি আনিয়া যোগাই।
সাদ করে এক দিন পেট ভরে খাই॥
সকলের ঘরে ঘরে নিত্য ফিরি মেগে।
সরম ভরম গেল উদরের লেগে॥

ভিক্ষা মাগি ভিক্ষা মাগি কাটিলাম কাল।
তবু ঘুচাইতে নারিলাম বাঘছাল॥
আর সবে ভোগ করে কত মত সুখ।
কপালে আগুন মোর না ঘুচিল দুখ॥
নীচ লোকে উচ্চ ভাষে সহিতে না পারি।
ভিক্ষা মাগি নাম হৈল শঙ্কর ভিখারি॥
বিধাতার লিখন কাহার সাধ্য খণ্ডি।
গৃহিণী ভাগ্যের মত পাইয়াছি চণ্ডী॥
সর্ব্বদা কন্দল বাজে কথায় কথায়।
রস কথা কহিতে বিরস হয়ে যায়॥
কিবা শুভক্ষণে হৈল অলক্ষণ ঘর।
খাইতে না পানু কভু পূরিয়া উদর॥
আর আর গৃহির গৃহিণী আছে যারা।
কত মতে স্বামির সেবন করে তারা॥
অনির্ব্বাহে নির্ব্বাহ করিয়ে কত দায়।
আহা মরি দেখিলে চক্ষুর পাপ যায়॥
পরম্পরা পরম্পর শুনি এই সূত্র।
স্ত্রীভাগ্যে ধন পুরুষের ভাগ্যে পুত্র॥
এই রূপে দুই জনে বাড়িছে বাক্ ছল।
ভারতে বিদিত ভাল দুঃখের কন্দল॥

হরগৌরীকন্দল।

কেবা এমন ঘরে থাকিবে॥ জয়া।
এ দুঃখ সহিতে কেবা পারিবে॥
আপনি মাখেন ছাই আমারে কহেন তাই
কেবা বালাই ছাই মাখিবে॥
দামাল ছাবাল দুটি অন্ন চাহে ভূমে লুটি
কথায় ভুলায়ে কেবা রাখিবে॥
বিষ পানে নাহি ভয় কথা কৈতে ভয় হয়
উচিত কহিলে দ্বন্দ্ব বাড়িবে॥
মা বাপ পাষাণ হিয়া হেন ঘরে দিল বিয়া
ভারত এ দুখে ঘর ছাড়িবে॥
শিবার হইল ক্রোধ শিবের বচনে।
ধক ধক জ্বলে অগ্নি ললাটলোচনে॥
শুনিলি বিজয়া জয়া বুড়াটির বোল!
আমি যদি কই তবে হবে গণ্ডগোল॥
হায় হায় কি কহিব বিধাতা পাষণ্ডী।
চণ্ডের কপালে পড়ে নাম হৈল চণ্ডী॥
গুণের না দেখি সীমা রূপ ততোধিক।
বয়সে না দেখি গাছ পাথর বাল্মীক॥

সম্পদের সীমা নাই বুড়া গরু পুঁজি।
রসনা কেবল কথাসিন্দুকের কুঁজি॥
কড়া পাড়িয়াছে হাতে অন্ন বস্ত্র দিয়া।
কেন সব কটু কথা কিসের লাগিয়া॥
আমার কপাল মন্দ তাই নাই ধন।
উহাঁর কপালে সবে হয়েছে নন্দন॥
কেমনে এমন কন লাজ নাহি হয়।
কহিবারে পারি কিন্তু উপযুক্ত নয়॥
অলক্ষণা সুলক্ষণা যে হই সে হই।
মোর আসিবার পূর্ব্বকালি ধন কই॥
গিয়াছিলে বুড়াটি যখন বর হয়ে।
গিয়াছিলে মোর তরে কত ধন লয়ে॥
বুড়া গরু লড়া দাঁত ভাঙ্গা গাছ গাড়ু।
ঝুলি কাঁথা বাঘছাল সাপ সিদ্ধি লাড়ু॥
তখন যে ধন ছিল এখন সে ধন।
তবে মোরে অলক্ষণা কন কি কারণ॥
উহাঁর ভাগ্যের বলে হইয়াছে বেটা।
কারে কব এ কৌতুক বুঝিবেক কেটা॥
বড় পুত্র গজমুখ চারি হাতে খান।
সবে গুণ সিদ্ধি খেতে বাপের সমান॥

ভিক্ষা মাগি খুদ কোণ যে পান ঠাকুর।
তাঁহার ইন্দূরে করে কাটুর কুটুর ॥
ছোট পুত্র কার্ত্তিকেয় ছয় মুখে খায়।
উপায়ের সীমা নাই ময়ূরে উড়ায় ॥
উপযুক্ত দুটি পুত্র আপনি যেমন।
সবে ঘরে আমি মাত্র এই অলক্ষণ ॥
করেতে হইল কড়া সিদ্ধি বেটে বেটে।
তৈল বিনা চুলে জটা অঙ্গ গেল ফেটে ॥
শাঁখা শাড়ী সিন্দূর চন্দন পান গুয়া।
নাহি দেখি আয়তি কেবল আচাভুয়া ॥

শিবের ভিক্ষা যাত্রা।

ভবানীর কটু ভাষে লজ্জা হৈল কৃত্তিবাসে
ক্ষুধানলে কলেবর দহে।
বেলা হৈল অতিরিক্ত পিত্তে হইল গলা তিক্ত
বৃদ্ধ লোকে ক্ষুধা নাহি সহে ॥
হেটমুখে পঞ্চানন নন্দিরে ডাকিয়া কন
বৃষ আন যাইব ভিক্ষায়।
আন শিঙ্গা হাড় মাল ডমরু বাঘের ছাল
বিভূতি লেপিয়া দেহ গায় ॥

আন রে ত্রিশূল ঝুলি প্রমথ সকল গুলি
যত গুলি ধুতূরার ফল।
থলি ভরা সিদ্ধিগুঁড়া লহ রে ঘোটনা কুঁড়া
জটায় আছয়ে গঙ্গাজল॥
ঘর উজাড়িয়া যাব ভিক্ষায় যে পাই খাব
অদ্যাবধি ছাড়িনু কৈলাস।
নারী যার স্বতন্তরা সে জন জিয়ন্তে মরা
তাহারে উচিত বনবাস॥
বৃদ্ধ কাল আপনার নাহি জানি রোজগার
চাসবাস বাণিজ্যব্যাপার।
সকলে নির্গুণ কয় ভুলায়ে সর্ব্বস্ব লয়
নাম মাত্র রহিয়াছে সার॥
যত আনি তত নাই না ঘুচিল খাই খাই
কিবা সুখ এ ঘরে থাকিয়া।
এত বলি দিগম্বর আরোহিয়া বৃষবর
চলিলেন ভিক্ষার লাগিয়া॥
শিবের দেখিয়া গতি শিবা কন ক্রোধমতি
কি করিব একা ঘরে রয়ে।
বৃথা কেন দুঃখ পাই বাপের মন্দিরে যাই
গণপতি কার্ত্তিকেয় লয়ে॥

হইয়া বিরস মন লয়ে গুহ গজানন
হিমালয়ে চলিলা অভয়া।
ভারত বিনয়ে কয় এমন উচিত নয়
নিষেধ করিয়া কহে জয়া॥

জয়ার উপদেশ।

কহে সখী জয়া শুন গো অভয়া
এ কি কর ঠাকুরালি।
ক্রোধে করি ভর যাবে বাপ ঘর
খেয়াতি হবে কাঙ্গালি॥
মিছা ক্রোধ করি আপনা পাসরি
কি কর ছাবালখেলা।
সুখ মোক্ষ ধাম অন্নপূর্ণা নাম
সংসার সাগর ভেলা॥
অন্নপূর্ণা হয়ে অন্ন দেহ কয়ে
দাঁড়াবে কাহার কাছে।
দেখিয়া কাঙ্গালি সবে দিবে গালি
রহিতে না দিবে নাছে॥
জননীর আগে যাবে পিতৃবাসে
ভাজে দিবে সদা তাড়া

ববম্ ববম্ বম্ ঘন বাজে গাল।
ভভম্ ভভম্ ভম্ শিঙ্গা বাজে ভাল॥
ডিমি ডিমি ডিমি ডিমি ডমরু বাজিছে।
তা ধিয়া তা ধিয়া ধিয়া পিশাচ নাচিছে॥
দূরে হৈতে শুনা যায় মহেশের শিঙ্গা।
শিব এল বলে ধায় যত রঙ্গ চিঙ্গা॥
কেহ বলে ওই এল শিব বুড়া কাপা।
কেহ বলে বুড়াটি খেলাও দেখি সাপ॥
কেহ বলে জটা হৈতে বার কর জল।
কেহ বলে জ্বাল দেখি কপালে অনল॥
কেহ বলে ভাল করি শিঙ্গাটি বাজাও।
কেহ বলে ডমরু বাজায়ে গীত গাও॥
কেহ বলে নাচ দেখি গাল বাজাইয়া।
ছাই মাটি কেহ গায় দেয় ফেলাইয়া॥
কেহ আনি দেয় ধুতূরার ফুল ফল।
কেহ দেয় ভাঙ্গ পোস্ত আফিঙ্গ গরল॥
আর আর দিন তাহে হাসেন গোসাঁই।
ও দিন ওদন বিনা ভাল লাগে নাই॥
চেত রে চেত রে চেত ডাকে চিদানন্দ।
চেতনা যাহার চিত্তে সেই চিদানন্দ॥

বাপে না জিজ্ঞাসে মায়ে না সম্ভাষে
যদি দেখে লক্ষ্মীছাড়া॥
যা বলি তা কর নিজ মূর্ত্তি ধর
বস অন্নপূর্ণা হয়ে।
কৈলাস শিখর অন্নে পূর্ণ কর
জগতের অন্ন লয়ে॥
তিন ভূমণ্ডলে যে স্থলে যে স্থলে
যত যত অন্ন আছে।
কটাক্ষ করিয়া আনহ হরিয়া
রাখ আপনার কাছে॥
ফিরি ঘরে ঘর হইয়া ফাঁফর
কোথায় না পেয়ে অন্ন।
আপনি শঙ্কর আসিবেন ঘর
হইয়া অতি বিষণ্ণ॥

শিবের ভিক্ষা।

ওথায় ত্রিলোকনাথ বলদে চড়িয়া।
ত্রিলোক ভ্রমেন অন্ন চাহিয়া চাহিয়া॥
যেখানে যেখানে হর অন্ন হেতু যান।
হা অন্ন হা অন্ন বিনা শুনিতে না পান

যে জন চেতনামুখী সেই সদা সুখী।
যে জন অচেতচিত্ত সেই সদা দুখী ॥
এত বলি অন্ন দেহ কহিছেন শিব।
সবে বলে অন্ন নাই বলহ কি দিব ॥
কি জানি কি দৈব আজি হৈল প্রতিকূল।
অন্ন বিনা সবে আজি হয়েছি আকুল ॥
কান্দিছে আপন শিশু অন্ন না পাইয়া।
কোথায় পাইব অন্ন তোমার লাগিয়া ॥
আজি মেনে ফিরে মাগ শঙ্কর ভিকারি।
কালি এস দিব অন্ন আজিত না পারি ॥
এই রূপে শঙ্কর ফিরিয়া ঘর ঘর।
অন্ন না পাইয়া হৈলা বড়ই কাতর ॥
ক্রমে ক্রমে ত্রিভুবন করিয়া ভ্রমণ।
বৈকুণ্ঠে গেলেন যথা লক্ষ্মী নারায়ণ ॥
এস লক্ষ্মী অন্ন দেহ ডাকেন শঙ্কর।
ভারত কহিছে লক্ষ্মী হইলা ফাঁফর ॥

শিব প্রতি লক্ষ্মীর উপদেশ।

কহে লক্ষ্মী শুন গৌরীপতি।
কহিতে না বাক্য সরে অন্ন নাহি মোর ঘরে
আজি বড় দৈবের দুর্গতি ॥

আমি লক্ষ্মী সর্ব্ব ঠাঁই মোর ঘরে অন্ন নাই
ইহাতে প্রত্যয় কেবা করে।
শুনিয়া শঙ্কর কন ফিরিলাম ত্রিভুবন
এই কথা সকলের ঘরে ॥
গুখান হইল গুঁড়া না মিলিল খুদ কুঁড়া
ফিরিনু সকল পাড়া পাড়া।
হাভাতে যদ্যপি চায় সাগর শুকায়ে যায়
হেদে লক্ষ্মী হৈল লক্ষ্মীছাড়া ॥
লক্ষ্মী বলে অন্ন নাই আর যাব কার ঠাঁই
ভুবনে ভাবিয়া নাহি পাই।
গলে সাপ বান্ধি চাই তবু অন্ন নাহি পাই
কপালে দিলেক বিধি ছাই ॥
কত সাপ আছে গায় হাভাতেরে নাহি খায়
গলে বিষ সেহ নাহি বধে।
কপালে অনল জ্বলে সেহ না পোড়ায় বলে
না জানি মরিব কি ঔষধে ॥
ঘরে অন্ন নাহি যার মরণ মঙ্গল তার
তার কেন বিলাসের সাধ।
যার নারী সুতা সুত সদা অন্নকষ্টযুত
সর্ব্বদা তাহার অবসাদ ॥

দেখিয়া শিবের খেদ   লক্ষ্মী কয়ে দিলা ভেদ
কেন শিব করহ বিবাদ।
অন্ন পূর্ণা যার ঘরে   সে কান্দে অন্নের তরে
এ বড় মায়ার পরমাদ ॥
গৌরী অন্নপূর্ণা হয়ে   জগতের অন্ন লয়ে
কৈলাসে পাতিয়াছেন খেলা।
যতেক ব্রহ্মাণ্ড আছে   সকলি তাঁহার কাছে
তাঁরে কেন করিয়াছ হেলা ॥
আমার যুকতি ধর   কৈলাস গমন কর
আমি আদি সকলি সেখানে।
তোমারে কবার তরে   আমি আছিলাম ঘরে
এই আমি যাই সেই খানে ॥
এত বলি হরিপ্রিয়া   কৈলাসে রহিলা গিয়া
শিব গেলা ভাবিয়া চিন্তিয়া।
দেখি অন্নদার ক্রীড়া   শিবের হইল ব্রীড়া
তত্ত্ব কিছু না পান ভাবিয়া ॥
কত কোটি হরি হর   পদ্মাসন, পুরন্দর
কত কোটি ব্রহ্মাণ্ড মিলিত।
সুখে নানা রস খায়   স্তুতি পড়ে নাচে গায়
দেখি শিব হইলা মোহিত ॥

দেখি কোটি কোটি হরে স্থাণু স্থাণু হৈলা ডরে
অন্নপূর্ণা অন্তরে জানিয়া।
ভারতের উপরোধে বিসর্জ্জন দিয়া ক্রোধে
অন্ন দিলা নিকটে আনিয়া॥

শিবের ভোজন।

পঞ্চমুখে শিব খাবেন কত।
পূরেন উদর সাদের মত॥
পায়সপয়োধি সপ্‌সপিয়া।
পিষ্টকপর্ব্বত কচমচিয়া॥
চুকু চুকু চুকু চূষ্য চূষিয়া।
কচর মচর চর্ব্ব্য চিবিয়া॥
লিহ্ লিহ্ জিহে লেহ্ লেহিয়া।
চুমুকে চক চক পেয় পিয়া॥
জয় জয় অন্নপূর্ণা বলিয়া।
নাচেন শঙ্কর ভাবে ঢলিয়া॥
ঝিমিকে অবশ অলস অঙ্গে।
নাচেন শঙ্কর রঙ্গ তরঙ্গে॥
লটপট জটা লপটে পায়।
ঝর ঝর ঝরে জাহ্নবী তায়॥

গর গর গর গরজে ফণী।
দপ দপ দপ দীপয়ে মণি॥
ধক ধক ধক ভালে অনল।
ভর ভর ভর চান্দমণ্ডল॥
সর সর সরে বাঘের ছাল।
দলমল দোলে মুণ্ডের মাল॥
তাধিয়া তাধিয়া বাজয়ে তাল।
তাতা থেই থেই বলে বেতাল॥
ববম ববম বাজয়ে গাল।
ডিমি ডিমি বাজে ডম্বরু ভাল॥
ভভম ভভম বাজয়ে শিঙ্গা।
মৃদঙ্গ বাজয়ে তা থিঙ্গা থিঙ্গা॥
পঞ্চ মুখে গেয়ে পঞ্চম তালে।
নাচেন শঙ্কর বাজায়ে গালে॥
নাটক দেখিয়া শিব ঠাকুর।
হাসেন অন্নদা মৃদু মধুর॥
অন্নদা অন্ন দেহ এই যাচে।
ভারত ভুলিল ভবের নাচে॥

শিবের পঞ্চ তপ।

তপস্বী হইল হর অন্নদা ভাবিয়া।
লোভ মোহ কাম ক্রোধ আদি তেয়াগিয়া॥
জটা ভস্ম হাড়মালা শোভা হৈল বড়।
ব্রহ্মরূপ অন্নপূর্ণা ধ্যানে হৈলা দড়॥
বিছাইয়া মৃগছাল বসিলা আসনে।
করে লয়ে জপমালা মুদিতনয়নে॥
দিগম্বর বিভূতিভূষিত কলেবর।
গলে যোগপট্ট উপবীত বিষধর॥
বৈশাখে দারুণ রৌদ্রে তপস্যা দুষ্কর।
চৌদিকে জ্বালিয়া অগ্নি উপরে ভাস্কর॥
জ্যৈষ্ঠ মাসে এইরূপে পঞ্চতপ করি।
অন্নপূর্ণা ধ্যানে যায় দিবস শর্ব্বরী॥
আষাঢ়ে বরিষে মেঘ শিলা বজ্রাঘাত।
একাসনে বসিয়া রজনীদিনপাত॥
শ্রাবণে দারুণ বৃষ্টি রজনী বাসর।
একাসনে অনশনে ধ্যান নিরন্তর॥
ভাদ্র মাসে আট দিকে পরিপূর্ণ বান।
রজনী দিবস বসি একাসনে ধ্যান॥
আশ্বিনে অশেষ কষ্টে করেন কঠোর।

ছাড়িয়া আহার নিদ্রা তপ অতি ঘোর ॥
কার্ত্তিকে কঠোর বড় কহিবারে দায় ।
অনশনে রজনী দিবস কত যায় ॥
অতিশয় উগ্র অগ্রহায়ণে নীহার ।
উগ্র তপ করে উগ্র কহিতে অপার ॥
পৌষ মাসে দারুণ হিমানী পরকাশ ।
রাত্রিদিন জলে বাস নিত্য উপবাস ॥
বাঘের বিক্রম সম মাঘের শিশির ।
রাত্রি দিন জলে বসি কম্পিতশরীর ॥
ফাল্গুনে দারুণ তপ করেন শঙ্কর ।
উদয়াস্ত অস্তোদয় করিলা বিস্তর ॥
চৈত্রের বিচিত্র তপ কহিবেক কেবা ।
ঊর্দ্ধপদে অধোমুখে অনলের সেবা ॥
ভাবিয়া ভাবিয়া অনুভব করি ভব ।
পঞ্চমুখে বিবিধ বিধানে কৈলা স্তব ॥
অন্নপূর্ণা অন্নদাত্রী অবতীর্ণা হও ।
কাশীতে প্রকাশ হয়ে বিশ্বপূজা লও ॥
আনন্দকানন কাশী করিয়াছি স্থান ।
তব অধিষ্ঠান বিনা কেবল শ্মশান ॥
তুমি মূলপ্রকৃতি সকল বিশ্ব মূল ।

সেই ধন্য তুমি যারে হও অনুকূল ॥
তুমি সকলের সার অসার সকল।
যেখানে তোমার দয়া সেখানে মঙ্গল ॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ তোমার ভজনে।
সেই ধন্য তুমি দয়া কর যেই জনে ॥
সত্ত্ব রজ তমোগুণে প্রবেশিয়া তুমি।
সৃষ্টি কৈলা সুরলোক রসাতল ভূমি ॥
বিধি বিষ্ণু আমি আদি নানা মূর্ত্তি ধর।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় লীলায় নিত্য কর ॥
আনন্দকানন কাশী সানন্দ করিয়া।
বিহার করহ মোরে সদয়া হইয়া ॥

ব্রহ্মাদির তপ।

শিবের দেখিয়া তপ করিতে অন্নদাজপ
ব্রহ্মা হইলেন ব্রহ্মচারী।
একাসনে অনশনে অন্নদার ধ্যান মনে
অক্ষসূত্র কমণ্ডলুধারী ॥
গদা চক্র তেয়াগিয়া পাঞ্চজন্য বাজাইয়া
অন্নদা উদ্দেশে পদ্ম দিয়া।

অনশনে যোগ ধরি তপস্যা করেন হরি
রমা বাণী সংহতি করিয়া ॥
সুখ মুণ্ডে হানি বাজ তপ করে দেবরাজ
সহস্রলোচনে জল ঝরে।
সঙ্গে লয়ে দেবীগণে অন্নদা ভাবিয়া মনে
ইন্দ্রাণী, দারুণ তপ করে ॥
উর্দ্ধে দুই পদ ধরি হেটে অগ্নি দীপ্ত করি
অগ্নি করে অগ্নিসেবা তপ।
একাসনে অনশনে অন্নদাধেয়ান মনে
সম শীত বরিষা আতপ ॥
ছাড়ি নিজ অধিকার সঙ্গে লয়ে পরিবার
শমন দারুণ তপ করে।
দারুণ তপের ক্লেশ অস্থি হৈল অবশেষ
বল্মীক জন্মিল কলেবরে ॥
পবন আহার করি নিয়মে পরাণ ধরি
পবন করয়ে ঘোর তপ।
উনপঞ্চাশত ভাগে এক ভাবে অনুরাগে
দিবা নিশি অন্নপূর্ণা জপ ॥
কুবের ছাড়িয়া ভোগ আশ্রয় করিয়া যোগ
অহর্নিশ একাসনে ধ্যান।

দারুণ তপের ক্লেশ অস্থি চর্ম্ম অবশেষ
সমাধি ধরিয়া আছে জ্ঞান ॥
শিবের বিশেষ কায় ঈশানের তপস্যায়
ত্রিলোক হইল টলমল।
কপালে অনল জ্বালি শিরোমৃত ঘৃত ঢালি
ধ্যানধারণায় অচঞ্চল ॥
প্রজাপতি রূপভেদে উচ্চারিয়া চারি বেদে
ঊর্দ্ধপতি ঊর্দ্ধমুখে জপে।
দিগদিক ভেদ নাই টলমল সর্ব্ব ঠাঁই
ঘোর অন্ধকার ঘোর তপে ॥
সহস্রমুখের স্তবে নিজগণ কলরবে
তপস্যা করয়ে নাগরাজ।
গ্রহ তারা রাশিগণ ব্রহ্মঋষি যত জন
বিদ্যাধর কিন্নর সমাজ ॥
যত দেবঋষিগণ সিদ্ধ সাধ্য পুণ্যজন
রাজঋষি মহর্ষি সকল।
একাসনে অনশনে তপস্যা অনন্যমনে
দেহে তরু জন্মিল সকল ॥
সকলের তপস্যায় দয়া হৈল অন্নদায়
অবতীর্ণ হইলা কাশীতে।

সকলেরে দিতে বর প্রতিমায় কৈলা ভর
শুভদৃষ্টে হাসিতে হাসিতে ॥
সকলে চেতনা পেয়ে চৌদিকে দেখেন চেয়ে
অনুকম্পা হৈল অনুভব ।
দূর গেল হাহাকার জয় শব্দ নমস্কার
ভুবন ভরিল কলরব ॥

ব্যাস বর্ণন ।

ব্যাস নারায়ণ অংশ ঋষিগণ অবতংস
যাহা হৈতে আঠার পুরাণ ।
ভারত পঞ্চম বেদ নানা মত পরিচ্ছেদ
বেদভাগ বেদান্ত বাখান ॥
সদা বেদপরায়ণ প্রকাশিলা নারায়ণ
শিষ্যগণ বৈষ্ণবসংহতি ।
পিতা যাঁর পরাশর শুকদেব বংশধর
জননী যাঁহার সত্যবতী ॥
দাঁড়াইলে জটাভার চরণে লুটায় তাঁর
কক্ষলোমে আচ্ছাদয়ে হাঁটু ।
পাকা গোঁপ পাকা দাড়ি পায়ে পড়ে দিলে ছাড়ি
চলনে কতেক আঁটু বাঁটু ॥

কপালে চড়ক ফোটা গলে উপবীত মোটা
বাহুমূলে শঙ্খচক্ররেখা।
সর্ব্বাঙ্গে শোভিত ছাবা কলিযুগবাঘথাবা
সারি সারি হরিনাম লেখা॥
তুলসীর কণ্ঠী গলে লম্বি মালা করতলে
হাতে কাণে থরে থরে মালা।
কোশা কুশী কুশাসন কক্ষতলে সুশোভন
তাহে কৃষ্ণসারমৃগছালা॥
কটিতটে ডোর ধরি তাহাতে কৌপীন পরি
বহির্ব্বাসে করি আচ্ছাদন।
কমণ্ডলু তুম্বীফল করঙ্গ পীবারে জল
হাতে আশা হিঙ্গুল বরণ॥
এই বেশে শিষ্যগণ সঙ্গে ফিরে অনুক্ষণ
পাঁজি পুথি বোঝা বোঝা লয়ে।
নিগম আগম মত পুরাণ সংহিতা যত
তর্কাতর্কি নানামত কয়ে॥
কে কোথা কি করে দান কে কোথা কি করে ধ্যান
পূজা করে কেবা কিবা দিয়া।
কে কোথা কি মন্ত্র লয় কোথা কোন যজ্ঞ হয়
আগে ভাগে উত্তরেন গিয়া॥

জগতের হিতে মন ঊর্দ্ধবাহু হয়ে কন
ধর্ম্মে মতি হউক সবার।
ধন নাহি স্থির রয় দারা আপনার নয়
সেই ধর্ম্ম পরলোকে সার॥

ব্যাসের শিবনিন্দা।

কি কর নর হরি ভজ রে।
ছাড়িয়া হরির নাম কেন মজ রে॥
তরিবারে পরিণাম হর জপে হরিনাম
হরি ভজি পূর্ণকাম কমলজ রে॥
ভব ঘোর পারাবার হরিনাম তরি তার
হরিনাম লয়ে পার হৈল গজ রে॥
ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম এ চারি বর্গের ধাম
বেদে বলে হরি নাম সুখে ষজ রে॥
গুরুবাক্য শিরে ধরি রহিয়াছি সার করি
ভারতের ভূষা হরি পদরজ রে॥
বেদব্যাস কহেন শুনহ ঋষিগণ।
কি ফলে বিফল কর শিবের সেবন॥
সর্ব্ব শাস্ত্র দেখিয়া সিদ্ধান্ত কৈনু এই।
ভজনীয় সে জন যে জন মোক্ষ দেই॥

অন্যের ভজনে হয় ধর্ম্ম অর্থ কাম।
মোক্ষফল কেবল কৈবল্য হরিনাম ॥
অন্য অন্য ফল পাবে ভজি অন্যজনে।
মোক্ষ পদ পাবে যদি ভজ নারায়ণে ॥
নিরাকার ব্রহ্ম তিন রূপেতে সাকার।
সত্ত্ব রজ তমগুণ প্রকৃতি তাহার ॥
রজোগুণে বিধি তাহে লোভের উদয়।
তমোগুণে শিবরূপ অহঙ্কারময় ॥
সত্ত্বগুণে নারায়ণ কেবল চিন্ময়।
যুক্তি করি দেখ বিষ্ণু বিনা মুক্তি নয় ॥
তমোগুণে অধোগতি অজ্ঞানের পাকে।
মধ্যগতি রজোগুণে লোভে বাঁধা থাকে ॥
সত্ত্বগুণে তত্ত্বজ্ঞান করতলে মুক্তি।
অতএব হরি ভজ এই সার যুক্তি ॥
সত্য সত্য এই সত্য আরো সত্য করি।
সর্ব্ব শাস্ত্রে বেদ মুখ্য সর্ব্ব দেবে হরি ॥
বেদে রামায়ণে আর সংহিতা পুরাণে।
আদি অন্তে মধ্যে হরি সকলে বাখানে ॥
এত শুনি শৌনকাদি লাগিলা কহিতে।
কি কহিলা ব্যাস দেব না পারি সহিতে ॥

নয়ন মুদিয়া দেখ বিশ্ব তমোময়।
ইথে বুঝি ব্রহ্মরূপ তমো বিনা নয়॥
তুমি ব্যাস রচিয়াছ আঠার পুরাণ।
তথাপি এমন কহ এ বড় অজ্ঞান॥
সকলে প্রত্যয় করি তোমার কথায়।
তোমার এমন কথা এ ত বড় দায়॥
এই কথা কহ যদি কাশীমাঝে গিয়া।
তবে সবে হরি ভজি হরেরে ছাড়িয়া॥
এত বলি শৌনকাদি নিজগণ লয়ে।
বারাণসী চলিলা শিবের নাম কয়ে॥

ঋষিগণের কাশীযাত্রা।

এই রূপে শৌনকাদি যত শৈবগণ।
শিব গুণ গান করি করিলা গমন॥
হাতে কাণে কণ্ঠে শিরে রুদ্রাক্ষের মালা।
বিভূতিভূষিতঅঙ্গ পরি বাঘছালা॥
রক্তচন্দনের অর্দ্ধ চন্দ্র ফোটা ভালে।
ববম্ ববম্ বম্ ঘন রব গালে॥
কোশা কুশী কুশাসন শোভে কক্ষতলে।
কমণ্ডলু করঙ্গ পূরিত গঙ্গাজলে॥

অতিদীর্ঘ কক্ষলোম পড়ে উরূপর।
নাভি ঢাকে দাড়ী গোঁফে বিশদ চামর॥
করেতে ত্রিশূল শোভে চরণে খড়ম।
চলে মাহেশ্বরী সেনা ভয়ে কাঁপে যম॥
ব্যাসদেব চলিলা বৈষ্ণবগণ লয়ে।
ঊর্দ্ধভুজে উচ্চৈঃস্বরে হরিগুণ কয়ে॥
একেবারে হরিহরি হরহর রব।
ভাবেতে আঁখির ধারা মানি মহোৎসব॥
বৈষ্ণব শৈবের দ্বন্দ্ব হরি হর লয়ে।
দেবগণ গগনে শুনেন গুপ্ত হয়ে॥
অভেদে হইল ভেদ এ বড় বিরোধ।
কি জানি কাহারে আজি কার হয় ক্রোধ॥
ভারত কহিছে ব্যাস চলিলা কাশীতে।
ভ্রান্ত কি অভ্রান্ত এই ভ্রান্তি ঘুচাইতে॥

হরিসঙ্কীর্ত্তন।

এই রূপে ব্যাস গিয়া বারাণসী প্রবেশিয়া
আদিকেশবেরে প্রণমিয়া।
সংহতি বৈষ্ণবগণ হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন
নানা রসে নাচিয়া গাইয়া॥

কীর্ত্তনিয়াগণ সঙ্গে গান করে নানা রঙ্গে
বাল্য গোষ্ঠ দান বেশ রাস।
পূর্ব্বরঙ্গ রসোদ্গার মাথুর বিরহ আর
হরিভক্তি যাহাতে প্রকাশ॥
বাজে খোল করতাল কেহ বলে ভাল ভাল
কেহ কাঁদে ভাবে গদ্ গদ।
বীণা বাঁশী আদি যন্ত্রে বেদ পুরাণাদি তন্ত্রে
নানা মতে গান বিষ্ণু পদ॥
কীর্ত্তনে ঢালিয়া দেহ গড়াগড়ি দেয় কেহ
কেহ তারে ধরে দেয় কোল।
ঊর্দ্ধভুজে ঊর্দ্ধপদে কেহ নাচে প্রেমমদে
কেহ বলে হরি হরি বোল॥

ব্যাসের শিবনিন্দা এবং ভুজস্তম্ভ ও কণ্ঠরোধ।

এই রূপে বেদব্যাস কয়ে হরিগুণ।
ঊর্দ্ধভুজে কহেন সকল লোক শুন॥
সত্য সত্য এই সত্য কহি সত্য করি।
সর্ব্ব শাস্ত্রে বেদ সার সর্ব্ব দেবে হরি॥
হর আদি আর যত ভোগের গোসাঁই।
মোক্ষদাতা হরি বিনা আর কেহ নাই॥

এই বাক্য ব্যাস যদি নিন্দিলা শঙ্করে।
শিবের হইল ক্রোধ নন্দি আগুসরে॥
ক্রোধদৃষ্টে নন্দী যেই ব্যাসেরে চাহিল।
ভুজস্তম্ভ কণ্ঠরোধ ব্যাসের হইল॥
চিত্রের পুত্তলি প্রায় রহিলেন ব্যাস।
শৈবগণে কত মত করে উপহাস॥
চারি দিকে শিষ্যগণ কাঁদিয়া বেড়ায়।
কোন মতে উদ্ধারের উপায় না পায়॥
গোবিন্দ জানিলা ব্যাস পড়িল সঙ্কটে।
শিবের অজ্ঞাতে আইলা ব্যাসের নিকটে॥
বিস্তর ভর্ৎসিয়া বিষ্ণু ব্যাসেরে কহিলা।
আমার বন্দনা করি শিবেরে নিন্দিলা॥
যেই শিব সেই আমি যে আমি সে শিব।
শিবের করিলা নিন্দা কি আর বলিব॥
শিবেরে যে নিন্দা করে আমি তারে রুষ্ট।
শিবেরে যে পূজা করে আমি তারে তুষ্ট॥
মোর পূজা বিনা শিবপূজা নাহি হয়।
শিবপূজা না করিলে মোর পূজা নয়॥
যে কৈলা সে কৈলা ইতঃপর মান শিবে।
শিবে স্তব কর তবে উদ্ধার পাইবে॥

শুনিয়া ইঙ্গিতে ব্যাস কহিলা বিষ্ণুরে।
কেমনে করিব স্তুতি বাক্য নাহি স্ফুরে।
গোবিন্দ ব্যাসের কণ্ঠে অঙ্গুলি ছুঁইয়া।
বৈকুণ্ঠে গেলেন কণ্ঠরোধ ঘুচাইয়া॥
শঙ্করে বিস্তর স্তুতি করিলেন ব্যাস।
কতেক কহিব কাশীখণ্ডেতে প্রকাশ॥
প্রত্যক্ষ হইয়া নন্দী ব্যাসে দিলা বর।
যে স্তব করিলা ইথে বড় তুষ্ট হর॥
এত শুনি ব্যাসদেব পরম উল্লাস।
তদবধি শিবভক্ত হইলেন ব্যাস॥
মুছিয়া ফেলিলা হরিমন্দির তিলকে।
অর্দ্ধচন্দ্র ফোঁটা কৈলা কপালফলকে॥
ছিঁড়িয়া তুলসীকণ্ঠী লম্বিমালা যত।
পরিলা রুদ্রাক্ষমালা শৈব অনুগত॥
ফেলিলা তুলসীপত্র বিল্বপত্র লয়ে।
ছাড়িলা হরির গুণ হরগুণ কয়ে॥
ব্যাস কৈলা প্রতিজ্ঞা যে হৌক পরিণাম
অদ্যাবধি আর না লইব হরিনাম॥

ব্যাসের ভিক্ষাবারণ।

এই রূপে বেদব্যাস রহিলা কাশীতে।
নন্দিরে কহেন শিব হাসিতে হাসিতে
দেখ দেখ অহে নন্দি ব্যাসের দুর্দ্দৈব।
ছিল গোঁড়া বৈষ্ণব হইল গোঁড়া শৈব॥
যবে ছিল বিষ্ণুভক্ত মোরে না মানিল।
যদি হৈল মোর ভক্ত বিষ্ণুরে ছাড়িল॥
কি দোষে মুছিল হরিমন্দির ফোঁটায়।
কি দোষে ফেলিল ছিঁড়ি তুলসীমালায়॥
হের দেখ তুলসী পত্রের গড়াগড়ি।
বিল্বপত্র লইয়া দেখহ রড়ারড়ি॥
হের দেখ টানিয়া ফেলিল শালগ্রাম।
রাগে মত্ত হইয়া ছাড়িল হরিনাম॥
মোর ভক্ত হয়ে যেবা নাহি মানে হরি।
আমিত তাহার পূজা গ্রহণ না করি॥
হরিভক্ত হয়ে যেবা না মানে আমারে।
কদাচ কমলাকান্ত না চাহেন তারে॥
হরি হর দুই মোরা অভেদশরীর।
অভেদে যে জন ভজে সেই ভক্ত ধীর॥
রুদ্রাক্ষতুলসীমালা যেই ধরে গলে।

তার গলে হরি হরে থাকি গলে গলে ॥
অভেদ দুজনে গোলা ভেদ করে ব্যাস।
মুক্তি না হয় যে কাশীতে করে বাস ॥
চঞ্চল ব্যাসের মন শোকে যাবে জানি।
কাশীতে ব্যাসের ভিক্ষা শিব কৈলা মানা।
স্নান পূজা সমাপিয়া ব্যাস ঋষিবর।
ভিক্ষাহেতু গেলা এক গৃহস্থের ঘর ॥
ব্যাসে ভিক্ষা দিতে গৃহী হইল উদ্যত।
কিঞ্চিত না পায় দ্রব্য হৈল বুদ্ধিহত ॥
ভিক্ষার বিলম্ব দেখি ব্যাস তপোধন।
গৃহস্থেরে গালি দিয়া করিলা গমন ॥
বালক কুক্কুর লয়ে করে তাড়াতাড়ি।
ব্যাসদেব গেলা অন্য গৃহস্থের বাড়ী ॥
ব্যাসেরে দেখিয়া গৃহী করিয়া যতন।
ভিক্ষা দিতে ঘর হৈতে আনে আয়োজন ॥
শিবের মায়ায় কেহ দেখিতে না পায়।
হাত হৈতে হরিয়া ভৈরবে লয়ে যায় ॥
রিক্তহস্ত গৃহস্থ দাঁড়ায় বুদ্ধিহত।
মর্ম্ম না বুঝিয়া ব্যাস কটু কন কত ॥
এই রূপে ব্যাসদেব যান যার বাড়ী।

ভিক্ষা নাহি পান আর লাভ তাড়াতাড়ী॥
সবে বলে ব্যাস তুমি বড় লক্ষ্মীছাড়া।
অন্ন উড়ি যায় তুমি যাহ যেই পাড়া॥
কেহ বলে যাও মেনে মুখ না দেখাও।
কেহ বলে আপনার নামটি লুকাও॥
এইরূপে গৃহস্থের সঙ্গে গণ্ড গোল।
ক্ষুধায় ব্যাকুল ব্যাস হৈলা উতরোল॥
পাড়া পাড়া ঘরে ঘরে ফিরিয়া ফিরিয়া।
শিষ্যগণ ঠাঁই ঠাঁই পড়িছে ঘুরিয়া॥
আশ্রমে নিশ্বাস ছাড়ি চলিলেন ব্যাস।
শিষ্য সহ সে দিন করিলা উপবাস॥
পর দিন ভিক্ষাহেতু শিষ্য পাঠাইলা।
ভিক্ষা না পাইয়া সবে ফিরিয়া আইলা॥
মহাক্রোধে ব্যাসদেব অজ্ঞান হইলা।
কাশীখণ্ডে বিখ্যাত কাশীতে শাপ দিলা॥

কাশীতে শাপ।

আমারে শঙ্কর দয়া কর হে।
শরণ লয়েছি শুনি দয়াকর হে॥

তুমি দীনদয়াময় আমি দীন অতিশয়
তবে কেন দয়া নয় দেখিয়া কাতর হে ॥
হর পদ আশুতোষ পদে পদে মোর দোষ
তুমি কেন কর রোষ পামর উপর হে ॥
শিখাছে তোমার প্রীতি মোর পিশাচের রীতি
তবে কেন মোর নীতি দেখে ভাব পর হে ॥
ভারত কাতর হয়ে ডাকে শিব শিব কয়ে
ভবনদী পারে লয়ে দূর কর ডর হে ॥
ধন বিদ্যা মোক্ষ অহঙ্কারে কাশীবাসী।
আমারে না দিল ভিক্ষা আমি উপবাসী॥
তবে আমি বেদব্যাস এই দিনু শাপ।
কাশীবাসিলোকের অক্ষয় হবে পাপ ॥
অন্যত্র যে পাপ হয় তাহা খণ্ডে কাশী।
কাশীতে যে পাপ হবে হবে অবিনাশি ॥
ক্রমে তিন পুরুষের বিদ্যা না হইবে।
ক্রমে তিন পুরুষের ধন না রহিবে ॥
ক্রমে তিন পুরুষের মোক্ষ না হইবে।
যদি বেদ সত্য তবে অন্যথা নহিবে ॥
শাপ দিয়া পুনরপি চলিলা ভিক্ষায়।
ভিক্ষা না পাইয়া বড় ঠেকিলেন দায় ॥

ঘরে ঘরে ফিরি ফিরি ভিক্ষা না পাইয়া।
আশ্রমে চলিলা ভিক্ষাপাত্র ফেলাইয়া॥
হেনকালে অন্নপূর্ণা দেখিতে পাইলা।
ব্যাসদেবে অন্ন দিতে আপনি চলিলা॥
জননী মাতা সবারে সমান।
অংশরূপে সকল শরীরে অধিষ্ঠান॥
আকাশ পবন জল অনল অবনি।
সকলে সমান যেন অন্নদা তেমনি॥
সকলে সমান যেন চন্দ্র সূর্য্য তারা।
তেমনি সকলে সমা অন্নপূর্ণা তারা॥
মেঘ করে যেমন সকলে জল দান।
তেমনি অন্নদা দেবী সকলে সমান॥
বৃক্ষ যেন ফল ধরে সবার লাগিয়া।
তেমনি সকলে অন্নপূর্ণা অন্ন দিয়া॥
হরি হর প্রভৃতির শত্রু মিত্র আছে।
শত্রু মিত্র এক ভাব অন্নদার কাছে॥
চলিলেন অন্নপূর্ণা ব্যাসে করি দয়া।
আগে আগে যায় জয়া পশ্চাতে বিজয়া॥
হেন কালে পথে আসি কহেন মহেশ।
কোথায় চলেছ থুয়ে কার্ত্তিক গণেশ॥

ক্রোধ ভরে কন দেবী পিছু কেন ডাক।
ব্যাসে অন্ন দিয়া আসি ঘরে বসি থাক॥
একে বুড়া তাহে ভাঙ্গী ধুতুরায় ভোল।
অল্প অপরাধে কর মহা গণ্ডগোল॥
তিন দিন ব্যাসেরে দিয়াছ উপবাস।
ব্রহ্মহত্যা হইবে তাহাতে নাহি ত্রাস॥
একবার ক্রোধেতে ব্রহ্মার মাথা লয়ে।
অদ্যাপি সে শাপে ফির মুণ্ডধারী হয়ে॥
কি হেতু করিলে মানা ব্যাসে অন্ন দিতে।
সে দিল কাশীতে শাপ কে পারে খণ্ডিতে॥
এখন যদ্যপি ব্যাস অন্ন নাহি পায়।
আর বার দিবে শাপ পেটের জ্বালায়॥
আমি অন্নপূর্ণা আছি কাশীতে বসিয়া।
আমার দুর্নাম হবে না দেখ ভাবিয়া॥
এত বলি অন্নপূর্ণা ক্রোধভরে যান।
সঙ্গে সঙ্গে যান শিব ভয়ে কম্পমান॥
সভয় দেখিয়া ভীমে হাসেন অভয়া।
বুড়াটির ঠাট হেদে দেখ লো বিজয়া॥
ভারত কহিছে ইথে সাক্ষি কেন মান।
তোমার ঘরের ঠাট তোমরা সে জান॥

অন্নদার মোহিনীরূপ।

মায়া করি জয়া বিজয়ারে লুকাইয়া।
দেখা দিলা ব্যাসদেবে মোহিনী হইয়া॥
[illegible]শি জিনি মুখ কমলের গন্ধ।
ঝাঁকে ঝাঁকে অলি উড়ে মধুলোভে অন্ধ॥
অকলঙ্ক হইতে শশাঙ্ক আশা লয়ে।
পদ নখে রহিয়াছে দশরূপ হয়ে॥
মুকুতা যতনে তনু সিন্দূরে মাজিয়া।
হার হয়ে হারিলেক বুক বিন্ধাইয়া॥
বিননিয়া চিকণিয়া বিনোদ কবরী।
ধরাতলে ধায় ধরিবারে বিষধরী॥
চক্ষে জিনি মৃগ ভালে মৃগমদবিন্দু।
মৃগ কোলে করিয়া কলঙ্কী হৈল ইন্দু॥
অরুণেরে রঙ্গ দেয় অধররঙ্গিমা।
চপলা চঞ্চলা দেখি হাস্যের ভঙ্গিমা॥
রতন কাঁচুলী শাড়ী বিজুলী চমকে।
মণিময় আভরণ চমকে ঝমকে॥
কথায় পঞ্চম স্বর শিখিবার আশে।
ঝাঁকে২ কোকিল কোকিলা চারি পাশে॥
কঙ্কণঝঙ্কার হৈতে শিখিতে ঝঙ্কার।

ঝাঁকে ঝাঁকে ভ্রমর ভ্রমরী অনিবার ॥
চঞ্চুর চলন দেখি শিখিতে চলনি।
ঝাঁকে ঝাঁকে নাচে কাছে খঞ্জন খঞ্জনী ॥
এই রূপে অন্নপূর্ণা সদয় হইয়া।
দেখা দিলা ব্যাসদেবে নিকটে আসিয়া ॥
মনোহর একখানি পুরী নির্ম্মাইয়া।
অতিবৃদ্ধ করি হরে তাহাতে রাখিয়া ॥
আপনি দাঁড়ায়ে দ্বারে পরমসুন্দরী।
কহিতে লাগিলা ব্যাসে ভক্তিভাব করি ॥
শুন ব্যাস গোঁসাই আমার নিবেদন।
নিমন্ত্রণ মোর বাড়ী করিবা ভোজন ॥
বৃদ্ধ মোর গৃহস্থ অতিথিভক্তিমান।
অতিথিসেবন বিনা জল নাহি খান ॥
তপস্বি তোমারে দেখি অতিথি ঠাকুর।
ত্বরায় আইস বেলা হইল প্রচুর ॥
শুনিয়া ব্যাসের মনে আনন্দ হইল।
কোথা হৈতে হেন জন কাশীতে আইল।
অন্ন বিনা তিন দিন মোরা উপবাসি।
কোথা হৈতে পুণ্যরূপা উত্তরিলা আসি॥
নিরুপমরূপা তুমি নিরুপমবয়া।

নিরুপমগুণা তুমি নিরুপমদয়া ॥
তখনি পাইনু ভিক্ষা কহিলা যখনি।
পরিচয় দেহ মোরে কে বট আপনি ॥
বিষ্ণুর বৈষ্ণবী কিবা ভবের ভবানী।
ব্রহ্মার ব্রহ্মাণী কিবা ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী ॥
দেখিয়াছি এ সকলে সে সকলে জানি।
ততোধিক প্রভা দেখি তাই অনুমানি ॥
শুনিয়াছি অন্নপূর্ণা কাশীর ঈশ্বরী।
সেই বুঝি হবে তুমি হেন মনে করি ॥
প্রতিঘরে ফিরি ভিক্ষা নাহি পায় যেই।
অন্নপূর্ণা বিনা তারে অন্ন কেবা দেই ॥
এত শুনি অন্নপূর্ণা সহাস্য অন্তরে।
কহিতে লাগিলা ব্যাসে মৃদুমধুস্বরে ॥
কোথা অন্নপূর্ণা কোথা তুমি কোথা আমি।
শীঘ্র আসি অন্ন খাও দুঃখ পান স্বামী ॥
এত বলি ব্যাসদেবে সশিষ্যে লইয়া।
অন্ন দিলা অন্নপূর্ণা উদর পূরিয়া ॥
চর্ব্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয় আদি রস যত।
ভোজন করিলা সবে বাসনার মত ॥
ভোজনান্তে আচমন সকলে করিলা।

হরপ্রিয়া হরীতকী মুখশুদ্ধি দিলা ॥
বসিলেন ব্যাসদেব শিষ্যগণ সঙ্গে।
হেন কালে বৃদ্ধ গৃহী জিজ্ঞাসেন রঙ্গে ॥
ভারত কহিছে ব্যাস সাবধান হৈও।
বড় নহে বিশ্বনাথ বুঝে কথা কৈও ॥

— — —

শিব ও ব্যাসে কথোপকথন।

বুড়াটি কহেন ব্যাস তুমিত পণ্ডিত।
কিঞ্চিত জিজ্ঞাসা করি কহিবে উচিত ॥
তপস্বি কাহারে বলে কিবা ধর্ম্ম তার।
কি কর্ম্ম করিলে পায় পরলোকে পার ॥
শুন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কহেন বেদব্যাস।
তপস্যার নানা ধর্ম্ম প্রধান সন্ন্যাস ॥
সর্ব্বজীবে সমভাব জয়াজয় তুল্য।
স্তুতি নিন্দা মৃত্তিকা মাণিক্য তুল্যমূল্য ॥
ইত্যাদি অনেক মত কহিলেন ব্যাস।
কতেক কহিব কাশীখণ্ডেতে প্রকাশ ॥
শুনিয়া বুড়াটি কন সক্রোধ হইয়া।
আপনি ইহার আছ কি ধর্ম্ম লইয়া ॥
এক বাক্যে বুঝিয়াছি জ্ঞানেতে যেমন।

শিব হৈতে মোক্ষ নহে কয়েছ যখন ॥
দয়া ধর্ম্ম ক্ষমা আদি যত তপ ক্রিয়া।
জানাইলা সকলি কাশীতে শাপ দিয়া ॥
কহিতে কহিতে হৈল ক্রোধের উদয়।
সেই রূপ হৈলা যাহে করেন প্রলয় ॥
ঊর্দ্ধে ফুটে জটা ঘনঘটা জর জর।
উছলিয়া গঙ্গাজল ঝরে ঝর ঝর ॥
গর গর গর্জ্জে ফণী জিহ্ লক লক।
অর্দ্ধ শশী কোটি সূর্য্য অগ্নি ধক ধক।
হল হল জ্বলিছে গলায় হলাহল।
অট্ট অট্ট হাসে মুণ্ডমালা দলমল ॥
দেহ হৈতে বাহির হইল ভূতগণ।
ভৈরবের ভীমনাদে কাঁপে ত্রিভুবন ॥
মহাক্রোধে মহারুদ্র ধরিয়া পিনাক।
শূল আন শূল আন ঘন দেন ডাক ॥
বধিতে নারেন অন্নপূর্ণার কারণে।
ভর্ৎসিয়া ব্যাসেরে কন তর্জ্জন গর্জ্জনে ॥
হরি হর দুই মোরা অভেদশরীর।
অভেদে যে জন ভজে সেই ভক্ত ধীর ॥
বেদব্যাস নাম পেয়ে নাহি মান বেদ।

কি মর্ম্ম বুঝিয়া হরি হরে কর ভেদ ॥
সেই পাপে তোর বাস না হবে কাশীতে।
আমি মানা করিলাম তোরে ভিক্ষা দিতে
মনে ভাবি বুঝিলে জানিতে সেই পাপ।
কোন দোষে আমার কাশীতে দিলি শাপ।
কি দোষ করিল তোর কাশীবাসিগণ।
কেন শাপ দিলি অরে বিটলা বামণ ॥
এ স্থানে বাসের যোগ্য তুমি কভু নও।
এইক্ষণে বারাণসী হৈতে দূর হও ॥
অরে রে ভৈরবগণ ব্যাসে কর দূর।
পুন যেন আসিতে না পায় কাশীপুর ॥
ব্যাসদেব রুদ্ররূপি দেখি মহেশ্বরে।
ভয়ে কম্পমানতনু কাঁপে থর থরে ॥
অন্নপূর্ণা ভগবতী দাঁড়াইয়া পাশে।
চরণে ধরিয়া ব্যাস কহে মৃদুভাষে ॥
অন্ন দিয়া অন্নপূর্ণা বাঁচাইলা প্রাণ।
বাঁচাও শিবের ক্রোধে নাহি দেখি ত্রাণ ॥
জনক হইতে স্নেহ জননীর বাড়া।
মার কাছে পুত্র যায় বাপে দিলে তাড়া ॥
জগতের পিতা শিব তুমি জগন্মাতা।

হরি হর বিধাতার তুমি সে বিধাতা ॥
শিবের হইল তমোগুণের উদয়।
যেই তমোগুণোদয়ে করেন প্রলয় ॥
পশুবুদ্ধি শিশু আমি কিবা জানি মর্ম্ম।
বুঝিতে নারিনু কিবা ধর্ম্ম কি অধর্ম্ম ॥
পড়িনু পড়ানু যত মিছা সে সকল।
সত্য সেই সত্য তব ইচ্ছাই কেবল ॥
শিব কৈলা অন্ন মানা তুমি অন্ন দিলে।
এ সঙ্কটে কে রাখিবে তুমি না রাখিলে।
শঙ্করের ক্রোধ হৈল না জানি কি ঘটে।
শঙ্করি করুণা কর এ ঘোর সঙ্কটে ॥
তোমার কথার বশ শঙ্কর সর্ব্বদা।
কাশীবাস যায় মোর রাখ গো অন্নদা ॥
ব্যাসের বিনয়ে দেবী সদয়া হইলা।
শিবেরে করিয়া শান্ত ব্যাসে বর দিলা ॥
অলঙ্ঘ্য শিবের আজ্ঞা না হয় অন্যথা।
কাশীবাস ব্যাস তুমি না পাবে সর্ব্বথা ॥
আমার আজ্ঞায় চতুর্দ্দশী অষ্টমীতে।
মণিকর্ণিকার স্নানে পাইবে আসিতে ॥
এত বলি হর লয়ে কৈলা অন্তর্দ্ধান।

নিশ্বাস ছাড়িয়া ব্যাস কাশী ছাড়ি যান ॥
ছাড়িয়া যাইতে কাশী মন নাহি যায়।
লুকায়ে রহেন যদি ভৈরবে খেদায় ॥
বেতাল ভৈরবগণ করে তাড়াতাড়ি।
শিষ্য সহ ব্যাসদেব গেলা কাশী ছাড়ি ॥

ব্যাসের দ্বিতীয় কাশী নির্ম্মাণে সঙ্কল্প।

কাশীতে না পেয়ে বাস মনোদুখে বেদব্যাস
বসিলেন ছাড়িয়া নিশ্বাস।
তুচ্ছলোক আছে যারা কাশীতে রহিল তারা
আমার না হৈল কাশীবাস ॥
এ বড় দারুণ শোক কলঙ্ক গাবিবে লোক
ব্যাস হৈলা কাশী হৈতে দূর।
নাম ডাক ছিল যত সকল হইল হত
ভাঙ্গড় করিল দর্প চূর ॥
তেজোবধ হয় যার প্রাণবধ ভাল তার
কোন খানে সমাদর নাই।
সবে করে উপহাস ইনি সেই বেদব্যাস
কাশীতে না হৈল যার ঠাঁই ॥

যদি করি বিষ পান তথাপি না যাবে প্রাণ
অনলে সলিলে মৃত্যু নাই।
সর্পে বাঘে যদি খায় মরণ না হবে তায়
চিরজীবী করিলা গোসাঁই॥
ভবিতব্য ছিল যাহা অদৃষ্টে করিল তাহা
কি হবে ভাবিলে আর বসি।
তবে আমি বেদব্যাস এই খানে পরকাশ
করিব দ্বিতীয় বারাণসী॥
করিয়াছি যত তপ করিয়াছি যত জপ
সকল করিনু ইথে পণ।
নিজ নাম ... হবে এইখানে প্রকাশ
... আর যে কিছু ... য়োজন॥
কাশীতে মরিলে জীব রাম নাম দিয়া শিব
কত কষ্টে মোক্ষ দেন শেষে।
এখানে মরিবে যেই সদ্য মুক্ত হবে সেই
না ঠেকিবে আর কোন ক্লেশে॥
অসাধ্য সাধন যত তপস্যায় হয় কত
তপোবলে রাত্রি হয় দিনা।
বিধি সঙ্গে বিরোধিয়া তপস্যায় ভর দিয়া
বিশ্বামিত্র না করিল কিবা॥

মোরে খেদাইল শিব তার সেবা না করিব
বর না মাগিব তার ঠাঁই।
বিষ্ণুর দেখেছি গুণ নন্দি করেছিল খুন
কিঞ্চিত যোগ্যতা তার নাই॥
বিধাতা সবার বড় তাঁহারে করিব দড়
যাহা হৈতে সকলের সৃষ্টি।
তিনি পিতামহ হন সন্তানে বিমুখ নন
অবশ্য দিবেন কৃপাদৃষ্টি॥
তাঁরে তুষি তপস্যায় বর মাগি তাঁর পায়
সকলে পাইব যথা বসি।
পুরী করি মোক্ষ ধাম জাগাইব নিজ নাম
নাম থোব ব্যাসবারাণসী॥

ব্রহ্মার ব্যাসভৎর্সনা।

ব্রহ্মার করিলা ধ্যান ব্যাস তপোধন।
অবিলম্বে প্রজাপতি দিলা দরশন॥
আপন দুর্দ্দশা আর শিবেরে নিন্দিয়া।
বিস্তর কহিলাব্যাস কান্দিয়া কান্দিয়া॥
স্নেহেতে চক্ষুর জল অঞ্চলে মুছিয়া।
কহিছেন প্রজাপতি পিরীতি করিয়া॥

অরে বাছা ব্যাস তুমি বড়ই ছাবাল।
শিব সঙ্গে বাদ কর এ বড় জঞ্জাল॥
কাশীতে রহিতে শিব না দিলে না রবে।
তাঁর সঙ্গে বাদে তোমা হৈতে কিবা হবে॥
শিব নাম জপ কর যেথা সেথা বসি।
যেখানে শিবের নাম সেই বারাণসী॥
তুমি কি করিবা কাশী লঙ্ঘিয়া তাঁহারে।
কাশীপতি বিনা কাশী কে করিতে পারে॥
শিব লঙ্ঘি আমি কি হইব বরদাতা।
আমি যে বিধাতা শিব আমারো বিধাতা॥
আমার আছিল বাছা পাঁচটি বদন।
এক মাথা কাটিয়া লইলা পঞ্চানন॥
কি করিতে তাহে আমি পারিলাম তাঁর।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় লীলায় হয় যাঁর॥
কিসে অনুগ্রহ তাঁর নিগ্রহ বা কিসে।
বুঝিতে কে পারে যাঁর তুল্য সুধা বিষে॥
ভালে যাঁর সুধাকর গলায় গরল।
কপালে অনল যাঁর শিরে গঙ্গাজল॥
সম যাঁর সুধা বিষ জল হুতাশন।
অন্যের যে অমঙ্গল তাঁরে সে মঙ্গল॥

তাঁর সঙ্গে তোর বাদ আমি ইথে নাই।
জানেন অন্তরযামী শঙ্কর গোসাঁই॥
এত বলি প্রজাপতি গেলা নিজস্থানে।
ব্যাসের ভাবনা হৈল কি হবে নিদানে॥
যে হোক সে হোক আরো করিব যতন।
মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীরপাতন॥
অন্নপূর্ণা ভগবতী সকলের সার।
কাশীর ঈশ্বরী যিনি বিশ্ব মায়া যাঁর॥
যাঁর অধিষ্ঠানে বারাণসীর মহিমা।
বিধি হরি হর যাঁর নাহি জানে সীমা॥
শঙ্কর আমার অন্ন মানা করেছিলা।
শিবে না মানিয়া তিনি মোরে অন্ন দিলা॥
তদবধি জানি তিনি সকলের বড়।
অতএব তাঁর উপাসনা করি দড়॥
তিনি মোক্ষ দিবেন সকলে এথা বসি।
তবে সে হইবে মোর ব্যাসবারাণসী॥
এত ভাবি ব্যাসদেব মন কৈলা স্থির।
অন্নপূর্ণা ধ্যান করি বসিলেন ধীর॥
বিস্তর কঠোর করি করিলেন তপ।
কত পুরশ্চরণ করিলা কত জপ॥

ব্যাসের তপস্যায় অন্নদার কোপ।

গজানন ষড়ানন সঙ্গে করি পঞ্চানন
কৈলাসেতে করেন ভোজন।
অন্নপূর্ণা ভগবতী অন্ন দেন হৃষ্টমতি
ভোজন করিছে ভূতগণ॥
ছয় মুখ কার্ত্তিকের গজ মুখ গণেশের
মহেশের নিজে মুখপঞ্চ।
কতমুখ কত জন বেতাল ভৈরব গণ
ভাঙ্গ খেয়ে ভোজনে প্রপঞ্চ॥
লেগেছে সিদ্ধির লাগি খেতে বড় অনুরাগি
বার মুখ তিন বাপে পুতে।
অন্নদার হস্ত দুটি অন্ন দেন গুটি গুটি
থাকে নাহি পাতে থুতে থুতে॥
অন্নদা বুঝিলা মনে কৌতুক আমার সনে
বুঝা যাবে কেবা কত খান।
চর্ব্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয় পাতে পাতে অপ্রমেয়
পয়োনিধি পর্ব্বত প্রমাণ॥
খাইবেন কেবা কত সবে হৈলা বুদ্ধি হত
অন্নপূর্ণা কহেন কি চাও।
অন্ন ব্যঞ্জনের রাশি কে রাখিবে করি বাশি
খেতে ভার খাও খাও খাও॥

এইরূপে অন্নপূর্ণা খেলারসে পরিপূর্ণা
নারীভাবে পতি পুত্র লয়ে।
ব্যাসের তপের গাছ অন্নদার লগ্নে পাছ
ফলিলেক বিষবৃক্ষ হয়ে॥
ব্যাস তপ অনশনে অন্নদা জানিলা মনে
ব্যাসের তপের অনুবলে।
কপালে টনক নড়ে হাতে হইতে হাতা পড়ে
উছুট লাগিয়া পদ টলে॥
দুর্দ্দৈব যখন ধরে ভাল কর্ম্মে মন্দ করে
অন্নদার উপজিল রোষ।
অনুগ্রহ গেল নাশ নিগ্রহে ঠেকিলা ব্যাস
ভাগ্যবশে গুণ হৈল দোষ॥
ভাবে বুঝি ক্রোধভর জিজ্ঞাসা করিলা হর
কেন দেবি দেখি ভাবান্তর।
অন্নদা কহেন হরে ব্যাস মুনি তপ করে
অনশন কৈল বহুতর॥
তুমি ঠাঁই নাহি দিলে কাশী হৈতে খেদাইলে
তাহাতে হয়েছে অপমান।
করিতে দ্বিতীয় কাশী হইয়াছে অভিলাষী
সেই হেতু করে মোর ধ্যান॥

চক্ষু মুদি দুই হাতে চুলকান চুল ॥
মৃদুস্বরে কথা কন অন্তরে হাসিয়া ।
অরে বাছা বেদব্যাস কি কর বসিয়া ॥
তিন কাল গিয়া মোর এক কাল আছে ।
পতি পুত্র ভাই বাপ কেহ নাহি কাছে ॥
বাঁচিতে বাসনা নাই মরিবারে চাই ।
কোথা মৈলে মোক্ষ হবে ভাবিয়া না পাই ।
কাশীতে মরিলে তাহে পাপ ভোগ আছে ।
তারক মন্ত্রেতে শিব মোক্ষ দেন পাছে ।
এই ভয়ে সেখানে মরিতে সাদ নাই ।
মৃত্যুমাত্র মোক্ষ হয় কোথা হেন ঠাঁই ॥
তুমি নাকি কাশী করিয়াছ মহাশয় ।
সত্য করি কহ এথা মরিলে কি হয় ॥
ব্যাস কন এই পুরী কাশী হৈতে বড় ।
মৃত্যু মাত্র মোক্ষ হয় এই কথা দড় ॥
মূর্খ যদি থাকে বুড়ী এথা বাস কর ।
সদ্য মুক্ত হবে যদি এই স্থানে মর ॥
ছলেতে অন্নদা দেবী কহেন রুষিয়া ।
মরণ টাঁকিলি বেটা অনাথা দেখিয়া ॥

সকলে মরিবে আমি বসিয়া দেখিব॥
ঊর্দ্ধগ বিকারে মোর পড়িয়াছে দাঁত।
অন্ন বিনা অন্ন বিনা শুকায়েছে আঁত॥
বাতেতে পাকিয়া চুল হৈল শণনুড়ি।
বাতে করিয়াছে খোঁড়া চলি গুড়ি গুড়ি॥
শিরঃশূলে চক্ষু গেল কুঁজা কৈল কুঁজে।
কতটা বয়স মোর যদি কেহ বুজে॥
কাণকোটারিতে মোর কাণ কৈল কালা।
কেটা মোরে বুড়ী বলে এত বড় জ্বালা॥
এত বলি ছলে দেবী ক্রোধভরে যান।
আর বার ব্যাসদেব আরম্ভিলা ধ্যান॥
জগতে যে কিছু আছে অধীন দেবের।
শাস্ত্রে বলে সেই দেব অধীন মন্ত্রের॥
ধ্যানের প্রভাবে দেবী চলিতে নারিয়া।
পুনশ্চ ব্যাসের কাছে আইলা ফিরিয়া॥
বুড়ী দেখি অরে বাছা অনুকূল হও।

হাঁসিয়া কহেন হর বুঝি তারে দিলা বর
মোরে মেনে দয়া না ছাড়িও।
আমি বৃদ্ধ তাই কই জানি নাই তোমা বই
এক মুটা অন্ন মেনে দিও॥
সক্রোধে কহেন শিব। কৌতুক করহ কিবা
কি হয় তাহার দেখ বসি।
এত বড় তার সাদ তোমা সনে করি বাদ
করিবেক ব্যাস বারাণসী॥
ভবে যে কহিবে মোর তপস্যা করিল ঘোর
কি দোষে হইব রুষ্ট তারে।
অসময় সুসময় না বুঝিয়া দুরাশয়
বিরক্ত করিল অত্যাচারে॥
বলিরাজা ভগবানে ত্রিপাদ ধরণী দানে
অধোগতি পাইল যেমন।
তেমনি ব্যাসের গিয়া শাপ দিব বর দিয়া
শুনিয়া সানন্দ পঞ্চানন॥
মহামায়া মায়া করি জরতীশরীর ধরি
ব্যাসদেবে ছলিতে চলিলা।
অন্নপূর্ণা পদতলে ভারত বিনয়ে বলে
রাজা কৃষ্ণচন্দ্র আজ্ঞা দিলা॥

অন্নদার জরতীবেশে ব্যাসছলনা।

মায়া করি মহামায়া হইলেন বুড়ী।
ডানি করে ভাঙ্গা নড়ী বাম কক্ষে ঝুড়ী॥
ঝাঁকড় মাকড় চুল নাহি আঁদি সাঁদি।
হাত দিলে ধূলা উড়ে যেন কেয়াকাঁদি॥
ডেঙ্গর উকুন নীক করে ইলিবিলি।
কোটি কোটি কাণকোটারির কিলিকিলি।
কোটরে নয়ন দুটি মিটি মিটি করে।
চিবুকে মিলিয়া নাসা ঢাকিল অধরে॥
ঝর ঝর ঝরে জল চক্ষু মুখ নাকে।
শুনিতে না পান কাণে শত শত ডাকে॥
বাতে বাঁকা সর্ব্ব অঙ্গ পিঠে কুঁজভার।
অন্ন বিনা অন্নদার অস্থিচর্ম্ম সার॥
শত গাঁটি ছিঁড়া টেনা করি পরিধান।
ব্যাসের নিকটে গিয়া কৈলা অধিষ্ঠান॥
ফেলিয়া ঝুপড়ী লড়ী আহা উহু কয়ে।
জানু ধরি বসিলা বিরসমুখী হয়ে॥
ভূমে ঠেকে থুথি হাঁটু কাণ ঢেকে যায়।
কুঁজভরে পিঠডাঁড়া ভূমিতে লুটায়॥
উকুনের কামড়েতে হইয়া আকুল।

চক্ষু মুদি দুই হাতে চুলকান চুল ॥
মৃদুস্বরে কথা কন অন্তরে হাসিয়া।
অরে বাছা বেদব্যাস কি কর বসিয়া ॥
তিন কাল গিয়া মোর এক কাল আছে।
পতি পুত্র ভাই বাপ কেহ নাহি কাছে ॥
বাঁচিতে বাসনা নাই মরিবারে চাই।
কোথা মৈলে মোক্ষ হবে ভাবিয়া না পাই ॥
কাশীতে মরিলে তাহে পাপ ভোগ আছে।
তারক মন্ত্রেতে শিব মোক্ষ দেন পাছে ।
এই ভয়ে সেখানে মরিতে সাদ নাই।
মৃত্যুমাত্র মোক্ষ হয় কোথা হেন ঠাঁই ॥
তুমি নাকি কাশী করিয়াছ মহাশয়।
সত্য করি কহ এথা মরিলে কি হয় ॥
ব্যাস কন এই পুরী কাশী হৈতে বড়।
মৃত্যু মাত্র মোক্ষ হয় এই কথা দড় ॥
বুদ্ধি যদি থাকে বুড়ী এথা বাস কর।
সদ্য মুক্ত হবে যদি এই খানে মর ॥
ছলেতে অন্নদা দেবী কহেন রুষিয়া।
মরণ টাকিলি বেটা অনাথা দেখিয়া ॥
তোর মনে আমি বুড়ী এখনি মরিব।

সকলে মরিবে আমি বসিয়া দেখিব॥
উর্দ্ধগ বিকারে মোর পড়িয়াছে দাঁত।
অন্ন বিনা অন্ন বিনা শুকায়েছে আঁত॥
বাসতে পাকিয়া চুল হৈল শণনুড়ি।
বাতে করিয়াছে খোঁড়া চলি গুড়ি গুড়ি॥
শিরঃশূলে চক্ষু গেল কুঁজা কৈল কুঁজে।
কতটা বয়স মোর যদি কেহ বুজে॥
কাণকোটারিতে মোর কাণ কৈল কালা।
কেটা মোরে বুড়ী বলে এত বড় জ্বালা॥
এত বলি ছলে দেবী ক্রোধভরে যান।
আর বার ব্যাসদেব আরম্ভিলা ধ্যান॥
জগতে যে কিছু আছে অধীন দেবের।
শাস্ত্রে বলে সেই দেব অধীন মন্ত্রের॥
ধ্যানের প্রভাবে দেবী চলিতে নারিয়া।
পুনশ্চ ব্যাসের কাছে আইলা ফিরিয়া॥
বুড়ী দেখি অরে বাছা অনুকূল হও।
এথা মৈলে কি হইবে সত্য করি কও॥
বুড়া বয়সের ধর্ম্ম অল্পে হয় রোষ।
ক্ষণে ক্ষণে ভ্রান্তি হয় এই বড় দোষ॥
মনে পড়ে না রে বাছা কি কথা কহিলে।

পুন কহ কি হইবে এখানে মারিলে ॥
ব্যাসদেব কন বুড়ি বুঝিতে নারিলে।
সদ্য মোক্ষ হইবেক এখানে মরিলে ॥
বুড়ী কন হায় বিধি করিলেক কালা।
কি বল বুঝিতে নারি এত বড় জ্বালা ॥
পুনশ্চ চলিলা দেবী ছলে ক্রোধ করি।
ব্যাসদেব পুনশ্চ বসিলা ধ্যান ধরি ॥
ধ্যানের অধীনা দেবী চলিতে নারিলা।
পুনশ্চ ব্যাসের কাছে ফিরিয়া আইলা ॥
এই রূপে দেবী বার পাঁচ ছয় সাত।
ব্যাসের নিকটে করিলেন যাতায়াত ॥
দৈবদোষে ব্যাসদেবে উপজিল ক্রোধ।
বিরক্ত করিল মাগী কিছু নাহি বোধ ॥
একে বুড়ী আরো কালা চক্ষে নাহি সুঝে।
বারে বারে ধ্যান ভাঙ্গে কহিলে না বুঝে ॥
ডাকিয়া কহিলা ক্রোধে কাণের কুহরে।
গর্দ্দভ হইবে বুড়ী এখানে যে মরে ॥
বুঝিনু বুঝিনু বলি করে ঢাকি কাণ।
তথাস্তু বলিয়া দেবী কৈলা অন্তর্দ্ধান ॥
বুড়ী না দেখিয়া ব্যাস আঁধার দেখিলা।

হায় বিধি অন্নপূর্ণা আসিয়া ছলিলা ॥
নিকটে পাইয়া নিধি চিনিতে নারিনু।
হায় রে আপনা খেয়ে কি কথা কহিনু ॥
প্রকৃতিপুরুষরূপা তুমি সূক্ষ্ম স্থূল।
কে জানে তোমার তত্ত্ব তুমি বিশ্বমূল ॥
বাক্যাতীত গুণ তব বাক্যে কত কব।
শক্তিযোগে শিবসংজ্ঞা শলোপে ক্লিশব
শরীর করিনু ক্ষয় তোমারে ভাবিয়া।
কি গুণ বাড়িল তব ব্যাসেরে ছলিয়া ॥
ব্যাসবারাণসী হবে ভাবিলাম বসি।
বাক্যদোষে হইল গর্দ্দভবারাণসী ॥
অলঙ্ঘ্য দেবীর বাক্য অন্যথা না হয়।
ভবিতব্যং ভবত্যেব গুণাকর কয় ॥

ভাটমুখে সুন্দরের বিদ্যারূপগুণ শ্রবণ।

শুন রাজা সাবধানে পূর্ব্বে ছিল এই স্থানে
বীরসিংহ নামে নরপতি।
বিদ্যা নামে তার কন্যা আছিল পরম ধন্যা
রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী॥
প্রতিজ্ঞা করিল সেই বিচারে যিনিবে যেই
পতি হবে সেই সে তাহার।
রাজপুত্রগণ তায় আসিয়া হারিয়া যায়
রাজা ভাবে কি হবে ইহার॥
শেষে শুনি সবিশেষ কাঞ্চীনামে আছে দেশ
তাহে রাজা গুণসিন্ধু রায়।
সুন্দর তাহার সুত বড় রূপগুণযুত
বিদ্যায় সে জিনিবে বিদ্যায়॥
বীরসিংহ তার পাট পাঠাইয়া দিল ভাট
লিখিয়া এ সব সমাচার।
সেই দেশে ভাট গিয়া নিবেদিল পত্র দিয়া
আসিতে বাসনা হৈল তার॥
সুন্দর মগন হয়ে ভাটেরে বিরলে লয়ে
জিজ্ঞাসে বিদ্যার রূপ গুণ।

ভাট বলে মহাশয় বাণী যদি শেষ হয়
তবু নহে কহিতে নিপুণ ॥
বিধি চক্ষু দিল যারে সে যদি না দেখে তারে
তাহার লোচনে কিবা ফল।
সে বিদ্যার পতি হও বিদ্যাপতি নাম লও
শুনিয়া সুন্দরে কুতুহল ॥

সুন্দরের বর্দ্ধমান যাত্রা।

ভাটমুখে শুনিয়া বিদ্যার সমাচার।
উথলিল সুন্দরের সুখ পারাবার ॥
বিদ্যার আকার ধ্যান বিদ্যানাম জপ।
বিদ্যালাপ বিদ্যালাপ বিদ্যালাভ তপ ॥
হায় বিদ্যা কোথা বিদ্যা কবে বিদ্যা পাব।
কি বিদ্যা প্রভাবে বিদ্যাবিদ্যমানে যাব ॥
কিবা রূপ কিবা গুণ কহিলেক ভাট।
খুলিল মনের দ্বার না লাগে কপাট ॥
প্রাণধন বিদ্যালাভ ব্যাপারের তরে।
খেয়াব তনুর তরি প্রবাস সাগরে ॥
যদি কালী কূল দেন কূলে আগমন।
মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন ॥

একা যাব বর্দ্ধমান করিয়া যতন।
যতন নহিলে নাহি মিলয়ে রতন॥
যে ভাবে রামের সাগরে হৈল সেতু।
মহাবিদ্যা আরাধিলা বিদ্যালাভ হেতু॥
হইল আকাশবাণী র্ন্নে অনুভবে।
চল বাছা বর্দ্ধমান বিদ্যালাভ হবে॥
আকাশবাণীতে হাতে পাইল আকাশ।
সোয়ারির অশ্ব আনে গমনে বাতাস॥
আপনি সাজায় ঘোড়া মনোহর সাজ।
আপনার সুসাজ করয়ে যুবরাজ॥
খড়্গ চর্ম্ম লেজা তীর কামান খঞ্জর।
পড়া শুক লৈলা হাতে সহিত পঞ্জর॥
রত্নভরা খুঙ্গী পুথি ঘোড়ার হানায়।
জনক জননী ভয়ে ভাটে না জানায়॥
মনে কালীকুণ্ডমশ্যামা স্মরি সকৌতুক।
বড়বী চড়ি ঘোড়া অমনি চাবুক॥
অশ্বের শিঞ্জায় মল বিপক্ষে অনল।
চলিল কুমার যেন কুমার অটল॥
এড়াইল স্বদেশ বিদেশ কত আর।
কত ঠাঁই কত দেখে কত কব তার॥

বিদ্যানাম সোঁসর দোসর নাহি সাতে।
কথার দোসর মাত্র শুক পক্ষী হাতে ॥
কাঞ্চীপুর বৰ্দ্ধমান ছ মাসের পথ।
ছয় দিনে উত্তরিল অশ্ব মনোরথ ॥

সুন্দরের বৰ্দ্ধমান প্রবেশ।

দেখি পুরী বৰ্দ্ধমান   সুন্দর চৌদিকে চান
ধন্য গৌড় যে দেশে এ দেশ।
রাজা বড় ভাগ্যধর   কাছে নদ দামোদর
ভাল বটে জানিনু বিশেষ ॥
চৌদিকে সহরপনা   দ্বারে চৌকী কত জনা
মুরুচা বুরুজ শিলাময়।
কামানের হুড়াহুড়ী   বন্দুকের দুড়দুড়ি
সলখে বাণের গড় হয় ॥
বাজে শিঙ্গা কাড়া ঢোল   নৌবত ঝাঁঝের রোল
শঙ্খ ঘণ্টা বাজে ঘড়ি ঘড়ি।
তীর গুলি শনশনি   গজঘণ্টা ঠনঠনি
ঝড় বহে অশ্ব দড় বড়ি ॥
ঢালী খেলে উড়া পাকে   ঘন হান হান হাঁকে
রায়বেঁশে লোকে রায়বাঁশ।

মল্লগণ মালসাটে   ফুটি হেন মাটী ফাটে
দূরে হৈতে শুনিতে তরাস ॥
নদী জিনি খড়খানা   দ্বারে হাবসীর থানা
বিকট দেখিয়া লাগে শঙ্কা।
দশা সর্ব্বমঙ্গলার   লঙ্ঘিতে শকতি কার
সমুদ্রের মাঝে যেন লঙ্কা ॥
যাইতে প্রথম থানা   জিজ্ঞাসে করিয়া মানা
কোথা হৈতে এলে কোথা যাও।
কি জাতি কি নাম ধর   কোন ব্যবসায় কর
না কহিলে যাইতে না পাও ॥
সুন্দর বলেন ভাই   আমি বিদ্যা ব্যবসাই
দাক্ষিণাত্য কাঞ্চিপুর ধাম।
আসিছি বিদ্যার আশে   যাইব রাজার পাশে
সুকবি সুন্দর মোর নাম ॥
দ্বারী কহে এ কি হয়   পড়ুয়ার বেশ নয়
পুঁজী পুথি পুস্তি ধরে তারা।
ঘোড়াচড়া জোড়া অঙ্গে   পাঁচ হাতিয়ার সঙ্গে
চোর কিম্বা হবে হরকরা ॥
নীচ যদি উচ্চ ভাবে   সুবুদ্ধি উড়ায় হাসে
রায় বলে বটি বিদ্যাচোর।

খুঙ্গী পুথি ছিল সঙ্গে দেখায়ে কহেন রঙ্গে
তুষ্ট হৈনু রুষ্ট বাক্যে তোর ॥
বিনয়ে দুয়ারি কয় শুন শুন মহাশয়
বুঝিনু পড়ুয়া তুমি বট।
ঘোড়াচড়া জোড়াপরা বিদেশী . তের ধরা
ছাড়ি দিলে আমি হব নট ॥
ঠক্ ভরা দরবার ছলে লয় ঘর দ্বার
খর ধার ছুঁতে কাটে মাছি।
চাকুরির মুখে ছাই ছাড়িতে না পারি ভাই
বিষকৃমিসম হয়ে আছি ॥
সুন্দর কহেন ভাই ঘোড়া জোড়া ছেড়ে যাই
খুঙ্গী পুথি ধুতি পাথি লয়ে।
তবে নাকি ছাড় দ্বারি দ্বারী কহে তবে পারি
জমাদ্দার বখশীরে কয়ে ॥
শিরোপা স্বরূপে রায় পেসকোস দিলা তায়
ঘোড়া জোড়া পাঁচ হাতিয়ার।
দ্বারী ছেড়ে দিল দ্বার থানায় হইয়া পার
প্রবেশিলা নগরে কুমার ॥

গড় বর্ণন।

দ্বারিরে শিরোপা দিয়া ঘোড়া জোড়া অস্ত্র।
পদব্রজে চলিলা পরিয়া যুগ্ম বস্ত্র॥
বাম কক্ষে খুঙ্গী পুথি ডানি করে শুক।
ধীরে ধীরে চলে ধীর দেখিয়া কৌতুক॥
সম্মুখে দেখেন চক চাঁন্দনী সুন্দর।
নৌবত বাজিছে বালাখানার উপর॥
চকের মাঝেতে কোতোয়ালি চবুতরা।
কাটকে আটক যত বাজে দায়ধরা॥
ডাকাতি ছিনার চোর হাজার হাজার।
বেড়ী পায় মেগে খায় বাজার বাজার॥
বসিয়াছে কোতোয়াল ধূমকেতু নাগ।
যমালয় সমান লেগেছে ধূমধাম॥
ঠকঠকি হাড়ির কোড়ার পটপটি।
চর্ম্ম উড়ে চর্ম্মপাদুকার চটচটি॥
কেহ বা দোহাই দেয় কেহ বলে হায়।
কেহ বলে বাপ বাপ মরি প্রাণ যায়॥
কোটালের ভয়ে কেহ নাহি করে দয়া।
দেখিয়া সুন্দর ভয়ে ভাবেন অভয়া॥
ভারত কহিছে কেন ভাবহ এখনি।
ঠেকিবা যখন সুখ জানিবা তখনি॥

পুর বর্ণন ।

ওহে বিনোদরায় ধীরে যাও হে ॥
অধরে মধুর হাসি বাঁশীটি বাজাও হে ॥
নবজলধর তনু শিখিপুচ্ছ শক্রধনু
পীত ধড়া বিজুলিতে ময়ূরে নাচাও হে ॥
নয়ন চকোর মোর দেখিয়া হয়েছে ভোর
মুখ সুধাকর হাসি সুধায় বাঁচাও হে ॥
নিত্য তুমি খেল যাহা নিত্য ভাল নহে তাহা
আমি যে খেলিতে কহি সে খেলা খেলাও হে ।
তুমি যে চাহনি চাও সে চাহনি কোথা পাও
ভারত যেমত চাহে সেই মত চাও হে ॥

চলে রায় পাছু করি কোটালের থানা ।
দেখে জাতি ছত্রিশ ছত্রিশ কার খানা ॥
চৌদিকে সহর মাঝে মহল রাজার ।
আট হাট ষোল গলি বত্রিশ বাজার ॥
থামে বান্ধা মত্ত হাতী হলকে হলকে ।
শুড় নাড়ে মদ ঝাড়ে ঝলকে ঝলকে ॥
ইরাকী তুরকী তাজ আরবী জাহাজী ।
হাজার হাজার দেখে থানে বান্ধা বাজী ॥

উট গাদা খচর গণিতে কেবা পারে।
পালিয়াছে পশু পক্ষী যে আছে সংসারে।
ব্রাহ্মণমণ্ডলে দেখে বেদ অধ্যয়ন।
ব্যাকরণ অভিধান স্মৃতি দরশন॥
ঘরে ঘরে দেবালয় শঙ্খ ঘণ্টা রব।
শিবপূজা চণ্ডীপাঠ যজ্ঞ মহোৎসব॥
দেখিয়া নগরশোভা বাখানে সুন্দর।
সমুখে দেখেন সরোবর মনোহর॥
স্নানে বান্ধা চারি ঘাট শিবালয় চারি।
অবধূত জটাভস্মধারী সারি সারি॥
চারি পাড়ে সুচারু পুষ্পের উপবন।
গন্ধ লয়ে মন্দ বহে মলয় পবন॥
টল টল করে জল মন্দ মন্দ বায়।
নানা পক্ষী জলচর খেলিয়া বেড়ায়॥
শ্বেত রক্ত নীল পীত শত শতচ্ছদ।
ফুটে পদ্ম কুমুদ কহলার কোকনদ॥
ডাহুক ডাহুকী নাচে খঞ্জনী খঞ্জন।
সারস সারসী রাজহংস আদিগণ॥
স্থলজ জলজ ফুল প্রফুল্ল তুলিলা।
স্নান করি শিবশিবাচরণ পূজিলা॥

সঙ্গেতে দাড়িম ছিল ভাঙ্গিয়া কৌতুকে।
আপনি খাইলা কিছু কিছু দিলা শুকে॥
করে লয়ে এক পদ্ম লইলেন ঘ্রাণ।
এই ছলে ফুলধনু হানে ফুল বাণ॥

সুন্দরের মালিনী সাক্ষাৎ।

বসিয়া সুন্দর রায় বকুলের তলে।
শুক সঙ্গে শাস্ত্র কথা কহে কুতুহলে॥
সূর্য্য যায় অস্ত গিরি আইসে যামিনী।
হেন কালে তথা এক আইল মালিনী॥
কথায় হীরার ধার হীরা তার নাম।
দাঁত ছোলা মাজা দোলা হাস্য অবিরাম॥
গাল ভরা গুয়া পান পাকি মালা গলে।
কানে কড়ে কড়ে রাঁড়ী কথা কত ছলে॥
চূড়াবান্ধা চুল পরিধান শাদা শাড়ী।
ফুলের চুপড়ি কাঁথে ফিরে বাড়ী বাড়ী॥
বাতাসে পাতিয়া ফাঁদ কন্দল ভেজায়।
পড়শী না থাকে কাছে কন্দলের দায়॥
মন্দ মন্দ গতি ঘন ঘন হাত নাড়া।
তুলিতে বৈকালে ফুল আইল সেই পাড়া॥

ইহারিয়া হার [illegible] চিত বলে হরি হরি।
কাহ। [illegible] ঙনিরে নিছুনি লয়ে মরি ॥
কামের শরীর নাহি রতি ছাড়া নহে।
তবে সত্য ইহারে দেখিয়া যদি কহে ॥
এদেশী না হবে দেখি বিদেশির প্রায়।
কেমনে বান্ধিয়া মন ছাড়ি দিল মায় ॥
খুঙ্গি পুথি দেখি সঙ্গে বুঝি পড়ো হবে।
বাসা করি থাকে যদি লয়ে যাই তবে ॥
কাছে আসি হাসি হাসি করয়ে জিজ্ঞাসা।
কে তুমি কোথায় যাবে কোন খানে বাসা॥
সুন্দর কহেন আমি বিদ্যা ব্যবসাই।
এসেছি নগরে আমি বাসা নাহি পাই ॥
ভরসা কালীর নাম বিদ্যালাভ আশা।
ভাল ঠাঁই পাই যদি তবে করি বাসা ॥
মালিনী বলিছে আমি দুখিনী মালিনী।
বাড়ী মোর ঘেরা বটে থাকি একাকিনী ॥
নিয়মিত ফুল রাজবাড়ীতে যোগাই।
ভাল বাসে রাজরাণী সদা আসি যাই ॥
কাঙ্গাল দেখিয়া যদি ঘৃণা নাহি হয়।
আমি দিব বাসা আ(ই)স আমার আলয়॥

রায় বলে ভাল কালী দিলেন উদ্দেশ।
ইহা হৈতে বিদ্যার শুনিব সবিশেষ॥

সুন্দরের মালিনীবাটী প্রবেশ।

দুর্গা বলি সকৌতুকে লয়ে খুঙ্গী পুথি শুকে
মালিনীর বাড়ী গেলা কবি।
চৌদিকে প্রাচীর উচা কাছে নাহি গলি কুচা
পুষ্পবনে ঢাকে শশি রবি॥
নানা জাতি ফুটে ফুল উড়ি বৈসে অলিকুল
কুহু কুহু কুহরে কোকিল।
মন্দ মন্দ সমীরণ রসায় ঋষির মন
বসন্ত না ছাড়ে এক তিল॥
দেখি তুষ্ট কবিরায় বাড়ীর ভিতরে যায়
রহিলা দক্ষিণ দ্বারি ঘরে।
মালিনী হরিষ মন আনি নানা আয়োজন
অতিথি উচিত সেবা করে॥
নানা উপহারে রায় রন্ধন করিয়া খায়
নিদ্রায় পোহায় বিভাবরী।
শীতল মলয় বায় কোকিল ললিত গায়
উঠে রায় দুর্গা দুর্গা স্মরি॥

নিকটেতে দামোদর স্নান করি কবীশ্বর
বাসে আসি বসিলা পূজায়।
তুলি ফুল গাঁথি মালা সাজাইয়া সাজি ডালা
মালিনী রাজার বাড়ী যায়॥
রাজা রাণী সম্ভাষিয়া বিদ্যারে কুসুম দিয়া
মালিনী ত্বরায় আইল ঘরে।
সুন্দর বলেন মাসী নাহি মোর দাস দাসী
বল হাট বাজার কে করে॥
মালিনী বলিছে বাপু এত কেন ভাব হাপু
আমি হাট বাজার করিব।
কড়ী কর বিতরণ যাহে যবে যাবে মন
কৈও মোরে তখনি আনিব॥
শুনি তুষ্ট কবিরায় দশ টাকা দিলা তায়
দুটি টাকা দিলা নিজ রোজ।
টাকা পেয়ে মুটাভরা হীরা পরধনহরা
ঘুঝিল এ মেনে আজবোজ॥
সে টাকা ঝাপিতে ভরি রাঙ্গ তামা বারি করি
হাটে যায় বেসাতির তরে।
চলে দিয়া হাত নাড়া পাইয়া হীরার সাড়া
দোকানি দোকান ঢাকে ডরে॥

ভাঙ্গাইয়া আড়কাট   এমনি লাগায় ঠাট
বলে শালা আলা টাকা মোর।
যদি দেখে আঁটা আঁটি   কান্দিয়া তিতায় মাটি
সাধু হয়ে বেণে হয় চোর ॥
রাঙ্গ তামা মেকী মেলে রাশিতে মিশায়ে ফেলে
বলে বেটা নিলি বদলিয়া।
কান্দি কহে কোটালেরে বেণিয়ারে ফেলে ফেরে
কড়ী লয় দুহাতে গণিয়া ॥
দর করে এক মূলে   জুঁখে লয় দুনা তুলে
ঝকড়ায় ঝড়ের আকার।
গণে বুড়ি নিরূপণ   কাহনেতে চারিপণ
টাকাটায় শিকার শিকার ॥
এরূপে করিয়া হাট   ঘরে গিয়া আর নাট
বাঁকা মুখে কথা কহে চোখা।
সুন্দর ওলান বোজা   তবু নহে মুখ সোজা
যাবত না চোকে লেখা জোখা ॥

মালিনীর বেশাতির হিসাব।

বেসাতি কড়ীর লেখা বুঝ রে বাছনি
মাসী ভাল মন্দ কিবা করহ বাছনি ॥

পাছে বল বুনিপোয়ে মাসী দেই খোঁটা।
য টি টাকা দিয়াছিলা সব গুলি খোঁটা ॥
যে কাজ পেয়েছি হাটে কৈতে লাজ পায়।
এ টাকা মাসীরে কেন মাসী তোর পায় ॥
তবে হয় প্রত্যয় সাক্ষাতে যদি ভাঙ্গি।
ভাঙ্গাইনু দুকাহনে ভাগ্যে বেণে ভাঙ্গি ॥
সেরের কাহন দরে কিনিনু সন্দেশ।
আনিয়াছি আধ সের পাইতে সন্দেশ ॥
আট পণে আধ সের আনিয়াছি চিনি।
অন্য লোকে ভুরা দেয় ভাগ্যে আমি চিনি ॥
দুর্ল্লভ চন্দন চুয়া লঙ্গ জায়ফল।
সুলভ দেখিনু হাটে নাহি যায় ফল ॥
কত কষ্টে রস্ত পানু সারা হাট ফিরা।
যে টি কয় সে টি লয় নাহি লয় ফিরা ॥
দুই পণে এক পণ কিনিয়াছি পান।
আমি যেই তেঁই পানু অন্যে নাহি পান ॥
অবাক হইনু হাটে দেখিয়া গুবাক।
নাহি বিনা দোকানির না সরে গু বাক ॥
দুঃখেতে আনিনু দুগ্ধ গিয়া নদী পারে।
আমা বিনা কার সাধ্য আনিবারে পারে ॥

আট পণে আনিয়াছি কাট আট আট।
নষ্ট লোকে কাষ্ঠ বেচে তারে নাহি আঁটি॥
খুন হয়েছিনু বাছা চূণ চেয়ে চেয়ে।
শেষে না কুলায় কড়ি আনিলাম চেয়ে॥
লেখা করি বুঝ বাছা ভূমে পাতি খড়ি।
শেষে পাছে বল মাসী খায়াইল খড়ি॥
মহার্ঘ দেখিয়া দ্রব্য না সরে উত্তর।
যে বুঝি বাড়িবে দর উত্তর উত্তর॥
শুনি স্মরে মহাকবি ভারত ভারত।
এমন না দেখি আর চাহিয়া ভারত॥

মালিনীর সহ সুন্দরের কথোপকথন।

বাজার বেশাতি করি মালিনী আনিল।
রন্ধন করিয়া রায় ভোজন করিল॥
মাসী মাসী বলি ডাক দিলা মালিনীরে।
ভোজনের পরে হীরা এল ধীরে ধীরে॥
শুয়েছে সুন্দর রায় হীরা বৈসে পাশে।
রাজার বাড়ীর কথা সুন্দর জিজ্ঞাসে॥
নিত্য নিত্য যাও মাসী রাজ দরবার।
কহ শুনি রাজার বাটীর সমাচার॥

রাজার বয়স কত রাণী কয় জন।
কয় কন্যা ভূপতির কয় বা নন্দন ॥
হীরা বলে সে সকল কবরে বাছনি।
পরিচয় দেহ আগে কে বট আপনি ॥
বিষয় আশয়ে বুঝি রাজপুত্র হবে।
আমার মাথার কিরা চাতুরি না করে ॥
রায় বলে চাতুরী কহিলে কিবা হবে।
ব্যক্ত হবে আগে পাছে ছাপাত না রবে ॥
শুনেছ দক্ষিণ দেশে কাঞ্চি নামে পুর।
গুণসিন্ধু নামে রাজা তাহার ঠাকুর ॥
সুন্দর আমার নাম তাঁহার তনয়।
এসেছি বিদ্যার আশে এই পরিচয় ॥
শীহরিয়া প্রণাম করিয়া হীরা কয়।
অপরাধ মার্জ্জনা করিবে মহাশয় ॥
বাপ ধন বাছা রে বালাই যা(উ)ক দুর।
দাসীরে বলিলে মাসী ও মোর ঠাকুর ॥
কৃপা করি মোর ঘরে যত দিন রবে।
এই ভিক্ষা দেহ কোন দোষ নাহি লবে ॥
এখন বিশেষ কহি শুন হয়ে স্থির।
রাজার সকল জানি অন্দর বাহির ॥

অর্দ্ধেক বয়স রাজা এক পাটরাণী।
পাঁচ পুত্র নৃপতির সবে যুবজানি॥
এক কন্যা আইবড় বিদ্যা নাম তার।
তার রূপ গুণ কহা বড় চমৎকার॥
লক্ষ্মী সরস্বতী যদি এক ঠাঁই হয়।
দেবরাজ দেখে যদি নাগরাজ কয়॥
দেখিতে কহিতে তবু পারে কি না পারে।
যে পারি কিঞ্চিত কহি বুঝ অনুসারে॥

বিদ্যার রূপবর্ণন।

বিনানিয়া বিনোদিয়া বেণীর শোভায়।
সাপিনী তাপিনী তাপে বিবরে লুকায়॥
কে বলে শারদ শশী সে মুখের তুলা।
পদনখে পড়ি তার আছে কত গুলা॥
কি ছার মিছার কাম ধনুরাগে ফুলে।
ভুরুর সমান কোথা ভুরু ভঙ্গে ভুলে॥
কাড়ি নিল মৃগমদ নয়ন হিল্লোলে।
কাঁদে রে কলঙ্কী চাঁদ মৃগ লয়ে কোলে॥
কেবা করে কামশরে কটাক্ষের সম।
কটুতায় কোটি কোটি কালকূট কম॥

কি কাজ সিন্দূরে মাজি মুকুতার হার।
ভুলায় তকের পাঁতি দন্তপাঁতি তার॥
দেবাসুরে সদা দ্বন্দ্ব সুধার লাগিয়া।
ভয়ে বিধি তার মুখে থু(ই)লা লুকাইয়া॥
পদ্মযোনি পদ্মনালে ভাল গড়ি ছিল।
ভুজ দেখি কাঁটা দিয়া জলে ডুবাইল॥
কত সরু ডমরু কেশরি মধ্যখান।
হর গৌরী কর পদে আছে পরিমাণ॥
যে জন না দেখিয়াছে বিদ্যার চলন।
সেই বলে ভাল চলে মরাল বারণ॥
জিনিয়া হরিদ্রা চাঁপা সোণার বরণ।
অনলে পুড়িছে করি তার দরশন॥
রূপের সমতা দিতে আছিল তড়িত।
কি বলিব ভয়ে স্থির নহে কদাচিত॥
বসন ভূষণ পরি যদি বেশ করে।
রতি সহ কত কোটি কাম ঝুরে মরে॥
ভ্রমর ঝঙ্কার শিখে কঙ্কণ ঝঙ্কারে।
পড়ায় পঞ্চম স্বর ভাষে কোকিলারে॥
কিঞ্চিত কহিনু রূপ দেখিছি যেমন।
গুণের কি কব কথা না বুঝি তেমন॥

সবে এক কথা জানি তার প্রতিজ্ঞায়।
যে জন বিচারে জিনে বরিবেক তায়॥
দেশে দেশে এই কথা লয়ে গেল দূত।
আসিয়া হারিয়া গেল কত রাজসুত॥
ইথে বুঝি রূপসম নিরূপমা গুণে।
আগে যায় রাজপুত্র যে যেখানে শুনে॥
সীতা বিয়া মত হৈল ধনুর্ভঙ্গ পণ।
ভেবে মরে রাজা রাণী হইবে কেমন॥

মাল্যরচনা।

মালিনী আনিল ফুলের ভার
আনন্দ নন্দন বনের সার
বিবিধ বন্ধন জানে কুমার
সহায় হইলা কালিকা।
কুসুমআকর কিঙ্কর তায়
মলয় পবন গুণ যোগায়
ভ্রমর ভ্রমরী গুণগুণায়
ভুলিবে ভূপতিবালিকা॥

পূজিতে গিরীশ গিরীশবালা
বেল আমলকী পাতের মালা
নব রবি ছবি জবা উজালা
কমল কুমুদ মল্লিকা।
বাঁধুলী পিউলী মালতী জাতি
কুন্দ কৃষ্ণকেলি দনারপাঁতি
গুলাব সেঁউতী দেশী বিলাতি
আর কুরচীর জালিকা॥
ধুতূরা অতসী অপরাজিতা
চন্দ্র সূর্য্যমুখী অতি শোভিতা
ভারত রচিল ফুল কবিতা
কবিতারসের শালিকা॥

মালিনীর তিরস্কার।

শুন লো মালিনী কি তোর রীতি
কিঞ্চিত হৃদয়ে না হয় ভীতি॥
এত বেলা হৈল পূজা না করি।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় জ্বলিয়ে মরি॥
বুক বাড়িয়াছে কার সোহাগে।
কালি শিখাইব মায়ের আগে॥

দেখ দেখি চেয়ে কতেক বেলা।
যেয়ে পেয়ে বুঝি করিস হেলা॥
কি করিবে তোরে আমার গালি।
রাপারে কহিয়া শিখাব কালি॥
হীরা থর থর কাঁপিছে ডরে।
ঝর ঝর জল নয়নে ঝরে॥
কাঁদি কহে শুন রাজকুমারি।
ক্ষম অপরাধ আমি তোমারি॥
চিকন গাঁথনে বাড়িল বেলা।
তোমার কাজে কি আমার হেলা॥
বুঝিতে নারিনু বিধির ফন্দ।
করিনু ভালরে হইল মন্দ॥
ভ্রম বাড়িবারে করিনু শ্রম।
শ্রম বৃথা হইল ঘাটিল ভ্রম॥
খিনয়েতে বিদ্যা হইল বশ।
অস্ত গেল রোষ উদয় রস॥

বিদ্যার দেবী পূজা।

এই রূপে মালিনীরে করিয়া বিদায়।
বড় ভক্তি ভাবে বিদ্যা বসিলা পূজায়॥

পূজা না হইতে মাগে আগে ভাগে বর
দেবীরে করিতে ধ্যান দেখয়ে সুন্দর ॥
পাদ্য অর্ঘ্য আচমন আসন ভূষণ।
দেবীরে অর্পিতে করে বরে সমর্পণ ॥
সুগন্ধ সুগন্ধি মালা দেবীগলে দিতে।
বরের গলায় দেয় এই লয় চিতে ॥
দেবী প্রদক্ষিণে বুঝে বর প্রদক্ষিণ।
আকুল হইল পূজা হয় অঙ্গহীন ॥
ব্যস্ত দেখি তারে দেবী কহেন আকাশে।
আসিয়াছে তোর বর মালিনীর বাসে ॥
পূজা না হইল বলি না করিহ ভয়।
সকলি পাইনু আমি আমি বিশ্বময় ॥
আকাশবাণীতে হাতে পাইল আকাশ।
বুলিলা কালিকা মোর পূরাইলা আশ ॥

সুন্দরের সন্ন্যাসিবেশে রাজদর্শন।

রায় বলে কার্য্যসিদ্ধি হইল আমার।
এখন উচিত দেখা করিতে রাজার ॥
দেখিব রাজার সভা সভাসদগণ।
আচার বিচার রীত চরিত্র কেমন।

সন্ন্যাসির বেশে গেলে আদর পাইব।
বিদায়ের প্রসঙ্গে নানা কৌতুক করিব॥
সাত পাঁচ ভাবি সন্ন্যাসির বেশ ধরে।
পরচুল জটাভার ভস্ম কলেবরে॥
করে করে কমণ্ডলু স্ফটিকের মালা।
বিভুতির গোলা হাতে কান্ধে মৃগছালা॥
কটিতে কৌপীন ডোর রাঙ্গা বহির্বাস।
মুখে শিবনাম তেজঃ সূর্য্যের প্রকাশ॥
উপনীত হৈলা গিয়া রাজার সভায়।
উঠিয়া প্রণাম করে বীরসিংহ রায়॥
নারায়ণ নারায়ণ স্মরে কবিরায়।
শ্বশুরে প্রণাম করে এত বড় দায়॥
আর সবে প্রণমিল লুটিয়া ধরণি।
বিছাইয়া মৃগছালা বসিলা আপনি॥
সভাসদ জিজ্ঞাসয়ে শুনহ গোঁসাই।
কোথা হৈতে আসন আসন কোন ঠাঁ
নগরে আইলা কবে কোথা উত্তরিলা।
জিজ্ঞাসা করেন রাজা কি হেতু আই
সন্ন্যাসী কহেন থাকি বদরিকাশ্রমে।
আসিয়াছি যাব গঙ্গাসাগরসঙ্গমে॥

এ দেশে আসিয়া এক শুনিনু সংবাদ।
আইলাম ব্যাপারে করিতে আশীর্ব্বাদ॥
রাজার তনয়া না কি বড় বিদ্যাবতী।
শুনিলাম রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী॥
করিয়াছে প্রতিজ্ঞা সকলে বলে এই।
যে জন বিচারে জিনে পতি হবে সেই॥
অনেকে আসিয়া না কি গিয়াছে হারিয়া।
দেখিতে আইনু বড় কৌতুক শুনিয়া॥
বুঝিব কেমন বিদ্যা কিসের অভ্যাস।
নারীর এমন পণ এ কি সর্ব্বনাশ॥
বিচারে তাহার ঠাঁই আমি যদি হারি।
ছাড়িয়া সন্ন্যাস ধর্ম্ম দাস হব তারি॥
গুরু কাছে মাথা মুড়ায়েছি এক বার।
তারে গুরু মানিয়া মুড়াব জটাভার॥
সে যদি বিচারে হারে তবে রবে নাম।
সন্ন্যাসী ভাণ্ডালি তাহে নাহি কিছু কাম॥
তবে যদি সহে কেহ প্রতিজ্ঞার দায়।
নিযুক্ত করিয়া দিব শিবের সেবায়॥
ধরাইব জটা ভস্ম পরাইব ছাল।
গলায় রুদ্রাক্ষ হাতে স্ফটিকের মাল॥

তীর্থ ব্রতে লয়ে যাব দেশদেশান্তরে।
এমন প্রতিজ্ঞা যেন নারী নাহি করে॥
কাণাকাণি করে পাত্র মিত্র সভাসদ।
রাজা বলে এ কি আর ঘটিল আপদ॥
ভেবেছিনু দারুণ সন্ন্যাসী দেখি এটা।
হারিলে ইহার মুড়াবে জটা কেটা॥
হারিলে ইহাকে না কি বিদ্যা দেয়া যায়।
গুণ হয়ে দোষ হৈল বিদ্যার বিদ্যায়॥
সন্ন্যাসী কহেন কিবা ভাবহ এখন।
ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন॥
রাজা বলে গোসাই বাসায় আজি চল।
করা যাবে যুক্তিমত কালি যেবা বল॥
সভাসদে জিন আগে করিয়া বিচার।
তবে সে বিচারযোগ্য হইবা বিদ্যার॥
সে দিন বিদায় কৈল এমনি কহিয়া।
বিদ্যারে কহিছে রাজা অন্তঃপুরে গিয়া॥
হায় কেন মাটি খেয়ে পড়ানু বিদ্যায়।
বিপাক ঘটিল মোরে তোর প্রতিজ্ঞায়॥
যত রাজপুত্র আনি পলায় হারিয়া।
অভাগি বিদ্যার ভাগ্যে বুঝি নাই বিয়া॥

এসেছে সন্ন্যাসী এক করিতে বিচার।
হারাইবা হারিবা হইল দুই ভার ।।
সভাসদ সকলেরে জিনিয়া বিচারে।
প্রত্যহ সন্ন্যাসী কহে আনহ বিদ্যারে ।।
প্রত্যহ কহেন রাজা আজি নহে কালি।
তেজস্বি দেখিয়া ভয় পাছে দেয় গালি ।।

মানসিংহের সৈন্যে ঝড়বৃষ্টি।

ঘন ঘন ঘন ঘন গাজে।
শিলা পড়ে তড় তড় ঝড় বহে ঝড় ঝড়
হড়মড় কড়মড় বাজে॥

দশ দিক আন্ধার করিল মেঘগণ।
দুন হয়ে বহে উনপঞ্চাশ পবন॥
ঝঞ্ঝনার ঝঞ্ঝনী বিদ্যুত চকমকী।
হুড়মড়ী মেঘের ভেকের মকমকী॥
ঝড়ঝড়ী ঝড়ের জলের ঝর ঝরী।
চারি-দিকে তরঙ্গ জলের তরতরী॥
থরথরী স্থাবর বজ্রের কড়মড়ী।
ঘুট ঘুট আন্ধার শিলার তড়তড়ী॥
ঝড়ে উড়ে কানাত দেখিয়া উড়ে প্রাণ।
কুঁড়ে ঠাট ডুবিল তাম্বুতে এল বান॥
সাঁতারিয়া ফিরে ঘোড়া ডুবে মরে হাতি।
পাঁকে গাড়া গেল গাড়ী উট তার সাতি॥
ফেলিয়া বন্দুক জামা পাগ তলবার।
ঢাল বুকে দিয়া দিল সিপাই সাঁতার॥
খাবি খেয়ে মরে লোক হাজার হাজার।

ভাণ্ডারের দ্রব্য তার ব্যয়ে না ফুরায়॥
নায়ে ভরি লয়ে নানাজাতি দ্রব্যজাত।
রাজা মানসিংহে গিয়া করিলা সাক্ষাত॥
দেখি মানসিংহ রায় তুষ্ট হৈলা বড়।
বাঙ্গালায় জানিলাম তুমি বন্ধু দড়॥
কে কোথা রাখিতে পারে [illegible]
বাঁচাইলা সকলেরে [illegible]
বাঁচাইয়া বিধি যদি দিল্লী [illegible]
অবশ্য আনিব কিছু [illegible]॥

ভেসে গেল মালমাত্তা উরুদু বাজার ॥
বকরী বকরা মরে কুকুড়ী কুকুড়া।
কুজড়ানী কোলে করি ভাসিল কুজড়া ॥
ঘাসের বোঝায় বসি ঘেসেড়ানি ভাসে।
ঘেসেড়া মরিল ডুবে তাহার হা ভাসে ॥
কান্দি কহে ঘেসেড়ানী হায় রে গোসাঁই
এমন বিপাকে আর কভু ঠেকি নাই ॥
ডুবে মরে কঞ্চনী কঞ্চন বুকে করি।
কালোয়াত ভাসিল বীণার লাউ ধরি ॥
বাপ বাপ মরি মরি হায় হায় হায়।
উভরায় কাঁদে লোক প্রাণ যায় যায় ॥
কাঙ্গাল হইনু সবে বাঙ্গালায় এসে।
শির বেচে টাকা করি সেহ যায় ভেসে ॥
এই রূপে লস্করে দুষ্কর হৈল বৃষ্টি।
মানসিংহ বলে বিধি মজাইল সৃষ্টি ॥
গাড়ি করি এনেছিল নৌকা বহুতর।
প্রধান সকলে বাঁচে তাহে করি ভর ॥
নৌকা চড়ি বাঁচিলেন মানসিংহ রায়।
মজুন্দার শুনিয়া আইলা চড়ি নায় ॥
অন্নপূর্ণা ভগবতী তাহারে সহায়।

ভাণ্ডারের দ্রব্য তার ব্যয়ে না ফুরায় ॥
নায়ে ভরি লয়ে নানাজাতি দ্রব্যজাত।
রাজা মানসিংহে গিয়া করিলা সাক্ষাত ॥
দেখি মানসিংহ রায় তুষ্ট হৈলা বড়।
বাঙ্গালায় জানিলাম তুমি বন্ধু দড় ॥
কে কোথা বাহির হয় এমন দুর্যোগে।
বাঁচাইলা সকলেরে নানামত ভোগে ॥
বাঁচাইয়া বিধি যদি দিল্লী লয়ে যায়।
অবশ্য আনিব কিছু তোমার সেবায় ॥
এই রূপে মজুন্দার সপ্তাহ যাবত।
যোগাইলা যত দ্রব্য কি কব তাবত ॥
মানসিংহ জিজ্ঞাসিলা কহ মজুন্দার।
কি কর্ম্ম করিলে পাব এ বিপদে পার ॥
দৈব বল কিছু বুঝি আছয়ে তোমার।
এত দ্রব্য যোগাইতে শক্তি আছে কার ॥
মানসিংহে বিশেষ কহেন মজুন্দার।
অন্নপূর্ণা বিনা আমি নাহি জানি আর ॥
মানসিংহ বলে তাঁর পূজার কি ক্রম।
কহিলেন মজুন্দার যে কিছু নিয়ম ॥
অন্নপূর্ণা পূজা কৈলা মানসিংহ রায়।

দূর হৈল ঝড় বৃষ্টি দেবীর কৃপায় ॥
মানসিংহ গেলা মজুন্দারের আলয়।
দেখিলা গোবিন্দদেবে মহানন্দময় ॥
আসরফী বস্ত্র অলঙ্কার আদি যত।
দিলেন গোবিন্দদেবে কব তাহা কত ॥
মজুন্দার সে সকল কিছু না লইলা।
ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণে বিতরিয়া দিলা ॥
ইতঃ পর শুন সবে ভারত রচিলা।
সৈন্য লয়ে মানসিংহ যশোরে চলিলা ॥

মানসিংহের যশোরযাত্রা।

ধাঁ ধাঁ গুড় গুড় বাজে নাগারা।
বাজে রবাব মৃদঙ্গ দোতারা ॥
পায়দল কলবল ভূতল টলমল
সাজল দলবল অটল সোয়ারা।
দামিনী চক চক জামকী ধক ধক
ঝক মক চক মক খর তরবারা ॥
ব্রাহ্মণ রজপুত ক্ষত্রিয় রাহুত
মোগল মাহুত রণ অনিবারা।

ভাঁড় কলাবত নাচত গায়ত
ভারত অভিমত গীতসুধারা ॥
চলে রাজা মানসিংহ যশোর নগরে।
সাজ সাজ বলি ডঙ্কা হইল লস্করে ॥
ঘোড়া উট হাতি পিঠে নাগারা নিশান।
গাড়ির উপর কামান চলে বাণ চন্দ্রবাণ ॥
হাতির আমারী ঘরে বসিয়া আমীর।
আপন লস্কর লয়ে হইল বাহির ॥
আগে চলে লালপোশ খাসবরদার।
সিফাই সকল চলে কাতার কাতার ॥
তবকী ধানুকী ঢালী রায়বেঁশে মাল।
দফাদার জমাদার চলে সদীয়াল ॥
আগে পাছে হাজারীর হাজার হাজার।
নটী নট হরকরা উরুদু বাজার ॥
সানাই কপাল বাজে রাগ আলাপিয়া।
ভাট পড়ে রায়বার যশ বর্ণাইয়া ॥
ধাটী গায় কড়খা ভাঁড়াই করে ভাঁড়।
মালে করে মালাম চেয়াড়ে লোফে কাঁড় ॥
আগে পাছে দুই পাশে দুসারি লস্কর।
চলিলেন মানসিংহ যশোর নগর ॥

মজুন্দারে সঙ্গে নিলা ঘোড়া চড়াইয়া।
কাছে কাছে অশেষ বিশেষ জিজ্ঞাসিয়া॥
এই রূপে যশোর নগরে উত্তরিয়া।
থানা দিলা চারি দিকে মুরুচা করিয়া॥
শিষ্টাচার মত আগে দিলা সমাচার।
পাঠাইয়া ফরমান বেড়ী তলবার॥
প্রতাপআদিত্য রাজা তলবার লয়ে।
বেড়ী ফিরা পাঠাইয়া পাঠাইল কয়ে॥
কহ গিয়া অরে চর মানসিংহ রায়ে।
বেড়ী দে(উ)ক আপনার মনিবের পায়ে॥
লইলাম তলবার কহ গিয়া তারে।
যমুনার জলে ধুব এই তলবারে॥
শুনি মানসিংহ সাজে করিতে সমর।
পড়িলা ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

মানসিংহ ও প্রতাপআদিত্যের যুদ্ধ।

ধূধূ ধুধূ ধূ নৌবত বাজে।
ঘন ভোরঙ্গ ভম ভম দমামা দম দম
ঝনন্ন ঝম ঝম ঝাঁজে॥

কত নিশান ফরফর নিনাদ ধর ধর
কামান গর গর গাজে ॥
সব জুয়ান রাজপুত পাঠান মজবুত
অস্ত্র শস্ত্রযুত সাজে ॥
ধরি অঙ্গে প্রহরণ জরীর পহিরণ
সিপাহীগণ রণ মাজে ॥
শিরি করাইবখন্তর পোশাক বহুতর
সুশোভি শিরপর তাজে ॥
বসি আমারি ঘর পর আমীর বহুতর
জলুষে গজবররাজে ॥
ধুর ফরোসে সংকেত নকীব শত শত
হুঁসিয়ার ফুকরত কাজে ॥
হয় গজের গরজন সেনার তরজন
পয়োধি তরজন লাজে ॥
দ্বিজ ভারত কবিবর বনায় তঁহি পর
প্রতাপদিনকর সাজে ॥

যুঝে প্রতাপআদিত্য যুঝে প্রতাপআদিত্য।
ভাবিয়া অসার ডাকে মার মার
সংসার সব অনিত্য ॥

শিলাময়ী নামে ছিলা তার ধামে
অভয়া যশোরেশ্বরী।
পাছেতে ফিরিয়া বসিলা রুষিয়া
তাহারে অরূপা করি ॥
বুঝিয়া অহিত গুরু পুরোহিত
মিলে মানসিংহরাজে।
লস্কর লইয়া স্বস্থির হইয়া
প্রতাপআদিত্য সাজে ॥
ধূধূধুম ধুম ঝাঁ ঝাঁ ঝম ঝম
দগামা দমদম বাজে।
হুড় হুড় গুড় দুড় দুড় দুড়
কামানের গোলা গাজে ॥
সিন্দূরসুন্দর মণ্ডিত মুদ্গার
ষোড়শ হলকা হাতি।
পতাকা নিশান রবিচন্দ্রবান
অশ্বেক ঘোড়া সাতি ॥
সুন্দর সুন্দর নৌকা বহুতর
বায়ান্ন হাজার ঢালী।
সমরে পশিয়া অন্তরে রুষিয়া
— দলে গালাগালি ॥

ঘোড়ায় ঘোড়ায় যুঝে পায় পায়

গজে গজে শুণ্ডে শুণ্ডে ।

সোয়ারে সোয়ারে খর তরবারে

মালে মালে মুণ্ডে মুণ্ডে ॥

[illegible] ঝাঁকে খেলে উড়ে পাকে

পাইকে পাইকে যুঝে ।

কামানের ধূমে তমঃ রণভূমে

আত্ম পর নাহি বুঝে ॥

তীর শনশনি গুলী ঠনঠনী

খাঁড়া ঝনঝন ঝাঁকে ।

মুড়িয়া ঝোঁকে শূল শেল লোফে

ক্রোধে হান হান হাঁকে ॥

ভালায় ফুটিয়া পড়িছে লুটিয়া

গুলিতে মরিছে কেহ ।

গোলায় উড়িছে আগুনে পুড়িছে

তীরে কেহ ছাড়ে দেহ ॥

পাতসাহি ঠাটে কবে কেবা আঁটে

বিস্তর লস্কর মারে ।

বিমুখ অভয়া কে করিবে দয়া

প্রতাপআদিত্য হারে ॥

শেষে ছিল যারা পলাইল তারা
মানসিংহে জয় হৈল।
পিঞ্জর করিয়া পিঞ্জরে ভরিয়া
প্রতাপআদিত্য লৈল ॥
দল বল সঙ্গে পুনরপি রঙ্গে
চলে মানসিংহ রায়।
ললিত স্বচ্ছন্দে পরম আনন্দে
রায় গুণাকর গায় ॥

মানসিংহের ভবানন্দবাটী আগমন।

প্রতাপআদিত্য রায়ে পিঁজরা ভরিয়া।
চলে রাজা মানসিংহ জয়ডঙ্কা দিয়া ॥
কচুরায় পাইল যশোরজিত নাম।
সেই রাজ্যে রাজা হৈল পূর্ণ মনস্কাম ॥
মজুন্দারে মানসিংহ কহিলা কি বল।
পাতসার হুজুরে আমার সঙ্গে চল ॥
পাতসার সহিত সাক্ষাত মিলাইব।
রাজ্য দিয়া ফরমানী রাজা করাইব ॥
অন্নপূর্ণা ভগবতী তোমার সহায়।
জয়ী হয়ে যাই আমি তোমার দয়ায় ॥

নানামতে অন্নপূর্ণাদেবীরে পূজিয়া।
চলিলেন মজুন্দারে সংহতি লইয়া॥
অন্নপূর্ণাদেবীরে পূজিয়া মজুন্দার।
নানামত সংহতি চলিলা দরবার॥
মহামায়া মাহেশ্বরী মহিষমর্দ্দিনী।
মোহরূপা মহাকালী মহেশমোহিনী॥
কৃপাময়ী কাতর কিঙ্করে কৃপা কর।
তোমা বিনা কেবা আর করুণাআকার॥

ভবানন্দের দিল্লী যাত্রা।

দিয়া নানা উপচার   পূজা করি অন্নদার
দিল্লী যাত্রা কৈল মজুন্দার।
জননী [illegible] সীতা   রামসমার্দ্দার পিতা
সমর্পিলা পদে অন্নদার॥
শিরে চীরা হীরা তায়   বিলাতি খেলাত গায়
নানাবন্ধে কমর বান্ধিলা।
বিল্বপত্র ঘ্রাণ লয়ে   বন্ধুগণে প্রিয় কয়ে
গোবিন্দদেবেরে প্রণমিলা॥
বাপ মায় প্রণমিয়া   দুই নারী সম্ভাষিয়া
আরোহিলা পালকী উপর॥

জয় অন্নপূর্ণা কয়ে চলিলা সত্বর হয়ে
মঙ্গল দেখেন বহুতর ॥
ধেনু বৎস এক স্থানে বৃষ খুরে ক্ষিতি টানে
দক্ষিণেতে ব্রাহ্মণ অনল।
জয় ধ্বজ পতাকায় রাজা মানসিংহ রায়
আগে আগে সকল মঙ্গল ॥
পূর্ণ ঘট বাম পাশে রামাগণ [illegible] বাসে
গণিকারে মালা বেচে মালী।
ঘৃত দধি মধু মাসে রজত লইয়া হাসে
কুজড়ানী দেখাইয়া ডালী ॥
শুক্ল ধান্যে গাথি হার কাঞ্চন সুমেরু তার
আশীর্ব্বাদ দিয়াছেন গীতা।
নকুল সহিত যান বাম দিকে ফিরা চান
শিবারূপে শিবের বনিতা ॥
নীলকণ্ঠ উড়ি ফিরে মণ্ডলী দিতেছে শিরে
অন্নপূর্ণা ক্ষেমঙ্করী হয়ে।
দেখি যত শুভফল মজুন্দারে কুতূহল
চলিলা দেবীর গুণ কয়ে ॥
শিরে চীরা জামা গায় কটি আঁটি পট্টুকায়
দাসু বাসু সঙ্গে দুই দাস।

সুতেরে বিদায় দিয়া সীতা দেবী ঘরে গিয়া
নানামত ভাবেন হুতাশ ॥
বাড়ীর নিকটে খড়ে পার হৈলা নায়ে চড়ে
অগ্রদ্বীপে গেলা কতূহলে।
অঞ্জলি বান্ধিয়া মাথে প্রণমিয়া গোপীনাথে
স্নান দান কৈলা গঙ্গাজলে ॥
মনে করি অনুভব গঙ্গারে করিলা স্তব
কৃতাঞ্জলি হয়ে মজুন্দার।
ব্রহ্মকমণ্ডলুবাসী বিষ্ণুপাদপ্রসূতাসি
শিবজটাজূটে অবতার ॥
বরমিহ তব তীরে শরট করট ফিরে
ন পুন ভূপতি তব দূরে।
রাজ্যলোভে দূরে যাই তব তীরে রাজ্য পাই
এই মনস্কাম যেন পূরে ॥
স্তবে হয়ে তুষ্ট মন গঙ্গা দিলা দরশন
মজুন্দারে কহেন সরসে।
ধন্য তুমি মজুন্দার ব্রতদাস অন্নদার
আমি ধন্যা তোমার পরশে ॥
মহাসুখে দিল্লী যাবে মনোমত রাজ্য পাবে
মোর তীরে পাবে অধিকার।

সন্তান হইবে যত সবে হবে অনুগত
অনেক হইবে রাজা তার॥
দিয়া এই বরদান গঙ্গা কৈলা অন্তর্দ্ধান
মজুন্দার হৈলা গঙ্গা পার।
কৃষ্ণচন্দ্র আজ্ঞায় রায় গুণাকর গায়
অন্নপূর্ণা সহায় যাহার॥

পাতশার নিকটে বাঙ্গালার বৃত্তান্ত কথন।

কহ মানসিংহ রায় গিয়াছিলা বাঙ্গালায়
কেমন দেখিলা সেই দেশ।
কেমন করিলা রণ কহ তার বিবরণ
না জানি পাইলা কত ক্লেশ॥
মানসিংহ যোড়হাতে অঞ্জলি বান্ধিয়া মাথে
কহে জাঁহাপনা সেলামত।
রামজীর কুদরতে ফতে হইল কতে
কেবল তোমারি কিরামত॥
হুকুম করেন শাহী আর কিছু নাহি চাহি
জের হইল দিগর তামাম।
গোলাম গোলামী কৈল গালিম কয়েদ হৈল
বাহাদুরী সাহেবের নাম॥

পাতশা হইল খুশি কহিতে লাগিলা হাসি
কহ রায় কি চাহ ইনাম।
কহে মানসিংহ রায় গোলাম ইনাম চায়
ইনামে সে যাহে রহে নাম॥
ফিরিঙ্গি বাঙ্গালায় ঠেকেছিনু বড় দায়
সাত রোজ দারুণ বাদলে।
বিস্তর লস্কর মৈল অবশেষে যাহা রৈল
উপবাসী সহ দলবলে॥
ভবানন্দ মজুন্দার নাম খুব হুশিয়ার
বাঙ্গালি বামন এই জন।
সপ্তাহ খোরাক দিল সকলেরে বাঁচাইল
সবে বৈল ইহারি কারণ॥
অন্নপূর্ণা নামে দেবী তাঁহার চরণ সেবি
কেরামত কামাল ইহার।
সে দেবীর পূজা দিয়া ঝড় বৃষ্টি মিটাইয়া
যোগাইল সকলে আহার॥
রাজ্য দিব কহিয়াছি সঙ্গে সঙ্গে আনিয়াছি
গোলাম কবুলে পার পায়।
স্বদেশে রাজাই পায় দোয়া দিয়া ঘরে যায়
ফরমান ফরমাহ তায়॥

দেখা হৈল হজরতে বজা আনে খেদমতে
গোলামের এ বড়ই নাম।
শুনিয়া এ কথা তার ক্রোধ হৈল পাতশার
ভারত ভাবিছে পরিণাম ॥

পাতশাহের দেবতা নিন্দা।

এ ফের বুঝিবে কেবা।
তারে শুঝে বুঝে যেবা ॥
নিত্য নিরঞ্জন সত্য সনাতন
মিথ্যা যত দেবী দেবা ॥
নীরূপ যে ভাবে স্বরূপপ্রভাবে
বুঝি কিছু বুঝে সে বা ॥
ঈশ্বরের নামে তরি পরিণামে
কে বা গয়া গঙ্গা রেবা ॥
ভারত ভূতলে যে করে যে বলে
সব ঈশ্বরের সেবা ॥
পাতসা কহেন শুন মানসিংহ রায়।
গজব করিলা তুমি আজব কথায় ॥
লস্করে দু তিন লাখ আদমী তোমার।
হাতি ঘোড়া উট গাদা খচর যে আর ॥

এ সকলে ঝড় বৃষ্টি হৈতে বাঁচাইয়া ।
বামন খোয়ারি দিল অন্নদা পূজিয়া ॥
সব [illegible] ছিল দাগা ভূতেরে পূজায় ।
[illegible] বেঁড়ে কলা ভুলাইয়া খায় ॥
[illegible] খুব হিন্দুর ধরম ।
[illegible] হিন্দুপতি পাইবে সরম ॥
সব [illegible] জি দিল না পেশ্চে কোরাণ ।
ঝুট মুট পড়ে মরে আগম পুরাণ ॥
গোসাঁই মন্দের মুখে হাত বুলাইয়া ।
আপনার নুর দিলা দাড়ী গোঁফ দিয়া ॥
হেন দাড়ী বামণ মুড়ায় কি বিচারে ।
[illegible] দাড়ী গোফ সাঁই দিল তারে ॥
আর দেখ পাঠা পাঁঠী না করি জবাই ।
উভ চোটে কেটে বলে খাইল গোসাঁই ॥
হালাল না করি করে নাহক হালাক ।
যত কাম করে হিন্দু সকলি নাপাক ॥
ভাতের কি কব পান পানীর আয়েব ।
কাজি নাহি মানে পেকম্বরের নায়েব ॥
আর দেখ নারীর খসম মরি যায় ।
নিকা নাহি দিয়া রাঁড় করি রাখে তায় ।

ফল হেতু ফুল তার মাসে মাসে ফুটে।
বীজ বিনা নষ্ট হয় সে পাপ কি ছুটে॥
মাটী কাঠ পাথরের গড়িয়া মুরুত।
জীউ দান দিয়া পূজে নানামত ভূত॥
নদীতে বনাইয়া জীউ দেয় যারে।
ভাব দেখি সে কি তারে তরাবারে পারে॥
বিশেষ বামণ জাতি বড় দাগাদার।
আপনারা এক জপে আরে বলে আর॥
পরদারে পাপ বলি বাঁদী রাখে নাই।
দুঃখ ভোগ হেতু হিন্দু করেছে গোসাঁই॥
বন্দগী করিবে বন্দা জমীনে ঠুকিয়া।
করিম দিয়াছে মাথা করম করিয়া॥
মিছা ফাঁদে পড়ি হিন্দু তাহা না বুঝিয়া।
যারে তারে সেবা দেই ভূমে মাথা দিয়া॥
যতেক বামণ মিছা পুথি বনাইয়া।
কাফের করিল লোকে কোফর পড়িয়া॥
দেবীবলি দেই গাছে ঘড়ায় সিন্দুর।
হায় হায় আখেরে কি হইবে হিন্দুর॥
বাঙ্গালিরে কত ভাল পশ্চিমার ঘরে।
পান পানী খানা পিনা আয়েব না করে॥

দাড়ী রাখে বাঁদী রাখে আরজবে খায়।
কান ফোঁড়ে টিকী রাখে এই মাত্র দায়॥
আমার বাসনা হয় যত হিন্দু পাই।
সুন্নত দেওয়াই আর কলমা পড়াই॥
জন কত তোমরা গোঁয়ার আছ জানি।
মিছা লয়ে ফির বেইমানী হিন্দুয়ানি॥
দেহ জ্বলি যায় মোর বামণ দেখিয়া।
বামণেরে রাজ্য দিতে বল কি বুঝিয়া॥
প্রতাপআদিত্য হিন্দু ছিল বাঙ্গালায়।
গালিমী করিল তাহে পাঠানু তোমায়॥
কাফর বাঙ্গালি হিন্দু বেদীন বামণ।
তাহারে রাজাই দিতে নাহি লয় মন॥
বুঝিলাম অন্নপূর্ণা ভূত দেখাইয়া।
ভুলাইল বামণ তোমারে বাজী দিয়া॥
এমন হিন্দুর ভূত দেখিছি বহুত।
মোরে কি ভুলাবে হিন্দু দেখাইয়া ভূত।
আর কিছু ইনাম মাগিয়া লহ রায়।
বামণেরে বল ভূত দেখাক্ আমায়॥
আগু হয়ে মজুন্দার কহিতে লাগিলা।
অন্নদামঙ্গল দ্বিজ ভারত রচিলা॥

পাতশার প্রতি মজুন্দারের উত্তর।

এ কথা কও কেমনে। নর নিন্দে নারায়ণে ॥
যেই নিরাকার সেই সে সাকার
তাঁরি রূপ ত্রিভুবনে।
তেজঃ ভাবে যোগী দেবী ভাবে ভোগী
কৃষ্ণ ভাবে ভক্ত জনে ॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষের বিশ্রাম
কেবল তরে ভজনে।
ভারতের সার গোবিন্দ সাকার
নিত্যানন্দ বৃন্দাবনে ॥
মজুন্দার কহে জাহাঁপনা সেলামত।
দেবতার নিন্দা কেন কর হজরত ॥
হিন্দু মুসলমান আদি জীব জন্তু যত।
ঈশ্বর সবার এক নহে দুই মত ॥
পুরাণের মত ছাড়া কোরাণে কি আছে।
ভাবি দেখ আগে হিন্দু মুসলমান পাছে ॥
ঈশ্বরের নূর বলি দাড়ীর যতন।
টিকি কাটি নেড়া মাথা এ যুক্তি কেমন ॥
কর্ণবেধে যদি হয় হিন্দু গুণাগার।
সুন্নতের গুণা তবে কত গুণ তার ॥

মাটী কাষ্ঠ পাথর প্রভৃতি চরাচর।
পুরাণে কোরাণে দেখ সকলি ঈশ্বর॥
তাঁহার মূরতি গড়ি পূজা করে যেই।
নিরাকার ঈশ্বর সাকার দেখে সেই॥
সাকার না ভাবিয়া যে ভাবে নিরাকার।
সেও কেলি কেবল আঁচলে গিরা সার॥
দেব দেবী পূজা বিনা কি হবে রোজায়॥
স্ত্রী পুরুষ বিনা কোথা সন্তান খোজায়॥
দেবী পূজা করে হিন্দু বলিদান দিয়া।
যবনেরা জবে করে পেটের লাগিয়া॥
দেবী ভাবি হিন্দুরা সিন্দূর দেই গাছে।
শূন্য ঘরে নমাজ কি কাজ তাহে আছে॥
খসম ছাড়িয়া যেনা নিকা করে ষাঁড়।
একে ছাড়ি গাই যেন ধরে আর ষাঁড়॥
ঈশ্বরের বাক্য বেদ আগম পুরাণ।
সয়তান বাজী সেই এ যদি প্রমাণ॥
সেই ঈশ্বরের বাক্য কোরাণ যে কয়।
সেহ সয়তান বাজী কহিতে কি ভয়॥
হিন্দুরে সুন্নত দিয়া কর মুসলমান।
কাণে ছেঁদা মুদে যদি তবে সে প্রমাণ॥

ড

কারসাজী বলি বর্ণবেধে বল বাজী।
ভেবে দেখ সুন্নত বিষম কারসাজী ॥
বেদমন্ত্র না মানিয়া কলমা পড়ায়।
তবে জানি সেই ক্ষণে সে মন্ত্র ভুলায় ॥
প্রণাম করিতে মাথা দিল সে গোসাঁই।
সংসারে যে কিছু মূর্ত্তি তাহা ছাড়া নাই।
ভেদজ্ঞানী নহে হিন্দু অভেদ ভাবিয়া।
যারে তারে সেবা দেয় ভূমে মাথা দিয়া॥
সূর্য্যরূপে ঈশ্বরের পূর্ব্বেতে উদয়।
পূর্ব্বমুখে পূজে হিন্দু জ্ঞানোদয় হয় ॥
পশ্চিমে সূর্য্যের অস্ত সে মুখে নমাজ।
যত করে মুসলমান সকলি অকাজ॥
ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রাহ্মণ সে ব্রহ্মার নায়েব।
না মানে না করে খানা পিনার আয়েব ॥
বাম হস্ত নাপাক তসবী জপে তায়।
হিন্দুরে নাপাক বলে এত বড় দায় ॥
উত্তম হিন্দুর মত তাহে বুঝে ফের ॥
হায় হায় যবনের কি হবে আখের ॥
যবনেরে কত ভাল ফিরিঙ্গির মত।
কর্ণবেধ নাহি করে না দেয় সুন্নত ॥

শৌচ আচমন নাহি যাহা পায় খায়।
কেবল ঈশ্বর আছে বলে এই দায়॥
মজুন্দার কৈলা যদি এ সব উত্তর।
ক্রুদ্ধ হৈলা জাহাঁগীর দিল্লীর ঈশ্বর॥
নাজিরে কহিলা বন্দী কর রে বামণে।
দেখিব হিন্দুর ভূত বাঁচায় কেমনে॥
ক্রুদ্ধ হয়ে মানসিংহ চলিল বাসায়।
বিরচিল পাঁচালি ভারতচন্দ্র রায়॥

দাস্থ বাস্থর খেদ।

পাতশার আজ্ঞা পায় নাজির সত্বরে ধায়
মজুন্দারে কয়েদ করিল।
দিলেক হাবসিখানা অন্ন জল কৈল মানা
দ্রব্যজাত লুটিয়া লইল॥
কাহার প্রভৃতি যারা ছুটিয়া পলায় তারা
দাস্থ বাস্থ কান্দে উভরায়।
হায় হায় হরি হরি বিদেশে বিপাকে মরি
ঠাকুরের কি হইল দায়॥
দাস্থ বলে বাস্থ ভাই পলাইয়া চল যাই
কি হইবে বিদেশে মরিলে।

বিস্তর চাকরী পাব বিস্তর পরিব খাব
কোন রূপে পরাণ থাকিলে ॥
কান্দিয়া কহিছে বাসু উচিত কহিলা দাসু
এই দুখে মোর প্রাণ কাঁদে।
মরি তাহে দুখ নাই নারী রৈল কোন ঠাঁই
বিধাতা ফেলিল এ কি ফাঁদে ॥
হেদে বামনের ছেলে আগু পাছু নাহি চেলে
দিল্লী আইল রাজাই করিতে।
দুধে ভাতে ভাল ছিল হেন বুদ্ধি কেটা দিল
পাতশার দেয়ানে আসিতে ॥
মানসিংহ সঙ্গ পেয়ে রাজা হৈতে এল ধেয়ে
এখন সে মানসিংহ কই।
গাঁজাখোর রজপুত আফিঙ্গেতে মজবুত
ব্রহ্মহত্যা করিলেক অই ॥
মোগলে রহিল ঘেরি সদা করে তেরি মেরি
রাঙা আঁখি দেখে ভয় পাই।
খাট্টা মোট্টা বুদ্ধি নাই লুকাইব কোন ঠাঁই
ছাতি ফাটে জল দে রে খাই ॥
উজবুক কজলবাসে ঘেরিয়াছে চারি পাশে
রোহেলা জল্লাদ আদি যত।

কামড়ারে খেতে যায় জাতি লৈতে কেহ চায়
কত জনে কহে কতমত ॥
আরে রে হিন্দুকে পূত দেখলাও কঁহা ভূত
নহি তুঝে করুঙ্গা দোটুক।
ন হোয়ে সুন্নত দেকে কলমা পড়াও লেকে
জাতি লেউ খেলায়কে থুক ॥
মারিবারে কেহ ধায় কাটিবারে কেহ চায়
অন্নদা ভাবেন মজুন্দার।
অন্নদা ধ্যানের বলে তেজঃ যেন অগ্নি জ্বলে
ছুঁইতে যোগ্যতা হয় কার ॥
স্তুতি পাঠে অন্নদার বসিলেন মজুন্দার
চৌদিকে যবনে ধুম করে।
সিংহ যেন বসি থাকে চারি দিকে শিবা ডাকে
কাছে যেতে নাহি পারে ডরে ॥

অন্নদার মজুন্দারে অভয়দান।

স্তুতি কৈলা মজুন্দার স্মৃতি হৈল অন্নদার
আসিয়া দিল্লীতে উত্তরিলা।
জয়া বিজয়ারে লয়ে আকাশভারতী করে
মজুন্দারে অভয় করিলা ॥

ভয় কি রে অরে ভবানন্দ।
মোর অনুগ্রহ যারে কে তারে বধিতে পারে
দুঃখ যাবে পাইবে আনন্দ॥
পাপী পাতশার পুত আমারে কহিল ভূত
ভালমতে ভূত দেখাইব।
পাতশাহী সরঞ্জাম যত আছে ধূমধাম
ভূত দিয়া সব লুটাইব॥
যতেক বেদের মত সকলি করিল হত
নাহি মানে আগম পুরাণ।
মিছা মালা ছিলি মিলি মিছা জপে ইলি মিলি
মিছা পড়ে কলমা কোরাণ॥
যত দেবতার মঠ ভাঙ্গি ফেলে করি হঠ
নানামতে করে অনাচার।
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পায় থুথু দেয় তার গায়
পৈতা ছেঁড়ে ফোটা মোছে আর॥
এত বলি মহামায়া দিয়া তারে পদছায়া
রক্ষা হেতু জয়ারে রাখিলা।
ডাকিনী যোগিনী ভূত ভৈরব বেতাল দূত
সঙ্গে লয়ে সহরে চলিলা॥

জয়া নিজগণ লয়ে রহিল রক্ষক হয়ে
আনন্দে রহিল মজুন্দার।
মোগলে ছুইতে যায় ভূতে ঢেকা মারে তায়
রক্ষদৈতে করয়ে প্রহার ॥
যবনের ধুম ধাম ভূত হাঁকে হুম হাম
মহামারি পড়িল মশানে।
কহে রায় গুণাকর অন্নপূর্ণা দয়া কর
পরীক্ষিততনু ভগবানে ॥

অন্নপূর্ণা সৈন্যবর্ণন।

ধুধু ধম ধম ঝমক ঝমক ঝম
ঘন ঘন নৌবত বাজে।
ঝাঁগড় ঝাঁগড় গড় গড় গড় গড়
দগড় রগড় ঘন ঝাঁজে ॥
হন হন হাঁকা শত শত বাঁকা
বাঁক কটার বিরাজে।
কত কত হাজী কত কত কাজী
ধাইল ছাড়ি নমাজে ॥
বড় বড় দাড়ী চামর ঝাড়ী
গোঁফ উঠে শিরতাজে ॥

গোলা ধম ধম   গোলী ঝম ঝম

গম গম তোপ আবাজে ॥

ঝন্ ঝন্ ঝনননন   ঠন্ ঠন্ ঠনননন

বরিখত বরকন্দাজে।

পদ নখ হননে   বধিছে যবনে

খগগণ যেমন বাজে ॥

মারিয়া লাথী   বধিছে হাথী

ঘোড়া অনলে ভাজে।

শোণিত পানা   সন্তিতে দানা

চর্ব্বই যেমন লাজে ॥

ভৈরব লম্ফে   ধরণী কম্পে

বাসুকি নতশির লাজে।

ভারত কাতর   কহিছে মুরহর

রিপু বধ কর অব্যাজে ॥

দিল্লীতে উৎপাত।

ডাকিনী যোগিনী শাখিনী পেতিনী

গুহ্যক দানব দানা।

ভৈরব রাক্ষস   বোক্কস খোক্কস

সমরে দিলেক হানা।

লপটে ঝপটে দপটে রপটে

ঝড় বহে খরতর।

লপ লপ লম্ফে ঝপ ঝপ ঝম্পে

দিল্লী কাঁপে থর থর ॥

উদরে চাপড়ে আঁচড়ে কামড়ে

মরিছে যবন সেনা।

রক্তের পাঁথারে ভৈরব সাঁতারে

গগনে উঠিছে ফেনা ॥

তা থই তা থই হো হো হই হই

ভৈরব ভৈরবী নাচে।

অট অট হাসে কট মট ভাষে

মত্ত পিশাচী পিশাচে।

তুরঙ্গ ধরিয়া গণ্ডূষ করিয়া

মাতঙ্গ পুরিয়া গালে।

সিপাহী ধরিয়া ফেলিয়া লুফিয়া

খেলিছে তাল বেতালে ॥

রথ রথি সঙ্গে মুখে পুরি রঙ্গে

দশনে করিছে গুঁড়া।

হুঙ্কার ছাড়িয়া ফুঁকে উড়াইয়া

খেলিছে আবির উড়া ॥

নর শির মালা সমর বিশালা
শোণিততটিনী তীরে।
রণজয় তালী ঘন দিয়া কালী
শৃগালীবেষ্টিত ফিরে॥
এইরূপে দানা গণ দিল হানা
যবনে হইল দায়।
ললিত বিধানে রচিয়া মশানে
রায় গুণাকর গায়॥

এ কি ভূতাগত দেশে রে।
না জানি কি হবে শেষে রে॥
উত্তম অধম না হয় নিয়ম
কেহ নাহি ধর্ম্মলেশে রে।
দাতা ছিল যারা ভিক্ষা মাগে তারা
চোর ফিরে সাধুবেশে রে।
যবনে ব্রাহ্মণে সম ভাবে গণে
তুল্য মূল্য গজ মেষে রে॥
ভারতের মন দেখি উচাটন
না দেখিয়া হৃষীকেশে রে॥

এই রূপে দিল্লীতে পড়িল মহামারি।
যবনের হাহাকার ভূতের হুঙ্কার ॥
ঘরে ঘরে শহরে হইল ভূতাগত।
মিয়ারে কহিছে বান্দী শুন হজরত ॥
বিবীরে পাইল ভূতে প্রলয় পড়িল।
পেসবাজ ইজার ধমকে ছিঁড়া দিল ॥
চিতপাত হয়ে বিবী হাত পা আছড়ে।
কত দোয়া দবা দিনু তবু নাহি ছাড়ে ॥
শুনি মিয়া তসবী কোরাণ ফেলাইয়া।
দড় বড় রড় দিলা ওঝারে লইয়া ॥
ভূত ছাড়াইতে ওঝা মন্ত্র পড়ে যত।
বিবী লয়ে ভূতের আনন্দ বাড়ে তত ॥
অরে রে খবিস তোরে ডাকে ব্রহ্মদূত।
ও তোর মাতারি তুই উহারি সে পূত ॥
কুপী ভরি গিলাইব হারামের হাড়।
ফতমাবিবীর আজ্ঞা ছাড় ছাড় ছাড় ॥
ইত্যাদি অনেক মন্ত্র পড়িলেক ওঝা।
মিয়া দিলা লিখিয়া তাবিজ বোঝা বোঝা।
আর বিবী বান্দীরে ধরিছে আর ভূতে।
ওঝাকে কিলায় কেহ কেহ মুখে মূতে ॥

ধুলা ঝাড়ি গুড় গুড়ি পলাইল ওঝা ।
মিয়া হৈলা মিয়ানী ওঝার ঘাড়ে বোঝা ।।
এই রূপে ভূতাগত হইল শহরে ।
হাহাকার হুহুঙ্কার প্রতি ঘরে ঘরে ।।
শূন্য পথে সিংহরথে অন্নদা রহিলা ।
শহরের যত অন্ন কটাক্ষে হরিলা ।।
পাতশার ভাণ্ডারে কি আর আর ঠাঁই ।
হাট ঘাট বাজারে দোকানে অন্ন নাই ।।
ধান চাল মাষ মুগ ছোলা অরহর ।
মসূরাদি বরবটী বাটুলা মটর ।।
দেধান মাড়ুয়া কোদো চিনা ভুরা যব ।
জনার প্রভৃতি গম আদি আর সব ।।
মৎস্য মাংস কাচা পাকা নানা গুড় দ্রব ।
ঘাস পাত ফুল ফল যত মত সব ।।
কিনিতে বেচিতে কেহ কোথায় না পায় ।
সবে বলে আচম্বিতে এ কি হৈল দায় ।।
নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায় ।
মিশালে বিস্তর হিন্দু ঠেকে গেল দায় ।।
উপোষে উপোষে লোক হৈল মৃতপ্রায় ।
থাকুক অন্নের কথা জল নাহি পায় ।।

বকরা বকরী আদি নানা জন্তু কাটি।
খাইবারে সকলেতে মাংস লয় বাঁটি॥
নানামতে লোক আহারের চেষ্টা পায়।
হাতে পেতে ধরিয়া ভৈরবে লয়ে যায়॥
এইরূপে সপ্তাহ শহরে অন্ন নাই।
ছেলে পিলে বুড়া রোগা মৈল কত ঠাঁই॥
পাতশার কাছে গিয়া উজির নাজির।
শহরের উপদ্রব করিল জাহির॥
পাতশা কহেন বাবা কি কৈল গোসাঁই।
সাত রোজ মোর ঘরে খানা পিনা নাই॥
মামুর হইল মোর বাবরুচিখানা।
ঘরে হৈতে নিকলিতে না পারে জনানা॥
গোহাড় ইটাল ইট শূন্য হৈতে পড়ে।
ভূচালার মত চালা কোটা সব নড়ে॥
আন্ধারে কি কব রোজ রৌশনে আন্ধার।
হুপ হাপ দুপ দাপ হুঙ্কার হাঁকার॥
দেখিতে না পাই কেবা করে ধূমধাম।
সবো রোজ হাঁকে হুম হাম থুম থাম॥
যুবতী সহেলী বান্দী ধরিয়া পাছাড়ে।
বেহোঁশ হইয়া তারা হাত পা আছাড়ে॥

খবিশ পাইল বলি ডাকি আনি ওঝা।
লিখে দিনু গলায় তাবিজ বোঝা বোঝা॥
এমনি খবিশ আর না শুনি কোথায়।
তাবিজ ছিঁড়িয়া ফেলি ওঝারে কিলায়॥
ভারত কহিছে ভূতনাথের এ ভূত।
খবিশের খবিশ যমের যমদূত॥

পাতশার নিকটে উজিরের নিবেদন।

ফিরিয়া চাও মা অন্নদা ভবানী।
জননী না শুনে কোথা বালকের বাণী॥
ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম সাধন তোমার নাম
বিধি হরি হর ভাবে ও পদ দুখানী॥
তুমি যারে দয়া কর অন্নে পূর্ণ তার ঘর
না থাকে আপদ কিছু আমি ইহা জানি॥
পানপাত্র হাতা হাতে রতন মুকুট মাথে
নাচাও ত্রিশূলপাণি দিয়া অন্ন পানি॥
ভারত বিনয় করে অন্নে পূর্ণ কর ঘরে
হরিভক্তি দেহ মোরে তবে দয়া জানি॥
কাজি কহে জাহাঁপনা কত কব আর।
কোরাণ টানিয়া কালী ফেলিল আমার॥

নাহি মানে কোরাণ তাবিজ মজবুত ;
এ কভু খবিশ নহে হিন্দুর এ ভূত ॥
উজির কহিছে আলম্পনা সেলামত।
আমি বুঝি সেই বামণের কেরামত ॥
মানসিংহ কহিয়াছে দেবী পূজে সেই।
যখন যে চাহে তাহে দেবী তাহা দেই ॥
তুমি তার দেবীরে হিন্দুর ভূত কয়ে।
ভূত দেখা বলি বন্দী কৈলা ক্রুদ্ধ হয়ে॥
সেই দেবী এত করে মোর মনে লয়।
মানাও সে বামণেরে মিটিলে প্রলয় ॥
উজিরের বাক্যে জাহাঁগীর জ্ঞান পায়।
দড় বড় ডাকাইল মানসিংহ রায় ॥
মানসিংহ আসিয়া করিল নিবেদন।
ভূত জানে তুমি জান জানে সে বামণ ॥
আমি দেখিয়াছি বামণের কেরামত।
অন্নপূর্ণা ভবানীর মহিমা যেমত ॥
ভাল হেতু করেছিনু হুজুরে আরজ।
নহিলে কহিতে মোর কি ছিল গরজ ॥
ভূত বলি দেবীরে সাহেব গালি দিলা।
সহরে কহর এত আপনি করিলা ॥

এখনো সে বামণের কর পরিতোষ।
তবে বুঝি তার দেবী মাপ করে রোষ॥
মানসিংহ রায়ের কথার অনুসারে।
মজুন্দারে আনিতে কহিলা দরবারে॥
যোড় হাতে কহে নাজিরের লোক জন।
বামণের কাছে যাবে কে আছে এমন॥
মশানেতে শ্মশান করিল নত ভূত।
হাতী ঘোড়া উট আদি মারিল বহুত॥
মরা গেল কত শত আমীর উমরা।
কেবল ভক্তের বক্তে বাঁচিলা তোমরা॥
যমুনার লহর লহুতে হৈল লাল।
এখন বামণে মান মিটুক জঞ্জাল॥

গঙ্গা বর্ণন।

দাস্থ বাস্থ কর অবধান।
সেই দেব নিরঞ্জন চিৎস্বরূপি জনার্দ্দন
এই গঙ্গা সেই ভগবান॥
মহাদেব এক কালে পঞ্চমুখে পঞ্চতালে
গীতে তুষ্ট কৈলা ভগবানে।
নারায়ণ দ্রব হৈলা বিধি কমণ্ডলে লৈলা
বেদব্যাস বর্ণিলা পুরাণে॥

তার কত দিন পরে বলি ছলিবার তরে
নারায়ণ বামন হইলা।
ত্রিপাদ ধরণী লয়ে ত্রিবিক্রমস্বরূপ হয়ে
এক পদে স্বর্গ আচ্ছাদিলা॥
বিধি সেই পাদতলে পাদ্য দিলা সেই জলে
শিব দিলা জটা জূটে ধাম।
বিমল চপল তরঙ্গা সেই জল এই গঙ্গা
এই হেতু বিষ্ণুপদী নাম॥
ত্রিলোকে ত্রিলোকতারা তিনি হৈলা তিন ধারা
স্বর্গ মর্ত্য পাতাল বিশ্রাম।
স্বর্গে মন্দাকিনী মন্দা ভূতলে অলকনন্দা
পাতালেতে ভোগবতী নাম॥
ইনি সে অলকনন্দা নরলোকে মহানন্দা
ইহাঁরে আনিল ভগীরথ।
সগর সন্তান যত ব্রহ্মশাপে ছিল হত
এই গঙ্গা দিলা মুক্তিপথ॥
শিব জটামুক্ত হয়ে ভাগীরথী নাম লয়ে
এথা আসি ত্রিবেণী হইলা।
সরস্বতী যমুনারে মিলাইয়া দুই ধারে
মধ্যভাগে আপনি রহিলা॥

ভগীরথে লয়ে সঙ্গে বারাণসী দেখি রঙ্গে
যান গঙ্গা দক্ষিণের ঘাটে।
জহ্নু মুনি পিয়াছিল কাণে উগরিয়া দিল
জাহ্নবী হইলা জহ্নু ঘাটে॥
রাজা ভগীরথ রায় আগে আগে নাচি যায়
সাধু সাধু কহে দেবগণ।
পূর্ব্বে গেলা পদ্মা হয়ে ভগীরথী নাম লয়ে
মোর দেশে দিলা দরশন॥
গিরিয়া মোহনা দিয়া অগ্রদ্বীপ নিরখিয়া
নবদ্বীপে পশ্চিমবাহিনী।
পুনশ্চ ত্রিবেণী হৈলা দক্ষিণপ্রয়াগ কৈলা
ত্রিবেণীতে ত্রিলোকতারিণী॥
শতমুখীরূপ ধরী সাগর সঙ্গম করি
মুক্ত কৈলা সগর সন্তানে।
বেদ যার বিজ্ঞ নহে কে তার মহিমা কহে
ভারত কি কবে কিবা জানে॥

রামায়ণ কথন।

সাধু বাসু শুন মন দিয়া।
বল্মীকিপুরাণ মত রামের চরিত যত
সংক্ষেপে কহিব বিবরিয়া॥

এই দেশে মহারথ ছিলা রাজা দশরথ
সূর্য্যবংশে সূর্য্যের সমান।
কৌশল্যা প্রথম নারী কেকয়ী দ্বিতীয়া তারি
তৃতীয়া সুমিত্রা অভিধান॥
হরি চারি অংশ লয়ে চরু ভাগে ভাগ হয়ে
তিন গর্ভে হৈলা চারি জন।
কৌশল্যা প্রসবে রাম কেকয়ী ভরত নাম
সুমিত্রা লক্ষ্মণ শত্রুঘন॥
লক্ষ্মী মিথিলায় গিয়া যজ্ঞকুণ্ডে জনমিয়া
জনকের সুতা সীতা হৈলা।
সীতাপতি রামে জানি জনক পরমজ্ঞানী
হরধনুর্ভঙ্গ পণ কৈলা॥
বিশ্বামিত্র যজ্ঞ করে যজ্ঞ রাখিবার তরে
রাম লক্ষ্মণেরে গেলা লয়ে।
শ্রীরামের এক শরে তাড়কা রাক্ষসী মরে
মারীচ পলায় দ্রুত হয়ে॥
যজ্ঞ রাখি প্রভু রাম গিয়া জনকের ধাম
ধনু ভাঙ্গি সীতা বিয়া কৈলা।
অযোধ্যা হইতে রঙ্গে পরশুরামের সঙ্গে
পথে রণে রাম জয়ী হৈলা॥

ঘরে এলা সীতা রাম সিদ্ধ হৈল মনস্কাম
দশরথ রাজ্য দিতে চায়।
কেকয়ী হইল বাম বনবাসে গেলা রাম
শোকে দশরথ ছাড়ে কায়॥
জানকী লক্ষ্মণে লয়ে রাম যান দ্রুত হয়ে
গুহক চণ্ডালে কৈলা সখা।
শ্রীরাম দণ্ডকবাসী তথা উত্তরিলা আসি
রাবণ ভগিনী শূর্পণখা॥
রামেরে ভজিতে চায় সীতারে লঙ্ঘিতে যায়
লক্ষ্মণ কাটিলা নাক তার।
সেই হেতু রামশরে খর দূষণাদি মরে
শূর্পণখা করে হাহাকার॥
শুনি স্মূর্পণখা মুখে রাবণ মনের দুখে
বনে গেল মারীচে লইয়া।
মায়ামৃগরূপ হয়ে মারীচ রামেরে লয়ে
দূরে গেল মায়া প্রকাশিয়া॥
রামবাণে হত হয়ে হায় রে লক্ষ্মণ কয়ে
মায়ামৃগ মারীচ মরিল।
লক্ষ্মণ সীতার বোলে তথা গেলা উতরোলে
সীতা হরি রাবণ হইল॥

রাম মায়ামৃগ নাশি লক্ষ্মণ সহিত আসি
পর্ণশালে না দেখিয়া সীতা।
সীতার উদ্দেশে রাম পথে মিলে হনুমান
সুগ্রীব বান্ধব কৈলা মিতা॥
সুগ্রীবের প্রীত হৈয়া সপ্ত তাল ভেদ কৈলা
মহাবলী বালিরে বধিয়া।
সুগ্রীবেরে রাজ্য দিয়া হনুমানে পাঠাইয়া
জানকীর সংবাদ জানিলা॥
কপিগণে পাঠাইয়া শিলা তরু আনাইয়া
সিন্ধু বাঁধি ভবানী পূজিলা।
সিন্ধু পার হৈলা রাম মনে মানি পরিণাম
বিভীষণ আসিয়া মিলিলা॥
অনেক সমর হৈল কুম্ভকর্ণ আদি মৈল
ইন্দ্রজিত প্রভৃতি মরিল।
রাবণ রুষিয়া মনে যুঝে শ্রীরামের সনে
শক্তিশেলে লক্ষ্মণে বিঁধিল॥
রাম কন হনুমানে সে গন্ধমাদন আনে
তাহে ছিল বিশল্যকরণি।
পাইয়া তাহার ঘ্রাণ লক্ষ্মণ পাইলা প্রাণ
দেবগণ করে জয়ধ্বনি॥

রাবণ আইল রণে রঘুনাথ ক্রোধ মনে
ব্রহ্ম অস্ত্রে তাহারে বধিলা।
বিভীষণে দিলা লঙ্কা ইন্দ্রের ঘুচিল শঙ্কা
পরীক্ষায় সীতা উদ্ধারিলা॥
রাক্ষস বানর সঙ্গে পুষ্পকে চড়িয়া রঙ্গে
রাজা হৈলা অযোধ্যা আসিয়া।
সীতা হৈলা গর্ভবতী লোকবাদে রঘুপতি
বনবাসে দিলা পাঠাইয়া॥
সীতা তপোবনে রৈলা কুশ লব পুত্র হৈলা
রাম অশ্বমেধ আরম্ভিলা।
বাল্মীকির সঙ্গে গিয়া কুশ লব বিবরিয়া
রামে রামায়ণ শুনাইলা॥
কুশ লব পরিচয়ে সীতা আনি নিজালয়ে
পরীক্ষা দিবারে পুন চান।
সীতা কৈলা ধরা ধ্যান ধরা কৈলা অধিষ্ঠান
সীতা কৈলা পাতালে প্রয়ান॥
মুগ্ধ রাম সীতাশোকে হেন কালে সুরলোকে
যুক্তি করি কাল গেলা তথা।
লক্ষ্মণে বর্জ্জিয়া রাম চলিলা বৈকুণ্ঠ ধাম
ভারতের অসাধ্য সে কথা॥

রতি বিলাপ।

পতিশোকে রতি কাঁদে   বিনাইয়া নানা ছাঁদে
        ভাসে চক্ষু জলের তরঙ্গে।
কপালে কঙ্কণ মারে   রুধির বহিছে ধারে
        কাম অঙ্গ ভস্ম লেপে অঙ্গে॥
আলু থালু কেশ বাস   ঘন ঘন বহে শ্বাস
        সংসার পূরিল হাহাকার।
কোথা গেলা প্রাণনাথ   আমারে করহ সাথ
        তোমা বিনা সকলি আঁধার॥
তুমি কাম আমি রতি   আমি নারী তুমি পতি
        দুই অঙ্গ একই পরাণ।
প্রথমে যে প্রীতি ছিল   শেষে তাহা না রহিল
        পিরীতির এ নহে বিধান॥
যথা যথা যেতে প্রভু   মোরে না ছাড়িতে কভু
        এবে কেন আগি ছাড়ি গেলা।
মিছা প্রেম বাড়াইয়া   ভাল গেলা ছাড়াইয়া
        এখন বুঝিনু মিছা খেলা॥
না দেখিব সে বদন   না হেরিব সে নয়ন
        না শুনিব সে মধুর বাণী।

আগে মরিবে স্বামী পশ্চাতে মরিব আমি
এত দিন ইহা নাহি জানি॥
আহা আহা হরি হরি উহু উহু মরি মরি
হায় হায় গোসাঁই গোসাঁই।
হৃদয়েতে দিতে স্থান করিতে কতেক মান
এখন দেখিতে আর নাই॥
শিব শিব শিব নাম সবে বলে শিবধাম
বামদেব আমার কপালে।
যার দৃষ্টে মৃত্যু হরে তার দৃষ্টে প্রভু মরে
এমন না দেখি কোন কালে॥
শিবের কপালে রয়ে প্রভুরে আহুতি লয়ে
না জানি বাড়িল কিবা গুণ।
একের কপালে রহে আরের কপাল দহে
আগুনের কপালে আগুন॥
অনলে শরীর ঢালি তথাপি রহিল গালি
মদন মরিলে মৈল রতি।
এ দুঃখে হইতে পার উপায় না দেখি আর
মরিলেও নাহি অব্যাহতি॥
অরে নিদারুণ প্রাণ কোন পথে পতি যান

চরণ রাজীব রাজে মনঃশিলা পাছে বাজে
হৃদে ধরি লহ রে বহিয়া ॥
অরে রে মলয় বাত তোরে হোক বজ্রাঘাত
মরে যাক ভ্রমরা কোকিলা।
বসন্ত অল্পায়ু হও বন্ধু হৈয়া বন্ধু নও
প্রভু বধি যাক পলাইলা ॥
কোথা গেলা স্মরবাজ মোর মুণ্ডে হানি বাজ
সিদ্ধ কৈলা আপনার কর্ম্ম।
অগ্নিকুণ্ড দেহ জ্বালি আমি তাহে দেহ ঢালি
অন্তকালে কর এই ধর্ম্ম ॥
বিরহ সন্তাপ যত অনলে কি তাপ তত
কত তাপ তপনের তাপে।
ভারত বুঝায়ে কয় কাঁদিলে কি আর হয়
এই ফল বিরহির শাপে ॥